

কউণ্টার পয়েন্ট

[রহস্য উপন্যাস]

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

কাউন্টার গ্যেণ্ট

[রহস্য উপক্ৰাস]

কুশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স । ৯ জামাচরণ দে স্ট্রীট । কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৬৩

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্রেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদশিল্পী
গৌতম রায়

মুদ্রাকর
সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫১ বামাপুকুর লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

গুণ্ডা মুখোপাধ্যায় এবং
শেখর মুখোপাধ্যায়কে—
গভীর স্নেহ ও
আশীର୍বাদসহ—

*If you want to download
a lot of ebook,
click the below link*



**Get *More*
Free
eBook**

**VISIT
WEBSITE**

www.bengaliboi.com

Click here



কাউটার পয়েন্ট

অগ্রাণু যাত্রীদের সঙ্গে কুশল এয়ারলাইন্সের বাস থেকে নেমে এল। এতক্ষণ বুঝতে পারা যায়নি—এখন, কনকনে ঠাণ্ডা হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে এটা কলকাতা নয়।

জাহ্নবীর এগার তারিখ আজ।

মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে বরফ পড়তে আরম্ভ করবে। কুশল অবশ্য জানে, যত ঠাণ্ডা পড়ার চাপ থাক না কেন, বিহারের কোন অঞ্চলে বরফ কখনও পড়ে না। গ্রেট কোর্টের কলার ভাল করে তুলে দিয়ে কুশল দ্রুত পায়ে টার্মিনাস বিল্ডিং-এর মধ্যে প্রবেশ করল।

কলকাতাগামী যাত্রীর সংখ্যা আজ এত কম কেন বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দরুন এই অবস্থা। কুশলকে মাসের মধ্যে কম করে বার দুয়েক পাটনায় আসতে হয়। তবু এখনও এখানকার জল হাওয়ার সঙ্গে সঠিক ভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

ওয়েটিং হলের একটা কোচ অধিকার করে কুশল সিগারেট ধরাল। এক বন্ধুর অমরোধের চাপে কিছুদিন হল ফোর স্ময়ার-এর প্রতি মন বসিয়েছে। ব্র্যাণ্ডটা মন্দ নয়। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে রিস্টোরাণ্টের দিকে তাকাল। সেন্টার সেকেন্ড সিম্পটার বলছে, সাতটা পঁচিশ। অর্থাৎ প্লেন ছাড়তে এখনও আধঘণ্টার ওপর সময় বাকি। কয়েক টানে সিগারেটও ছোট হয়ে এল।

টুকরোটা সেন্টার টপের ওপর রাখা স্মৃশ্চ অ্যান্ট্রিতে গুঁজে দিয়ে কুশল উঠে দাঁড়াল। কোচের পাশেই অ্যাটাচি কেস রাখা ছিল। খুঁকে অ্যাটাচি তুলে নেবার মুখেই ওকে থামতে হল—সতর্কতার ধ্বনি মিলিয়ে যাবার পরই লাউড স্পিকার সরব হল, অ্যাটেনশন প্রীজ—

এরপর যাত্রীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা যা বললেন তার সারমর্ম হল, যেন কুরাশার দরুন কলকাতাগামী ক্লাইট নম্বর তিনশো বোল ছাড়তে কমপক্ষে দু ঘণ্টা বিলম্ব হবে। উপায়হীন অবস্থার দরুন যাত্রীবর্গকে এই অন্তর্বিধার মুখোমুখি হতে হল। আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

কুশল আবার বসে পড়ল।

বিরক্তিবোধ চেপে বলল মনের ওপর। এই উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার জন্য এখন নিজেকেই দায়ী মনে হচ্ছে। আগামী সকালের ক্লাইটে কলকাতা ফিরলে কোন অসুবিধা ছিল না। আজকের এই কনকনে রাত হোটেলের আরামদায়ক বিছানায় চমৎকার ভাবে কাটিয়ে দেওয়া যেত। এখনও আরো দু'ঘণ্টা। অর্থাৎ লাভে নটার পর। তখনও আকাশ পরিষ্কার হবে কিনা ভগবান জানেন।

কুশল জুঁককে বসে রইল।

এতক্ষণ ওয়েটিং হলে বিশেষ লোক ছিল না। অ্যানাউন্সমেন্টের পরই একে একে সকলে এখানে এসে উপস্থিত হলেন। অধিকাংশ যাত্রীর মুখেই বিরক্তির ছায়া। কলগুঞ্জে ভরে উঠল ওয়েটিং হল। কারুর কারুর কথাবার্তায় এমন মনে হচ্ছিল, আজকের শোচনীয় জল হাওয়ার দরুন দায়ী “ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের” কর্তৃপক্ষ।

কুশল আবার সিগারেট ধরাল।

ঘনঘন কয়েকবার টান দেবার পরই গুনতে পেল বাইজোভ। মিঃ ব্যানার্জী, আপনি—

চমকে মুখ তুলল কুশল।

হাত কয়েকের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আদিত্য সোম। নামকরা এক গুহুধ কোম্পানির উনি মার্কেটিং ম্যানেজার। ঠুঁকেও প্রায় পাটনা আসতে হয়। এই যাওয়া-আসার পথেই আলাপ। কখনও কখনও একই হোটеле উঠেছে দুজনে। আদিত্য সোমের বর্ধমানে বাড়ি।

কুশল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কবে এসেছিলেন?

—বুধবার। আপনি—

—আমি পরশু এসেছি। ছিলেন কোথায়? “মৌর্য”র তো দেখতে পাইনি?

—আমি এবার “আনন্দলোকে” উঠেছিলাম। কি ঝামেলায় পড়া গেল বলুন তো। আকাশ পরিষ্কার না হলে কতক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। সিগারেটে একটা টান দিয়ে কুশল বলল, ওরা তো বলছে ঘণ্টা দুয়েক পরেই রওয়ানা হতে পারবো।

—অ্যাটমোসফেরার সম্পর্কে আগে থেকে স্কাইউইন হওয়া চলে না। এমনও হতে পারে আমরা রাতভোর আটকে পড়লাম।

—এরাই আমাদের খাওয়া খাকার ব্যবস্থা করবে।

আদিত্য সোম জুঁককে বললেন, তা জেঁকু করবেই। কিন্তু এতে আমার লাভ হচ্ছে না। ভেবেছিলাম, লাড়ে নটার মধ্যে পৌঁছে যাব। দরদর লেটশন থেকে

দশটা হুড়ির লোকালটা ধরতে অসুবিধা হত না। আজ রাতেই বাড়ি পৌঁছে যেতাম। তা আর হল না।

মুহূ হেসে কুশল বলল, এতে আশ্চর্যের কি আছে। ঠাণ্ডার ট্রেন আনি করার চেয়ে কাল সকালে পৌঁছনো অনেক ভাল।

—সকালে বর্ষমানে একজনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। আর ভেবে লাভ নেই। যা হবার হবে। চলুন, রেস্টুরেণ্টে গিয়ে বস্তু যাক।

—গলাটা একটু গরম করে নিলে মন্দ হবে না। চলুন—

দুজনে গুয়েটিং হল থেকে বেরিয়ে রেস্টুরেণ্টে গিয়ে পৌঁছল। ভিড় বিশেষ নেই। শীততাপনিরস্ত্রিত হওয়ার দরুন ভারী মনোরম পরিবেশ। এক কোণ ঘেঁষে দুজনে বসল মুখোমুখি। জোরাল আলো নেই। কেমন ছায়া-ছায়া পরিবেশ।

সোম বললেন, তু পেগ করে রাম খাওয়া যাক, কি বলেন ?

—আমি কফি পছন্দ করবো। আপনি চাইলে—

—ঠিক আছে। কফিই হোক। এক যাত্রায় পৃথক ফলের কোন মানে হয় না। পরিবেশক এসে পড়েছিল। কফির অর্ডার দেওয়া হল। এসেও পড়ল কফি এক-লময়। নানা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হতে হতে একসময় পেয়লা শেষ হল।

কমাল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে সোম বললেন, আমি কিছুক্ষণ থেকে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি।

—কি ব্যাপার ?

—আমাদের বা ধারের থার্ড টেবিলে একজন মহিলা বসে আছেন। উনি বার বার তাকাচ্ছেন আমাদের দিকে। আমি মহিলাকে চিনি না। দেখুন তো, আপনার চেনা-জানার মধ্যে কেউ কিনা।

কুশল মুখ ফিরিয়ে দেখল। সাজপোশাকে শালীনতার পরিচায়ক। তবে মুখ দেখতে পেল না। মহিলা তখন একজন পরিবেশকের সঙ্গে অন্ত্র ধারে মুখ ঘুরিয়ে কথা বলছেন।

কুশল বলল, পাটনার কোন মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। উনি বোধহয় আমাদের টপকে আর কাউকে দেখছিলেন।

—হতে পারে। চলুন, ওঠা যাক।

পরিবেশককে ডেকে বিল মিটিয়ে দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। আর কতক্ষণ ফ্লাইটের জন্ত অপেক্ষা করতে হবে এখন এটাই হল প্রশ্ন। দুর্তোগ একেই বলে। কয়েক পা এগিয়েছে দুজনে—বেগ—

বেগ!!!

কটিতি ঘুরে দাঁড়াল কুশল। এই সম্বোধন করার লোক তো বহুদিন আগেই তার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। তবে—? সেই মহিলা এগিয়ে এসেছেন। বয়স বছর পঁয়ত্রিশের বেশী নয়। স্বামীর লালিমা মুখে পরিব্যাপ্ত। তবে সিঁথিতে সিঁদুর নেই।

কুশলের গলা থেকে একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়ল।

—তুমি এখানে ?

ওর বিস্ময় হিন্দীতেই প্রকাশ পেয়েছিল।

মহিলা আরো এগিয়ে এসে হিন্দীতে বললেন, অনেকক্ষণ থেকে তোমাকে লক্ষ্য করছি। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

—আমিও ভীষণ অবাক হচ্ছি। বোধহয় দশ বছর পরে দেখা। আজকাল পাটনাতেই আছো নাকি ?

—না। বছরে বার চারেক আসতে হয়। দশ বছর নয়, আমাদের দেখা হল প্রায় বার বছর পরে।

কুশলের এবার শিষ্টাচারের কথা মনে পড়ল।

দ্রুত গলায় বলল, মিঃ সোম, ঋতু মাথুর—এলাহাবাদে আমবা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম। ঋতু, ইনি আমার বন্ধু আদিত্য সোম। বড় এক কোম্পানির এক্সিকিউটিভ।

নমস্কার বিনিময়ের পর সোম বললেন, বহুদিন পরে আপনাদের দুজনের দেখা। অনেক কথা জমা হয়ে রয়েছে নিশ্চয়। আপনারা আলাপ করুন। আমি বরং ওদার থেকে ঘুরে আসি।

কুশল বাধা দেবার আগেই সোম লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন রেস্টুরেন্ট থেকে ঋতু মুহু হাসল। ওবা কোণের দিকে একটা টেবিল অধিকার করল। অল্পটুকু অল্পভূতিতে কুশলের মনেব ভেতরটা চিনচিন করে চলেছে।

কথা নেই কারুর মুখে।

পরিবেশক এসে কফির অর্ডার নিয়ে গেল।

ঋতুই নীরবতা ভঙ্গ করল।

—বেঞ্জে—

—বল ?

—এতদিন পরে দেখা। আমরা চুপচাপ বসে থাকবো বুঝি ?

—না। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না, তুমি আমার সামনে বসে আছো।

—যশে যে আছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। এরকম বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে

যায় কখনও-সখনও। কোথায় আছে এখন ? মনে হচ্ছে কাজকর্ম ভালই করছে ?
লিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার পকেট থেকে বার করল কুশল।

—আজকাল কলকাতায় থাকি। বড় একটা কোম্পানিতে ভাল পোস্টেই
আছি। চলে যাচ্ছে এক রকম ভাবে। কিন্তু তুমি—

—থামলে কেন ?

—তোমার মধ্যে একটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করছি। মানে...

ঋতু ম্লান হেসে বলল, সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন জানতে চাইছে ?

—সিঁদুর তো থাকারই কথা।

—কিন্তু বেঙ্গ—আমাদের দেশের বিধবা মহিলারা তো সিঁদুর পরে না।

—মাথুর সাহেব—

—বছর ছয়েক আগে মারা গেছেন।

একটা আড়ষ্টতা কুশলকে পেয়ে বসলো।

—তোমাকে আঘাত করার ইচ্ছে আমার ছিল না। এই প্রশঙ্গে আমার
আগ্রহ প্রকাশ করা ঠিক হয়নি।

ঋতু এবার স্বাভাবিক গলায় বলল, এত সঙ্কোচ করছে কেন ? বহুদিন পরে
দেখা হয়েছে তো কি হয়েছে ? আমার সম্পর্কে সমস্ত কথাই তোমার জানার
অধিকার আছে। তুমি তো জানো, মাথুরসাহেব আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়
ছিলেন। তার ওপব হার্টের রোগ। বিয়ের বছর থানেকের মধ্যেই আমি বুঝতে
পেয়েছিলাম, মধবা অবস্থায় আমি খুব বেশীদিন থাকতে পারবো না।

—তারপর—

—আমার বিবাহিত জীবনের মেয়াদ ছ বছর। মাথুর সাহাব আমাকে একটি
মেয়ে আর প্রচুর বিষয়সম্পত্তি দিয়ে গেছেন।

কুশল এতক্ষণ পরে লিগারেট ধরাল।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, মেয়ের এখন বয়স কত ?

—আটে পড়েছে। কার্শিয়াং-এর এক কনভেন্টে আছে। দেখতে হয়েছে
আমারই মত। এবার নিজের সম্পর্কে কিছু বল ? ছেলেমেয়ে কটি ?

—বিয়ে করলে তবে তো ছেলেমেয়ে হবে।

লবিস্বয়ে ঋতু বলল, সে কি—বিয়ে করনি ! কেন ?

কুশলের মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল।

—সে অনেক কথা ঋতু।

—আমাকে বলতেও বাধছে ?

—না না, বাধবে কেন । তোমার বিয়ের পর মনের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে পড়ল যে পড়া ছেড়ে দেব ভাবলাম । তখনকার মনের অবস্থার কথা আমি তোমার ঠিক বোঝাতে পারবো না । মানে—

—আমি জানি বেঞ্চ তুমি আমাকে ভীষণ ভালবাসতে ।

—আর তুমি—?

—আমিও । তারপর কি হল বল ?

—মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা কত চাপের মুখে থাকে তুমি জান না । অনিচ্ছায় সঙ্গেই পরীক্ষায় বসতে হল শেষমেঘ । কিভাবে জানি না, এম. এস.-সির বেড়া পারও হয়ে গেলাম । বাবা মারা গেলেন এই সময় । আর্থিক দিকটা ভারী শোচনীয় হয়ে উঠল । দু বছর পর চাকরি পেলাম । কর্মস্থল হল কলকাতা । মা আর কুনালকে নিয়ে চলে গেলাম ওখানে । কুনালকে তোমার মনে আছে তো ?

—তোমার ছোট ভাই কুনালকে আমার মনে থাকবে না ? ভাবী ভাবী করে সব সময় আমাকে খেপিয়ে মারতো । তারপর কি হল ?

—কুনালকে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলাম । ঠিকঠাক চলছিল সমস্ত কিছু । কিন্তু শেষ রক্ষা হল না । একদিন—

—থামলে যে—

—কুনাল মারা গেল ঋতু । ডবল ডেকারের চাকার তলায় তার শরীর মাংস-পিণ্ডে পরিণত হয়েছিল ।

স্থান কাল ভুলে ঋতু কুশলের হাত চেপে ধরল ।

—কুনাল নেই—

—না । মাত্র আঠারো বছর বয়সে সে চলে গেছে । মা পাগলের মত হয়ে গেলেন । ঠুকে সামলানো আর চাকরি করা আমার কাছে দুর্ঘট হয়ে পড়েছিল । তারপর একদিন এল, মাও চলে গেলেন । আমি একা হয়ে গেলাম । চাকরিতে অবশ্য উত্তর-উত্তর উন্নতি হয়ে চলেছে । এই হল আমার ইতিকথা ।

—একা হয়ে পড়েছো বলেই তো তোমার বিয়ে করা উচিত ছিল ।

—উচিত কর্মটা আমি করতে পারলাম না । তুমি আমার জীবনের সব ধারা পাশে দিয়েছিলে । অথচ তোমাকে পাশে পেলাম না । কাজেই আর কাউকে মনে জায়গা দেওয়া সম্ভব হল না । ”

—আমি বলবো এটা পাগলামি ।

—হয়তো । মাহুত তো কত রকম বিকারের শিকার হয় ।

—বেঞ্চ—

—বলো ?

—আমার কথা তোমার মনে পড়তো ?

—অবাস্তব প্রশ্ন। তুমি শুনেছো তোমাকে পাশে পাইনি বলেই বিয়ে করিনি বরং আমি তোমাকে ঐ প্রশ্নই করি। আমাকে মনে পড়তো তোমার ?

ভারী নিঃশ্বাস ফেলে কয়েক সেকেন্ড চূপ করে রইল ঋতু। তারপর ধেমে ধেমে বলল, আমার বিবাহিত জীবন ভারী অসুখী ছিল। ভদ্রলোক খারাপ ছিলেন না। তবে তাঁর আসক্তি আমার প্রতি ছিল না—ছিল, অর্থের প্রতি। নিজের ব্যবসার মূলধনকে কিভাবে চতুর্গুণ করে তোলা যায় সেই দিকেই তাঁর প্রথম দৃষ্টি থাকতো তাহাড়া তিনি আমার চেয়ে বাইশ বছরের বড় ছিলেন।

—কি বিশাল অবিচারের বোঝা তোমার ওপর চাপানো হয়েছিল !

—ঠিক তাই। আমি প্রতিবাদ করতে পারিনি। রক্ষণশীল পরিবারের অল্প-বয়সী আমি সেদিন সাহস সংগ্রহ করতে পারিনি। ভাবাক্রান্ত মন নিয়ে খসুখসুখ চলে গেলাম। কিন্তু বিশ্বাস কর বেঞ্চ, প্রতিদিন অসংখ্যবার তোমার কথা মনে পড়তো।

পানায়র কথা কারুর মনে ছিল না।

দু কাপ কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রেটে ফেলে দিয়ে কুশল বলল, পৃথিবীটা বোধহয় ছোট হয়ে আসছে। আবার যে দেখা হবে কে ভেবেছিল ?

—আমিও ভাবিনি।

—ঋতু তুমি কি বল, আজকের পর আমাদের আবার দেখা হবে ?

—নিশ্চয়। কলকাতায় কোথায় থাকো তুমি ?

—পায় এভিনিউ-এ। বছর কয়েক আগে ফ্ল্যাট কিনেছি।

—কোন আছে ?

—অ্যাপ্লাই করেছি।

—ঠিকানাটা লিখে দাও।

পকেট থেকে কোম্পানির কার্ড বার করে, তার উল্টো দিকে ঠিকানাটা লিখে দেবার আগেই কুশলকে ধামতে হল, ভিনজন ভদ্রলোক ওদের টেবিলের সামনে এসে ধামলেন। তাঁদের লাজপোশাকের পারিপাট্য লক্ষণীয়। বয়স পরতাজিশের নীচে কেউ নন। ঋতু দ্রুত কুঁচকে তাকাল ওদের দিকে, তারপর কুশলের দিকে তাকাল।

—এঁরা আমার খসুখসুখের লোক।

কুশল মাথা ঝাঁকিয়ে সৌজন্যতা প্রকাশ করল।

তিনজনের মধ্যে যিনি স্মার্ট দর্শন, তিনিই এবার মুখ খুললেন, এঁকে চিনতে পারলাম না ?

—কুশল ব্যানার্জী। এলাহাবাদে আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন। ব্রজবাবু কোথায় ? তাঁকে দেখছি না !

—এই যে ম্যাডাম। আমি এখানে।

কথা শেষ করেই তিনজনের পিছন থেকে একজন দর্শন দিলেন। বয়স পঞ্চাশের ওপরেই হবে। দোহারা গড়নের মানুষ। মুখ চোখে বুদ্ধির ছায়া বিরাজ করছে। পরনে তাঁতের ধুতি। শরীরের উপরাংশ পুরু বাদামী রং-এর গরম চাদরে ঢাকা।

—ব্রজবাবু—

—আজ্ঞে—

—কখন প্লেন ছাড়বে জানতে পারলেন কিছু ?

ব্রজবাবু বললেন, বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে ম্যাডাম। জল হাওয়া খুবই খারাপ। আজ প্লেন ছাড়বে কিনা সন্দেহ।

—বলেন কি—ঋতু ঝাঁককে উঠল, আমরা রাত ভোর করবো কি ? এইভাবে এখানে বসে থাকতে হবে ?

কুশল ইতিমধ্যে কার্ডের একধারে নিজের ঠিকানাটা লিখে ফেলেছিল। উঠে দাঁড়িয়ে কার্ডটা ঋতুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, তুমি ব্যস্ত হয়ে না। প্লেন যদি না ছাড়ে, অর্থাৎ আমি আমাদের ভাল একটা ব্যবস্থাই করবেন। এখন চলি—

আর কিছু শোনার অপেক্ষায় কুশল ওখানে দাঁড়াল না। দ্রুত এগিয়ে গেল দরজার দিকে। স্মার্ট দর্শন ভব্রলোক ওর গতিশীল দেহটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন, তারপর মুখ ফেরালেন ঋতুর দিকে।

হাস্য করে বললেন, আপনার এলাহাবাদের প্রতিবেশী বেশ অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতেই কথা বললেন লক্ষ্য করলাম।

সারা মুখ ঋতুর লাল হয়ে উঠল।

তারপর তীক্ষ্ণ গলায় বলল, এতে আপনার অস্বস্তির তো কারণ থাকতে পারে না। আর একটা কথা, মনে রাখবেন, আমি অনধিকার চর্চা একেবারে পছন্দ করি না।

তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, ব্রজবাবু, আন্দাজে টিল ছুঁড়বেন না। খোঁজ খবর নেব গিয়ে। আমি ওয়েটিং হলে গিয়ে বসছি।

ঋতু উঠে দাঁড়াল।

ব্রজবাবু অসহায়ই ঠিক ।

মিনিট পনেরো পরেই অ্যানাউন্সমেন্ট হল । যাত্রীসাধারণকে জানানো হল, শৌচনীয় জল হাওয়ার দরুন আজ কোনমতেই রওয়ানা হওয়া সম্ভব নয় । তবে যাত্রীদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য কর্তৃপক্ষ সজাগ দৃষ্টি রাখছেন । এয়ারপোর্ট সংলগ্ন হোটেলের সকলের থাকার এবং নৈশ আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে । অনুরোধ জানানো হচ্ছে, নিজের নিজের টিকিট নিয়ে একে একে তিন নম্বর কাউন্টারে চলে আসুন ।

আদিত্য সোম অসহায় ভঙ্গীতে কুশলের দিকে তাকালেন । অর্থাৎ আগামী কাল সকালে বর্ধমানে তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করা গেল না । অগত্যা যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ বা হতাশার ছায়া পড়েছে । কুশলের অবস্থা তেমন কোন তাড়া নেই, তবে এই পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতেও ভাল লাগছে না । একটা ব্যাপার অবশ্য ওকে অগত্যাবে উত্তলা করে রেখেছে ।

ঋতু !!!

এতদিন পরে যে ঋতুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে মনের কোণেও কোনদিন স্থান দেয়নি । সেই অসম্ভব ঘটনাটাও ঘটে গেল । তার জীবনে বিপর্যয় কম আসেনি । তবু এখনও সে ভারী বাস্তবপন্থী—উচ্ছল ।

আদিত্য সোম তাড়া দিলেন, যা হবার তা তো হল । এখন চলুন হোটেলের ব্যবস্থা করে ফেলা যাক ।

মুহূ হেসে কুশল বলল, আর কিছু না হোক এই ঋমেলায় সরকারী খরচে এয়ারপোর্ট হোটেলের এক রাত অন্তত থাকা যচ্ছে । চলুন—

সব কিছু মিটিয়ে ফেলতে আধঘণ্টাটুক সময় লাগল । কুশলের জন্ম ২১০ নম্বর ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে । আদিত্য সোম পেলেন ২৩০ ।

ভিনার শেষ হয়ে গেল সাড়ে নটার মধ্যেই ।

আদিত্য সোম আর কুশল একই টেবিলে বসে দক্ষিণ হাতের কাজটা শেষ করেছে । মন বসিয়ে খেতে পারেনি । থেকে থেকেই ওকে অজানা এক অসুস্থতা নাড়া দিয়ে যাচ্ছে ।

ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে সোম বললেন, আপনি কেমন যেন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে ?

—হ্যাঁ । পুরনো দিনের অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ।

—ঐ মহিলা মানে

—মহিলার সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল হত। পরে আপনাকে বলব সব কথা।

সোম ও প্রসঙ্গে আর কোন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। কুশলও সেকেণ্ড ফ্লোরে পৌঁছবার পর নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। জামাকাপড় ছেড়ে রাত্রিবাস চাপিয়ে নিল। সিগারেট ধরাল তারপর।

কত নম্বর ঘরে ঋতু রয়েছে কে জানে? ডাইনিং হলে তো ওকে দেখা গেল না। খাবার বোধহয় ঘরেই আনিয়ে নিয়েছে। ঋতু অবশ্য একা নেই। সঙ্গে কয়েকজন লোক রয়েছে। ওরা পাটনার অধিবাসী না, কলকাতা থেকে সঙ্গে এসেছে?

কুশল এবার নিজের ওপরই বিরক্ত হল। এই অবাস্তব আগ্রহের কোন মানে হয় না। সোফায় বসে পড়ে অর্ধেকণ্ড না পোড়া সিগারেটটা অ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে দিল। এই সময় ওর দৃষ্টি পড়ল টেলিফোনের উপর। ফোনে জেনে নেওয়া যায় ঋতুর ঘরের নম্বর।

কুশল রিসিভার তুলে নিতে গিয়েও থামল। আজ এমন হচ্ছে কেন? নিজেকে কঠিন রাখাই যেন কঠিন হয়ে পড়েছে! ঋতুকে কুশল অবশ্য জীবনে ভুলতে পারতো না। তবে দৈবাৎ দেখা না হয়ে গেলে এতটা উত্তলা হবার কোন কারণ ছিল না এটাও ঠিক।

সোফায় একটু হেলে বসল কুশল। ঘটনার বিস্তার অনেক বছরের পুরনো হলেও সমস্ত কিছু পরিষ্কার মনে আছে। এলাহাবাদের জর্জ টাউন এলাকায় পাশাপাশি দুটো বাড়িতে ঋতু আর কুশলদের বসবাস ছিল। সচ্ছলতার ব্যাপারে দ্বিকিতরা অবশ্য ওদের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে ছিলেন। পাশাপাশি থাকার দরুন দুজনের মধ্যে পরিচয় থাকা স্বাভাবিক। সেই পরিচয় যে কবে প্রেমে পরিণত হল তার হিসাব ওরা রাখেনি।

সময় ভালই কাটিছিল। সকলের অগোচরে ভবিষ্যৎ জীবনের সুখস্বপ্নের জাল বুনতে ভারী ভাল লাগতো। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা ঘটে এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। অর্থাৎ জানাজানি হয়ে গেল ব্যাপারটা। দ্বিকিতরা ব্যাপারটা মেনে নিতে রাজী হলেন না। একদিন ঋতুর দাদা কদম্ব ভাষায় কুশলকে অপমান করে গেল। ঋতুকে চোখে চোখে রাখা হতে লাগল। এমন কি তার বাড়ির বাইরে বেরুনোও বন্ধ হল।

মনমরা ভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত কুশল। তার তরুণ মন কিছু একটা করার জন্য অস্থির হয়ে উঠতো। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের অসহায়তার কথা মনে

পড়ে গেলে কাহিল হয়ে যেত। বাড়ির পিছন দিকে গাছগাছড়ায় ভরা কিছুটা জমি ছিল। এই নির্জন জায়গায় মিলিত হত দুজনে। বিকেলের পর ওখানেই গিয়ে বসে থাকতো। আর আকাশপাতাল ভাবতো।

সেদিন ওখানেই গিয়ে বসেছিল। সন্ধ্যা তখন হয় হয়। দেড়মাস হয়ে গেল ঋতুর সঙ্গে দেখা হয়নি। আর কখনও একান্তে দেখা হবে কিনা সন্দেহ। আরো কতক্ষণ বসে বসে ভাবতো কে জানে। হঠাৎ চটকা ভাঙল। কে ওর কাঁধে হাত রেখেছে। চমকে মুখ তুলল কুশল।

ঋতু !!!

—তুমি—

—কোন রকমে চলে এলাম।

তারপরই ওকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল ঋতু। কুশল কি বলবে ভেবে পেল না। ওর ভাল লাগছিল, আবার একটা ভয় মনকে সাপটে ধরার চেষ্টা করছিল।

—ওরা কেন ক্ষেপে গেছে বল তো?—ঋতু কুশলের বুক থেকে মুখ তুলে বলল, অত্ন কোন জাতের সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না। তোমার অপরাধ তুমি বাঙালী।

—না, ঋতু, আরো অপরাধ আমার আছে। আর্থিক দিক থেকে আমরা কয়েক ধাপ নীচে রয়েছি তোমাদের, তাছাড়া এখনও আমার চাকরি হয়নি। এমন জামাই কে চায়?

—চাকরি আজ হয়নি—কাল হবে। আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দাম নেই? আমি কার সঙ্গে জীবন কাটাবো তা স্থির করার দায়িত্ব তো আমারই। কিন্তু এ কি অবিচার বল তো।

কুশলের মুখে স্নান হাসি ফুটে উঠলো!

—এদেশের রক্ষণশীল সমাজ এত স্বাধীনতা মেয়েদের দেয় না। এছাড়া তুমি বল ঋতু একজন বেকারের হাতে তাঁরা মেয়ে কেন তুলে দেবেন?

—আমি চাইছি বলে, আর কেন? অহবিধা যদি কাল্পনিক হয়, আমার হবে। সব জেনেই তো আমি এগুচ্ছি।

—তোমার ইচ্ছে বা অনিচ্ছের মূল্য এখানে কানাকড়িও নয়। ওরা যা স্থির করবেন সেটাই তোমার ভবিষ্যৎ।

একটু খেমে ঋতু বলল, আমি কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ ঠিক করে ফেলেছি।

—ঠিক করে ফেলেছো?

—হ্যাঁ। আমি লাবালিকা নিশ্চয় সকলে স্বীকার করবে?

—তাতে সন্দেহের কি আছে ।

—চল না, এদের দৃষ্টি এড়িয়ে আমরা কোথাও চলে যাই । আইন তো আমাদের দিকে । ওখানে আমরা ঘর বাঁধব ।

মহা আশ্চর্য হয়ে কুশল বলল, 'আমরা পালিয়ে যাবো । তুমি—

—এটাই হল ঠিক পথ । এটাই আমাদের ভবিষ্যৎ বেঞ্জ ।

—তুমি ঠিকই বলছো । তবে এর পরই অনেক বাস্তবমুখী প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের হতে হবে । তখন—

কুশলের কথা শেষ হল না । ঠিক সেই সময় দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল রাকেশ । রাগে কাঁপছে সে । সারা মুখে যেন আগুন জ্বলছে । সজোরে এক চড় মারল ঋতুর মুখে । তারপর হাত চেপে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল ।

অবিবাহিতা ঋতুকে সেই শেষ দেখল কুশল ।

তারপর দীর্ঘ বার বছর পরে আজ ঋতুকে দেখল এখানে । তাও বিশ্বাস্য অবস্থায় । কুশল হাই তুলল । ওর সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল ছিল । মনের মধ্যকার এই অস্বস্তিকে আদবেই কাটানো যাবে কিনা সন্দেহ । সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ।

দেখা যাক ঘুম আসে কিনা ।

ওদিকে—

দুশো বোল নম্বর ঘরে খাওয়াদাওয়ার পর কাপড বদলে ঋতু সবে আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে । ভাবতেই পারা যায় না, এত দিন পরে এমন নাটকীয় ভাবে বেঞ্জের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে । মনে হয় সময় ওকে কিছুটা বদলে দিয়েছে । কিন্তু এখনও ভারী স্মার্ট—ভারী আকর্ষণীয় ।

ঋতুর চিন্তা ভাবনায় সময় বাধা পড়ল । দরজা লক করা ছিল না । এক ভদ্রলোক পাল্লা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলেন । বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি । দোঁহার গড়নের, মাঝারি উচ্চতার পুরুষ । পরনের স্টিল কলারের স্মুটে ভাঁজ রয়েছে এখানে ওখানে ।

ঋতু সবিস্ময়ে বলল, দাড়া ! তুমি—

রাকেশ রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে বলল, সন্ধ্যার মুখে পাটনা পৌঁছলাম । দৌলভরাম বলল, তুমি এসেছিলে—আটটার ক্লাইটে চলে যাচ্ছ ।

—গতকাল হাতুয়া মার্কেটে তোমার পার্টনারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ।

—ফোন করে জানলাম প্লেন আজ ছাড়ছে না । তোমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে হোটেলে । ভাবলাম দেখা করেনি । বহু কষ্টে এলেছি ।

—প্রাকৃতিক অবস্থা তো আজ ভারী খারাপ । এসে পড়ে ভালই করেছে ।

ওখানকার খবর কি ? বৌদি ছেলেরা—

রাকেশ পকেট থেকে লিগারেটের প্যাকেট বার করতে করতে বলল, খবর মোটামুটি ভালই। এমাস থেকে এলাহাবাদের কারবারটা ছেলেদের হাতে ছেড়ে দিলাম। একা কত সামলাবো ?

—ভালই করেছে। বলো।

ছদ্মনে বললো মুখোমুখি।

লিগারেট ধরিয়ে নিয়ে রাকেশ বলল, আমি কলকাতাতে যেতাম। দেখা যখন এখানে হয়ে গেল তখন খোলাখুলি কথাবার্তা হোক।

—নিশ্চয়। কোন্ প্রসঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে চাইছো ?

—আগেও বলেছি। তুমি তেমন আমল দাওনি। কথাটা তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে।

জুঁচকে ঋতু বলল, একবার আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমরা ভেবেছিলে, তার পরিণাম দেখতে পাচ্ছ। আবার ও সমস্ত কথা বলে আমাকে কেন বিরক্ত করে তোল ?

—ভাগ্যকে তো দেখা যায় না। লোকটা যে এত তাড়াতাড়ি মরে যাবে কে জানতো। যা হবার হয়ে গেছে। এখন—

—না। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমরা আর ভেব না। আমি এখন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের দুনিয়া দেখা মহিলা। যদি কিছু স্থির করতে হয় তবে তা আমি নিজের দায়িত্বেই করবো।

—একশোবার। আমি তাই চাই তুমি একটা কিছু স্থির' করো। তোমার দেওরদের মতলব ভাল নয়। ওরা আমার বন্ধুস্থানীয়, তাই কিছু কিছু আঁচ পেতে অস্ববিধে হচ্ছে না।

—ওরা আমায় ঠকাবে ?

—হ্যাঁ। আইনের সমস্ত মারপ্যাচ তোমার জানা নেই। তবে তার আগেই আমরা এক চিলে দুই পাখি মারতে পারি।

ঋতুর মুখে বিচিত্র হাসি খেলে গেল। সরে গেল বন্ধু জানলার দিকে।

—অর্থাৎ লোকেশ টানডানকে আমায় বিয়ে করতে হবে ?

—হ্যাঁ। লোকেশ তোমার মেজ দেওর বিনোদের শালা। তখন ছোটজন প্রয়োদকে কিছু করতে দেবে না বিনোদ। নিজের শালায় স্বার্থটাই সে বড় করে দেখবে। তোমার বিবয়সম্পত্তি সমস্ত কিছু সুরক্ষিত থাকবে।

ঋতু প্রলম্বভাবে চলে গেল। পারে পারে ড্রেনিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

মুখ না ফিরিয়েই বলল, তুমি কি শহরে ফিরে যাবে ?

—এই জল হাওয়ায় ফেরা যাবে না । ঘর নিয়েছি হোটেল ।

—কিছু মনে করো না দাদা । আমার এখন বিশ্বাসের দরকার । তুমি বরং এখন নিজের ঘরে যাও । কাল কথা হবে ।

—তুমি সমস্ত ব্যাপারটাকেই এড়িয়ে গেলে । যদি নিজের ভালো বোঝার চেষ্টা না কর, তবে আর কি বলার থাকতে পারে ।

রাকেশ উঠে দাঁড়াল ।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বলল, গুনলাম, আমাদের এলাহাবাদের এক প্রতিবেশীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে ?

—শুধু দেখা নয়, অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তাও হয়েছে ।

—সে কে—

—এই হোটলেই আছে ।

রাকেশ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল ঋতুর দিকে তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে । নির্জন, চান্না করিডর দিয়ে দ্রুত হেঁটে গিয়ে থামল দুশো চল্লিশ নম্বর ঘরের সামনে । করাঘাত করতেই দরজা খুলে গেল । ঘরে তখন শালা-ভগ্নীপোত অর্থাৎ লোকেশ আর বিনোদ ছইস্কির স্বাদ নিচ্ছিল । বিমর্ষ ভঙ্গীতে ওদের পাশে গিয়ে বলল রাকেশ ।

লোকেশ একটা গেলাসে বোতল থেকে পানীয় ঢালবার উপক্রম করতেই রাকেশ বাধা দিল, থাক । মূড নেই ।

বিনোদ গেলাসের তলানিটুকু শেষ করে নিয়ে বলল, মনে হচ্ছে স্ত্রীবিধে করতে পারেনি ?

—ভারী হার্ডনাট ভাই ।

—হার্ড না ছাই । গুছিয়ে বলতেই পাচ্ছ না ।

—বেশ তো । তুমি গিয়ে গুছিয়ে বল না ।

—আমি বললে কাজ হবে না । এক নম্বরের ইভিয়েট হচ্ছে আমার এই স্ত্রীলক । বিয়ে করবেন উনি আর মাথা ঘামাতে থাকবো আমরা ?

গেলাস নামিয়ে রেখে লোকেশ বলল, আপনি আমার গাল দিচ্ছেন কেন ?

—একশোবার দেব । স্মার্ট হবার বড়াই করো, অথচ খোলাখুলিভাবে কথা বলার সাহস পাচ্ছ না ! এদিকে, একজন ধনবতী মহিলাকে বিয়ে করার জন্ত মন উলখুল করছে ।

—জামাইবাবু, আপনি আমাকে ভীতু বলতে পারেন না ।

—পারি। একশোবার পারি।

লোকেশ উত্তেজিতভাবে বলল, কি ভাবে প্রমাণ করা যাবে আমি ভীতু নই।
বলুন—যা বলবেন তাই করবো।

—তোমাকে এভারেস্টের ভগায় উঠতে হবে না। বৌদির কাছে গিয়ে, পরিষ্কার
ভাবে কথা বলে নাও। তবে একটু গুছিয়ে বলার চেষ্টা করো।

—বেশ। আমি রাজী।

লোকেশ উঠে দাঁড়াল।

ঠিক এই সময় ঘরে প্রবেশ করল প্রমোদ। ঋতুর ছোট দেওর। একহারা
গম্ভীরদর্শন চেহারা। চোখে হালকা বাদামী লেন্সের চশমা। একমাথা কাঁচাপাকা
চুল ঘাড়ের কিছুটা নীচে নেমে এসেছে।

—মনে হচ্ছে, গুরুতর কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আমি এসে বাধার
সৃষ্টি করলাম না তো?

প্রমোদের কথা শুনে বিনোদ বলল, না না, তেমন কিছু নয়। বৌদির
ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম।

—আর কত দিন আকাশে কেল্লা বানাবার চেষ্টা করবে?

—তার মানে—

প্রমোদ বসতে বসতে বলল, একটা সরল ব্যাপারকে তোমরা অনর্থক জটিল
করে তুলেছো। বৌদির ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমাদের এই ভাবে মাথা
ঘামানোর কোন মানে হয় না।

বিনোদ গম্ভীর গলায় বলল, তুমি বাস্তব দিকটা একেবারেই লক্ষ্য করছো না।
বৌদির পর তাঁর বিশাল প্রপার্টির ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনও চিন্তা-ভাবনা করেছো?

—এতে চিন্তা-ভাবনার কি আছে। তাঁর যা আছে সব মেয়ে পাবে।

—ঠিক। কিন্তু সেই জামাই বাবাজীবন কেমন হবে আমরা জানি না। তবে
এটা ঠিক, এখনকার মত যৌথ ব্যবস্থাটা বজায় থাকবে না। বিত্তী এক অবস্থার
মুখোমুখি হতে হবে।

এবার প্রমোদের গলায় বিদ্রোহের আমেজ, লোকেশের সঙ্গে বিয়ে হলে সব
দিক বজায় থাকবে, এই কথাই বলতে চাইছে। লোকেশ তো বাইরের লোক।
ভবিষ্যতে যে যৌথ ব্যবস্থাটা বজায় থাকবে তার গ্যারান্টি কি?

—গ্যারান্টি আমি। লোকেশ আমার শালা। লোকেশ এমন কোন কাজ
করবে না যা আমাদের ইন্টারেস্টের বিরুদ্ধে যাবে।

—এখনই কি ভাবে যে একথা বলছো আমার মাথার চুকছে না। যা হোক,

রাকেশবাবু আপনি কি বলেন ?

রাকেশ দ্বিধা জড়ানো গলায় বলল, আপনাদের বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে আমার কিছু না বলাই ভাল। তবে আমি আমার বোনের স্বর্গ ভবিষ্যৎ চাই। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে ও কি পেল বলুন ?

—আপনি অত্নায় কিছু বললেন না। তবে বৌদ্ধিকে রাজী করানো যাবে বলে আমার মনে হয় না। এই সঙ্গে একথা ভুলে গেলে চলবে না, উনি একজন স্বাধীন-চেতা মহিলা। ঠর পছন্দের মাপকাঠিতে রাম-শ্যামরা পড়ে না। আমি বোধহয় অত্নায় কিছু বললাম না। উঠি এবার।

প্রমোদ উঠে দাঁড়াল। তারপর কোন কিছু শোনার প্রত্যাশা না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিনোদ কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল ওর গমনপথের দিকে। বিরক্তির স্বরে লোকেশ বলল, উনি আমাকে প্রকারান্তরে অপমান করে গেলেন। আমি যে রাম-শ্যাম নই সেটা প্রমাণ করে দেব।

বিনোদ নিরাসক্ত গলায় বলল, প্রমোদ স্পষ্ট কথা বলতে অভ্যস্ত। অবশ্য এখন ঠিক কথা বলল কিনা আমি জানি না। তবে তোমার হামবড়াই কয়েক মাস থেকে দেখছি। কাজে নামতে পাচ্ছ কই ?

—আপনি আমাকে এভাবে বলবেন না। আপনার পরিকল্পনা মতই চলছি। সিরিয়ামসি প্রস্তুত করছি, কাজে নামবো ?

—সাত কাণ্ড রামায়ণের পর সীতা কার ভার্য ? তুমি হাসালে লোকেশ। এখনও জানতে চাইছো কাজে নামবে কিনা ? সময় বয়ে যাচ্ছে। এখনও সাহস দেখাতে না পারলে, বাকি জীবন আপসোস করে কাটাতে হবে।

এতক্ষণ পরে রাকেশ বলল, আমার বোন অবশ্য একরোখা ধরনের। তবে আপনি কথাবার্তা বলে দেখতে পারেন।

লোকেশ নিজের রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল।

—আমি তাহলে কাজে নেমে পড়লাম। কাল সকালে আপনারা স্নানবাহাই পাবেন। চলি—

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কুশল সোফা থেকে উঠে আড়ামোড়া ভাঙল। যতই মনকে অত্নাদিকে ফেরাবার চেষ্টা করছে সফল হচ্ছে না। যে ক্ষত শুকিয়ে এসেছিল প্রায়, তা আবার দগদগে হয়ে উঠেছে। ঋতুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা জীবনের এক বিচিত্র মোড়। তবে আশার কথা কলকাতা ফিরে যাবার পর আর ঋতুর সঙ্গে দেখা হবে না। ও আবার

অশান্ত মন নিয়ে নিজের বৈচিত্র্যহীন জীবনে ফিরে যাবে।

কিন্তু ঠিকানা যে ঋতুকে দেওয়া হয়ে গেছে।

মনে হয় না সে খোজখবর নিতে আসবে।

কুশল রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল। দশটা চল্লিশ। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল উত্তর দিকের জানলাটার সামনে। কাঁচে ঢাকা জানলাটার সামনে পুরু পর্দা। পর্দা সরাতেই চোখে পড়ল বাইরে তখনও অবিশ্রান্ত রুষ্টি হয়ে চলেছে। অসময়ে বধা-কালের মত এমন রুষ্টি বড় একটা দেখা যায় না।

এই সময়ে মিষ্টি স্বরে বেল বেজে উঠল।

চকিতে কুশল ফিরে দাঁড়াল।

এই সময় আবার কে এল? বেয়ারা বোধ হয়। কিছু প্রয়োজন আছে কিনা জানতে এসেছে। ওর কোন প্রয়োজন নেই। এখন একমাত্র কাজ ঘুমের চেষ্টা করা। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

বেয়ারা নয়—

ঋতু!

দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ঋতু। তারপর ওর সামনে এসে মিষ্টি করে হাসল।

—অবাক হয়ে গেছো?

—অবাক হবারই তো কথা।

ঋতু ওর আরো কাছ ঘেঁষে বসল, আমি মনস্থির করে ফেলেছি বেঞ্চ। লাগাম ছাড়া জীবন আর ভাল লাগছে না।

—তুমি কি বলতে চাইছো?

—তোমার সঙ্গে নাটকীয় ভাবে দেখা হয়ে যাওয়াটা দৈবাৎ ঘটনা নয়, এটা দৈবের অভিপ্রেত। আমি তোমাকে আর হারাতে চাই না।

—ঋতু—

—আমার সব আছে তবু আমি ক্লান্ত। এখন আমি তোমার ওপর নির্ভর করে শুধু ক্লান্তির হাত থেকে বাঁচতে চাই না—জীবনটা খুলতে ভরিয়ে তুলতে চাই। বলো বেঞ্চ—তুমি কি—

দ্রুত গলায় কুশল বলল, সময় সময় মানুষের জীবনে এমন অকল্পনীয় পরিবর্তন আসে যাতে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। আমি সেই অমুভূতির মুখোমুখি এখন। একটু আগে অন্য কথা ভাবছিলাম। মনে হচ্ছিল—

—কি মনে হচ্ছিল তোমার?

—ও কথা যেতে দাঁও। তুমি যদি সত্যি মন স্থির করে ফেলে থাকো তবে, আমি নিজের ভালবাসাকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে চাই। আমি প্রমাণ করতে চাই আমার চেয়ে স্থখী মানুষ আর কেউ হবে না।

—বেঞ্চ—

ঋতু কুশলের বৃকে ভেঙে পড়ল।

দু হাত দিয়ে সাপটে ধরে কুশল ওকে। নিজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে চাইল। কতক্ষণ এইভাবে কেটে গেল তার সময়ের হিসাব দুজনের কেউ রাখেন। তারপর দুজনে দুজনের কাছ থেকে একসময়ে সরে এল। দুজনের মুখই উদ্ভাসিত। বল গিয়ে দুজনে পাশাপাশি মোড়ান।

কুশল বলল, এরপর আমাদের করণীর কি?

ঋতু কুশলের কাঁধে মাথা রেখে বলল, কলকাতায় ফিরেই আমাদের প্রথম কাজ হবে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে যাওয়া। তারপর তোমাকে গিয়ে উঠতে হবে আমার পাম এন্ডানউ-এর ফ্ল্যাটে। ছোট ফ্ল্যাট। অস্থবিধা হবে।

—কলকাতায় আমার ছটা বাড়ি আছে। তবু আমি তোমার ফ্ল্যাটেই উঠবো। যত ছোটই হোক না কেন, তুমি দেখে নিও, কি চমৎকার ভাবে আমি ওখানে মানিয়ে নিয়েছি। তবে—

—কি হল?

—সব ঠিক থেকেও যেন ঠিক নেই। একটা কাঁটার মত কিছু মনে মধ্যে বিধছে। বোধহয় মন বলতে চাইছে, আমি তোমাকে ঠকাতে চলেছি।

বিশ্বস্তের স্বরে কুশল বলল, তা কেন? আমরা তো সব দিক বিচার করেই পা বাড়িচ্ছি। তুমি আমাকে ঠকাবে কেন?

ঋতু সোজা হয়ে বসে বলল, আমাদের বিচারবিবেচনার মধ্যে লুনার হিসাবটা আমরা ধরিনি। আমার মেয়ে লুনা। আমি তোমার জীবনে যাব—অথচ লুনা—
সে—

গলা তুলে হাসল কুশল।

—তাকে তো হিসাবের মধ্যেই রেখেছি। সে আমার মেয়ে।

ঋতু নিবিড় ভাবে সরে এল কুশলের দিকে।

—তুমি তো কোন পরীক্ষাতেই ফেল করছো না!

—কখনও তো কোন পরীক্ষায় ফেল করিনি।

ঋতু হাসল।

—যাক, অনেক দিন পরে ভারী ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে, মাঝের বারটা

বছরের কঁক মিলিয়ে গেছে। পার্থক্যের মধ্যে আমরা ছন্দ শুধু এলাহাবাদে নেই, পাটনায় আছি।

—কলকাতায় একসঙ্গে থাকবো।

—ঠিক। আচ্ছা, লুনা কি আমাদের সম্পর্কটা খুসী মনে মেনে নেবে?

কুশল এতক্ষণ পরে সিগারেট ধরিয়েছিল।

ধোঁওয়া ছাডতে ছাডতে বলল, মনে হয় না মেনে নেবে। বিরক্ত হবে। অবাধ্যতা করবে। তোমার মুখের ওপর এমন কথাও বলতে পারে যা ওর বলা উচিত নয়।

—কি হবে তাহলে?

—আমাদের দীর্ঘ ধৈর্য পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। ভাল ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে আমাকে। সময় কাটবে। ওর মনও নরম হতে থাকবে। স্বাভাবিক নিয়মের এই তো দস্তুর।

—ঠিকই বলছো। ওর প্রাথমিক বেয়াদপি আমাদের সহ্য করে যেতে হবে। মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত ও তোমাকে ভাল না বেসে থাকতে পারবে না।

—কেন এমন মনে হচ্ছে তোমার?

—আমি কি তোমায় ভাল না বেসে থাকতে পেরেছিলাম। জীবনে এত ঠা-পড়া গেল, তোমাকে আমি ভুলতে পারিনি। ভোলার চেষ্টাও করিনি কখনও।

ঋতু উঠে দাঁড়াল।

—যাচ্ছ—

—না। রাতটা এখানেই থাকবো ভাবছি।

অবাক হয়ে কুশল বলল, এখানে থাকবে?

—হ্যাঁ। তোমার কাছে থাকবো। তুমি অবাক হচ্ছ কেন? আমার কি মনে হচ্ছে জান, তুমি এখনও সিরিয়াস হতে পারনি।

কুশল সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এস।

ঋতুর কাঁধে হাত রেখে বলল, এত সিরিয়াস বোধহয় আমি কখনও হইনি। তবে সংস্কারের ছিটেকোটা বোধহয় এখনও মনের মধ্যে রয়ে গেছে।

—তাহলে—

—তাহলে আবার কি? আমরা একসঙ্গেই থাকছি।

কথা শেষ করে কুশল হাসল। হাসিতে যোগ দিল ঋতু।

শুয়ে শুয়ে গেল

পা থেকে কঞ্চলটা সরিয়ে ঋতু উঠে বসল। হাঁকা পাওয়ারের ম্লান আলো ঘরে ছেয়ে রয়েছে। মুখ কিরিয়ে দেখল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন কুশল একপাশ হেলে শুয়ে রয়েছে। প্রশান্তিতে মন ভরে উঠল ঋতুর। কত—কতদিন পরে এমন একটা আকাজ্জিত দিন ওরা দুজন একসঙ্গে কাটাতে পারল।

বিছানা থেকে ঋতু নামল।

কুশলকে এখন তুলবে না। মায়ী হল। ঘুমচ্ছে ঘুমোক। জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে পর্দা সরিয়ে দেখল বৃষ্টি আর হচ্ছে না। অবশ্য আকাশে ছেঁড়া, ছেঁড়া মেঘের ভেসে বেড়ানোর বিরাম নেই। রিস্টওয়ার্চের দিকে তাকাল ঋতু, ছটা দশ। মনে হয় বেলা নটাব মধ্যে ওবা রওয়ানা হতে পাববে।

দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে এল।

একজন বেয়ারার সঙ্গে দেখা হল। সে দ্রুত এগুচ্ছিল, ঋতুকে দেখে গতি সংযত করে জানতে চাইল, ম্যাডামের এখনই চায়ের দরকার হবে, না, আধঘণ্টা পরে আনবে? ঋতু তাকে জানিয়ে দিল ২১৬ নম্বর ঘরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চা যেন দিয়ে যায়।

কয়েক পা এগিয়ে ঋতু নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। অন্তরমনস্কতার দরুন দরজায় চাবি লাগিয়ে যায়নি। বড় আলোটা জ্বলছিল। ড্রোিং টেবিলের সামনে গিয়ে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। কুশলের কথা মনে পড়ল। চিরুনি তুলে নিয়ে, চুল ঠিক করে নেবার পর খাটেব ওপর ঋতু এসে বসল। জীবনে এই প্রথমবার হোটেলে থাকার অভিজ্ঞতা হল তার।

মনোরম অভিজ্ঞতা।

বেয়ারা ট্রেতে পট আর পেয়লা সাজিয়ে ঘরে ঢুকল এই সময়। ততক্ষণে সাইডপিসের ওপর রাখা ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে ঋতু কাউন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। জানতে চেয়েছে কলকাতার ক্লাইট কখন ছাড়বে। বিনীত উত্তর এসেছে এখনও জানানো হয়নি। থবর এলেই ম্যাডামকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

রিসিভার নামায়ে রেখে ঋতু উঠে দাঁড়াল।

বেয়ারা তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—তুমি কাপে চা ঢাল। আমি মুখ ধুয়ে আসছি।

ঋতু বাথরুমের দিকে এগুলো। দরজা ভেজানো ছিল, একটা পাল্লা হাত দিয়ে সরাতোই স্তম্ভিত হয়ে গেল। আড়াআড়ি ভাবে, উপুড় হয়ে পড়ে আছে একজন সবল পুরুষ। সাজপোশাক মূল্যবান। মুখ দেখা যাচ্ছে না।

অজ্ঞাতেই ঋতুর মুখ থেকে আর্ত শব্দ বেরিয়ে এসেছিল। বেয়ারা দ্রুত এগিয়ে

গেল বাধকরের দিকে। এক ঝলক দেখে নেবার পরই তার বহুদর্শী মনের বৃক্কে উঠতে অস্ববিধা হল না, একটা লোক মরে পড়ে আছে। ঋতুর শরীর থরথর করে কাঁপছিল। কোন রকমে সরে এসে বিছানার ওপর পড়ল।

বেয়্যারা দ্রুত গলায় বলল, আপনি নার্তাস হবেন না ম্যাডাম। আমি এখনই ম্যানেজারকে খবর দিচ্ছি।

এই ঠাণ্ডাতেও ঋতুর কপালে ঘাম ফুটে উঠেছিল। গলা কেমন কাঠ কাঠ হয়ে যাচ্ছিল। কোন রকমে বলল, ২১০ নম্বরে মিঃ ব্যানার্জী আছেন। ওকে এখানে আসতে বল।

বেয়্যাবা দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঋতুর গা-বমি বমি করতে আরম্ভ করেছে। ও এখন ক করবে?

কয়েক মিনিটের মধ্যে কুশল এসে পড়ল। সংবাদ পেয়েই ও বিশ্বাসের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে। বাধকমে একবার ঊকি মেরে নিয়েই ঋতুর পাশে এসে বসল। মৃত ব্যক্তির ওর পরিচিত হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ঋতুকে এখন কোন প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। ভারী নার্তাস হয়ে পড়েছে বুঝতে পারা যায়।

বিচলিত ভঙ্গিতে ম্যানেজার এলেন কয়েকজন কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে। এই দুঃসংবাদ কি ভাবে যেন চাউব হয়ে গিয়েছে। বহু বোর্ডার ২১৬ নম্বর ঘরের সামনে এসে ভাঁড় করে দাঁড়িয়েছেন। নানা ধরনের প্রশ্ন আর মন্তব্য ছয়লাপ চতুর্দিক। ম্যানেজার বহুদর্শী ব্যক্তি। তিনি দ্রুত বাধকরের চারধারে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন।

কয়েক পা এগিয়ে এসে মহিলাকে প্রশ্ন করলেন, কিভাবে ব্যাপারটা ঘটল বলুন তো?

ঋতু কোন রকমে বলল, আমি কিছু জানি না।

—আপনার বাধকমে—মানে—

কুশলের দিকে তাকাল ঋতু।

ওর দু চোখে অসহায়তা ছাপিয়ে এসেছে।

—উনি ঘরে ছিলেন না।

কুশলের কথা শুনে ম্যানেজার অবাক হলেন।

—ছিলেন না! কোথায় গিয়েছিলেন?

ঋতু ধরা গলায় বলল, আমি মিঃ ব্যানার্জীর ঘরে ছিলাম।

—ম্যাডাম, আপনি কি মৃত ভদ্রলোককে চেনেন?

—মুখ দেখতে পাইনি। বলতে পারবো না উনি কে।

এই সময় ঘরে হুড়মুড় করে প্রবেশ করল ঋতুর দাড়া আর দুই দেওয়। তাদের মুখের অবস্থা দেখবার মত। এছাড়া ঋতুর পাশে কুশলকে ঘনিষ্ঠ ভাবে বসে থাকতে দেখে মন আরো উত্তাল হয়ে উঠল রাকেশের। ওরা তিনজন সকলকে ঠেলেঠেলে বাথরুমের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপরই আতঁরব বেরিয়ে এল বিনোদের মুখ থেকে।

—এ কি ! এ তো লোকেশ—

ম্যানেজার দ্রুত গলায় প্রশ্ন করলেন, আপনি চেনেন ?

—আমার ঞালক। হে ভগবান, মরে গেছে নাকি ?

—তাই তো মনে হচ্ছে। ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। বডি আপনারা কেউ ছোঁবেন না। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে।

বলতে গেলে ম্যানেজারের কথা শেষ হবার পরই সদলবলে স্থানীয় থানার দণ্ডমণ্ডের কর্তা রমেশ পরিহার ঘরে ঢুকলেন। বিহার পুলিশের মার্কামারা চেহারার পরিহার কিছুটা গভীরদর্শন। ম্যানেজারের সঙ্গে তার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। মাঝে মাঝে অকারণেই হোটেলে পদার্পণ করেন মুখ বদলাবার জ্ঞত।

তিনি চারধারে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ছকার ছাড়লেন, ব্যাপারটা কি ? বডি কোথায় ? কার নামে ঘর বুক হয়েছিল ?

প্রশ্নমালার মুখোমুখি হয়ে ম্যানেজার একছুটা ঘাবড়ালেও, যতদূর সম্ভব সংযত গলায় বললেন, ব্যাপারটা যে প্রকৃতপক্ষে কি তা আমিও জানি না। বডি বাথরুমে পড়ে আছে। লোকটা অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে মনে হয়। এই ম্যাডাম—ঋতু মাথুরের নামে ২১৬ নম্বর বুক রয়েছে।

পরিহার আপাদমস্তক একবার ঋতুকে নিরক্ষণ করে নিয়ে, বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন। মৃতদেহ একজন কনস্টেবলের সাহায্যে সোজা করে শোয়ালেন। বেশ শক্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ রাইগার মার্টিন সেট ইন করে গেছে। ম্যানেজারের অনুমানই ঠিক, বহুক্ষণ আগে মারা গেছে লোকটা। ঘণ্টা ছয়েক আগে তো বটেই। কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই। গলায় যে চাপ স্টি করা হয়েছে তেমনও কোন বৈলক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

হার্টফেল ?

তাই যদি হবে, তবে লোকটা পরের ঘরের বাথরুমে এসে মরল কেন ? অকারণে নিশ্চয় কিছু ঘটেনি। প্রগাঢ় ঘোঁবনা মহিলা আর যুবকের মৃতদেহ—ব্যাপারটা স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখার কোন মানে হয় না। হিন্দীতে যাকে বলে “ভাল মে কালা”, সেরকম কিছু একটা নিশ্চয় আছে।

পরিহার বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে আদেশ জারী করলেন, ঘর থেকে সকলে বাইরে যান। আমি এখন মিসেস মাথুরের সঙ্গে কথা বলবো।

বিনোদ মনমরা গলায় বলল, আমার কথা শুনুন ইন্সপেক্টার সাহাব। যে মারা গেছে তার নাম লোকেশ। ও আমার শালা।

পরিহার নিজের শরীরটা একবার তুলিয়ে নিলেন।

—আপনার সশঙ্কী। ভাল কথা। আপনার নাম কি?

—বিনোদ মাথুর। এ আমার ছোট ভাই প্রমোদ। আর ইনি রাকেশ দিক্তি আমার স্বর্গীয় দাদার সশঙ্কী।

—চমৎকার। সশঙ্কীর ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে। বিনোদবাবু, এবার বলুন তো আপনার সশঙ্কী এই মহিলার বাথরুমে কেন ঢুকেছিলেন?

—তা তো বলতে পারবো না। আমি আর লোকেশ একই ঘরে ছিলাম। ও নাড়ে দশটার পর ঘর থেকে বেরিয়েছিল। তারপর আমি আর কিছু জানি না।

—লোকেশ কে?

—যে মারা গেছে। মানে—

—ও। লোকেশ রাতভোর ঘরে ফিরল না, আপনার তা নিয়ে কোন হুশিষ্ঠা হল না।

বিনোদ আমতা আমতা করে বলল, বেশী ড্রিক করে কলেছিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেই জানি না। সকালে প্রমোদ আমাকে ঠেলে তুলে এই হুঃসবাদ দিল।

—মিসেস মাথুরের সঙ্গে লোকেশের আলাপ পরিচয় ছিল?

—ছিল। উনি আমার বৌদি।

পরিহার এবার সচকিত হলেন।

—তাহলে উনি—কি যেন নাম বললেন—

—রাকেশ দিক্তি।—রাকেশ বলল, ঋতুর আমি বড ভাই।

—আপনাদের পরিচয় পাওয়া গেল। ইনি কে? ইনিও কি আপনাদের আত্মীয় স্থানীয় কেউ?

পরিহারের ইঙ্গিত কুশলের দিকে।

রাকেশই উত্তর দিল, আমাদের আত্মীয় নন। এলাহাবাদে প্রতিবেশী ছিলেন। হোটলে দৈবাৎ ঋতুর সঙ্গে ওর দেখা হয়।

কুশল উঠে দাঁড়াল।

—আমি কুশল ব্যানার্জী। “ওভারসিজ ইন্টারজাশনাল”-এর এক্সিকিউটিভ।

কাজে পাটনায় এসেছিলাম ।

পরিহার বললেন, ঠিক আছে । এবার আপনি নিজের ঘরে যান । পরে আপনার সঙ্গে কথা বলবো । ভাল কথা, কত নম্বর ঘরে আছেন ?

—২১০ । অলমোর্স্ট এই ঘরের প্রায় সামনে ।

কুশল গমনোত্তম হবার আগেই ঋতু বলল, ইন্সপেক্টর সাহাব মিঃ ব্যানার্জীকে এখানে থাকার অনুমতি দিন ।

—কেন ?

—আমি রিলিফ বোধ করবো ।

পরিহারের মুখে বিজয়ের হাসি দেখা দিল ।

তিনি কিছু বলার আগেই বিরক্তিশূচক ভঙ্গীতে রাকেশ বলল, এর মানে কি ? আমি রয়েছি, তোমার দেওররা রয়েছে, তারপরও—

ঋতু ধরা গলায় বলল, হ্যাঁ । তারপরও—

—প্রত্যেক ব্যাপারের সীমা থাকা উচিত । তুমি কি বলছো তার অর্থ তুমি নিজেও বুঝতে পারছ না ।

—আপনি উত্তেজিত হবেন না ।—পরিহার বললেন, বুঝতেই পারা যাচ্ছে আপনাদের চেয়ে উনি মিঃ ব্যানার্জীর উপরই বেশী আস্থাশীল । হ্যাঁ, বিনোদবাবু, আপনার সঙ্গে কথাটা এবার শেষ করি ?

—বলুন ?

—আপনারা দল বেঁধে পাটনায় এসেছিলেন কেন ?

—এখানে একটা ব্যবসায় তিনজনেরই শেয়াব আছে । দাদা তো নেই, বৌদিকে নিয়ে তাই মাঝে-মধ্যে আসতে হয় ।

—আপনার সম্বন্ধী তো শেয়ারহোল্ডার নয় । সে এসেছিল কেন ?

—লোকেশ নাগপুরে ব্যবসা করতো । কলকাতায় এসেছিল কাজে । আমিই ওকে এখানে টেনে এনেছিলাম ।

ব্যক্তির স্বরে পরিহার বললেন, টেনে আনার ফল তো হাতেহাতেই পেয়েছেন । যা হোক, এবার বলুন, রাত সাড়ে দশটার পর আপনার ঘর থেকে বেরিয়ে লোকেশ কোথায় গিয়েছিল ।

একটু ইতস্তত করে বিনোদ বলল, আমার কিছু বলে যায়নি ।

প্রমোদ আর রাকেশ বোধহয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ।

—আপনার সম্বন্ধীর কোন রোগ ছিল ? ব্লাডপ্রেসার টাইপের কোন রোগ ?

—আমি তো সেরকম কিছু শুনিনি ।

পরিহার এবার রাকেশের দিকে তাকালেন ।

—এবার আপনাকে গোটাকতক প্রশ্ন করি ?

—বলুন ?

—আপনিও কি এ দের সঙ্গে কলকাতা থেকে এসেছিলেন ?

—না । আমি গতকাল সকালে এলাহাবাদ থেকে এখানে এসেছিলাম । এক-জনের মুখে শুনলাম আমার বোন ব্যবসার কাজে পাটনায় এসেছে । গেলাম ওদের বাড়িতে । শুনলাম ওরা এয়ারপোর্ট চলে গেছে ।

—আপনিও দুগোশ মাধায় নিয়ে এখানে চলে এলেন ?

—হ্যাঁ । অনেক দিন বোনের সঙ্গে দেখা হয়নি তাই এলাম ।

—তারপর কি হল ?

—হোটলে এসে বিনোদবাবুদের সঙ্গে প্রথমে দেখা হল । ওরাই আমার জন্ত ঘর বুক করলেন । তারপর আমি ঋতুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম । মিনিট পনেরো বোধহয় আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল ।

—এই ঘর থেকে বোরিয়ে আপনি কোথায় গেলেন ?

—নিজের ঘরে । রাতভোর আমি ওখানেই ছিলাম ।

—আপনাদের দুজনের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়ে ছিল ?

—নিভাস্থই পারিবারিক ।

—আপনি মৃত লোকেশকে আগে থেকে জানতেন ?

—জানতাম । আগে দেখা হয়েছে বার দুয়েক ।

—কুঁচকে পরিহার এবার কি ভাবলেন ।

—ঠিক আছে । এবার প্রমোদবাবুকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো ।

প্রমোদ নড়েচড়ে বসে বলল, আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে ইন্সপেক্টর সাহেব । আপনি আমাদের এত প্রশ্ন করছেন কেন ? লোকেশ হার্টফেল করে মারা গিয়ে থাকতে পারে ?

—অবশ্যই পারে । তবে এই ধরনের ব্যাপারকে আমরা বাঁকা চোখেই দেখে থাকি । পোস্ট মর্টমের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত আপনারা সকলেই সন্দেহ-ভাজন । আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হবার পরই বাড়ি চালান করে দেব । মনে হয় সন্ধ্যা নাগাদ রিপোর্ট পাওয়া যাবে । এবার আপনার সন্দেহ হওয়ার অ্যাডাউটসটা বলুন ?

—ভেমন কিছুই নয় । ফ্লাইট ক্যানসেল হয়ে যাওয়ার ভারী বিরক্ত বোধ করছিলাম । থাওয়াগাওয়ার পর ডাইনিং হল থেকে সোজা নিজের ঘরে ফিরে আসি । সারারাত ঘরেই ছিলাম ।

—দুর্ঘটনার সংবাদ পেলেন কি ভাবে ?

—রেয়ারা গিয়ে খবর দিল। আমি মেজদা আর রাকেশবাবুকে তুললাম।
তারপর তিনজনে এখানে চলে এলাম।

—লোকেশের এই ঘরে আসার কি কারণ থাকতে পারে বলতে পারেন ?

—আমার জানা নেই।

—আপনার বৌদির সঙ্গে লোকেশের সম্পর্ক কি রকম ছিল ?

এবার ঋতু বলে উঠল, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না।

পারহার বললেন, এখন কিছু বলবেন না। আপনার সঙ্গে পরে কথা বলছি।
প্রমোদবাবু, প্রশ্নের উত্তরটা দেন ?

প্রমোদ বলল, কোন সম্পর্ক ছিল বলে আমি জান না। দুজনকে কখনও
কথাবার্তা বলতে দেখিনি।

—এবার আপনারা নিজের ঘরে চলে যান। আমি মিসেস মাথুর আর
মিঃ ব্যানার্জীর সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাই। ম্যানেজার সাহাব, আপনিও গিয়ে
এবার নিজের কাজকর্ম ককন।

অনিচ্ছার সঙ্গে সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরিহার সিগারেট ধরালেন এবার।

এক মুখ ধোয়া ছেড়ে বললেন, ম্যাডাম, দেখে শুনে মনে হচ্ছে আপনি একজন
ধনী মহিলা। নিজের সম্পর্কে কিছু বলবেন ?

ঋতু নিজেকে এতক্ষণে কিছুটা স্বাভাবিক করে এনেছে।

শান্ত গগায় বলল, বছর ছয়েক আগে আমার স্বামী মারা গেছেন। তিনি
একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রেখে যাওয়া সমস্ত কিছু আমি পেয়েছি।

—সম্পত্তির পরিমাণ কি রকম ?

—আমার পাঁচখানা কলকাতা আর একখানা পাটনায় বাড়ি আছে। এ ছাড়া
যৌথ এবং একক ব্যবসাও আছে।

—এ তো কয়েক কোটি টাকার ব্যাপার। এবার বলুন তো আসলে কি
ঘটেছিল ?

—বিশ্বাস করুন, কি ভাবে কি ঘটেছে আমি নিজেই জানি না।

—আপনার বাধক্ৰমে একজন লোক মরে পড়ে আছে, অথচ আপনি কিছু
জানেন না ? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

—মিথ্যাকথা বলছি না। সত্যি আমি কিছু জানি না। আমি তো মানে—

—বলুন ? কিছু লুকোবেন না।

একটু ইতঃস্তত করে ঋতু বলল, রাত্রে আমি ঘরে ছিলাম না ইন্সপেক্টর সাহেব।
ভোর ছটার পর এখানে এসেছি। বেয়ারা তখন সঙ্গে ছিল।

—রাত্রে কোথায় ছিলেন ?

—মিঃ ব্যানার্জীর ঘরে।

—কটার সময় গিয়েছিলেন ওখানে ?

—রাত সাড়ে দশটার পর।

—আমি শুনলাম বহু বছর পরে আপনার সঙ্গে মিঃ ব্যানার্জীর দেখা। এখন
আপনি বিধবা, অথচ—

গাঢ় স্বরে ঋতু বলল, ব্যাপারটা আমার ব্যক্তিগত। এ সম্পর্কে কারুর সঙ্গে
আলোচনা করাটা আমার পছন্দ নয়। তবে এক্ষেত্রে—ব্যানার্জীর সঙ্গে আমার
বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। এরপর আমাদের
দুজনের জীবনে ঝড়ঝাপটা এল। এতদিন পরে গত সন্ধ্যায় হঠাৎ দেখা হল
আমাদের। আমরা কেউই কাউকে ভুলতে পারিনি ইন্সপেক্টর সাহেব। এবার
আমরা নতুন জীবন আরম্ভ করতে চাই।

—হঁ। একজন মহিলার মুখ থেকে এমন পরিষ্কার কথা এর আগে আমি
শুনিনি। এনিওয়ে, আপনি তো বলছেন ঘরে ছিলেন না। লোকটা ঢুকলো
কি ভাবে ?

—আমি চাবি বন্ধ করিনি। দরজা নরমাল ল্যাচে আটকানো ছিল।

—লোকেশ কেন আপনার ঘরে এসেছিল ? এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন ?

—সঠিক ভাবে বলতে পারবো না। তবে আন্দাজ করতে পারি।

—বেশ তো আপনার আন্দাজটাই শোনা যাক ?

—আমার দেওররা এবং আমার দাদা চান, আমার আবার বিয়ে হোক।
এইভাবে জীবন কাটানো আমার উচিত নয়। বলা বাহুল্য এ সমস্ত আমার
একেবারেই পছন্দের ব্যাপার নয়।

—আপনার বিয়ে করা না ওদের পাত্র পছন্দ করা, কোনটে আপনার পছন্দ
নয়।

—দুটোই। তখন তো জানতাম না, ব্যানার্জীর সঙ্গে নাটকীয় ভাবে দেখা
হয়ে যাবে। আমার মেজ দেওর নিজের সৎস্বামী লোকেশ ট্যাঙনকে পাত্র ঠিক
করলেন। এতে তাঁর সুবিধা অনেক। আমার পুরো সম্পত্তির ওপর উনি ছড়ি
ঘোরাতে পারবেন। আমার আপত্তি আছে কেনেও ব্যাপারটাকে জিইয়ে রাখা
হচ্ছিল। মনে হয় লোকেশকে পাঠানো হয়েছিল আমার মনের গভীরতা মেপে

দেখতে। ভাগ্যক্রমে আমি সে সময় ঘরে ছিলাম না।

মনে মনে মহিলার তারিফ না করে পারলেন না পরিহার। বললেন, আপনাকে ঘরে না দেখে লোকেশের তো ফিরে যাবার কথা।

—উচিত তো তাই ছিল।

—তা হল না কেন? বাধকরমে ঐ ভাবে পড়ে থাকার কারণ কি?

কিছুটা অসহিষ্ণু ভাবে ঋতু বলল, আমি কি ভাবে জানবো? তদন্ত করার দায়িত্ব আপনার। এব উত্তর তো আপনি দেবেন।

—ঠিক আছে ম্যাডাম, আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবো না প্রযোজন্য হলে পরে কথা হবে। মিঃ ব্যানার্জী এবার আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই?

কুশল বলল, বেশ তো। কি জানতে চান বলুন?

পরিহার গলা বেঁড়ে নিয়ে বললেন, মিসেস মাথুর বলছেন, উনি সারারাত আপনার ঘরে ছিলেন, কথাটা কি ঠিক?

—উনি ঠিকই বলেছেন।

—এটা কি সঙ্গতিপূর্ণ?

গলায় তীক্ষ্ণতা এনে কুশল বলল, এই ধরনের অবাস্তব প্রশ্ন অর্থহীন। ব্যক্তিগত ব্যাপারে অত্ৰ কেউ মাথা গলাক এটা আঁমও চাই না।

—লোকেশ ট্যাগুনকে আপনি চিনতেন?

—না।

—আগে কখনও দেখেছেন?

—না।

—এই হোটেলে মিসেস মাথুরের যে কজন আত্মীয় পরিজন উপস্থিত রয়েছেন তাঁদের মধ্যে কাউকে চেনেন?

—ঋতুর বড ভাই রাকেশবাবু ছাড়া আর কাউকে চিনি না।

—ঘটনাটা কি ভাবে ঘটল, এই সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে?

—ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছি না। ব্যাপারটা ভারী জটিল।

—জটিল তো বটেই। আপনি বা মিসেস মাথুর কোন কারণে গভরাঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন?

—না।

—কত রাত পর্যন্ত জেগেছিলেন?

—ছুটোর কাছাকাছি ঘুমিয়ে ছিলাম।

—আপনারা দুজনেই বললেন লোকেশ ট্যাগুনের মৃত্যু সম্পর্কে আপনারা

কিছুই জানেন না—কথাটা ঠিক তো ?

—একশোবার ঠিক ।

পরিহার এবার ঋতুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আর একটা প্রশ্ন আছে ।
আপনার দেওর এবং বড় ভাই ছাড়া আর কেউ সঙ্গে আছে ?

ঋতু ভ্রূ কঁচকে বলল, আর কেউ ? ও ঠ্যা, আমার ম্যানেজার ব্রজবাবুও
কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে এসেছিলেন ।

—তিনি কোথায় এখন ?

—মনে হয় করিডরেই আছেন । আপনাদের ভয়ে ঢুকতে সাহস পাচ্ছেন না ।
উনি নার্ভাস প্রকৃতির ।

—এর অর্থ হল তিনিও এই হোটেলে রয়েছেন ?

—হ্যাঁ । ২১ নম্বর ঘরে আছেন ।

—আর একটা কথা ম্যাডাম—

—বলুন ?

—আপনাকে অগ্ন ঘরের ব্যবস্থা দেখতে হবে । আমাদের কাজ শেষ হলোই
এই ঘর শীল করে দেওয়া হবে ।

—ঠিক আছে । আমি নিজের মালপত্র অগ্ন সরিয়ে নিচ্ছি ।

ঋতু এগিয়ে গিয়ে কলিং বেল পুস করল । পরিহার আর কিছু না বলে বাথ-
রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন । ছবিটিবি তোলা হয়ে গেছে । বডি পোস্টমর্টমের
উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার তোড়জোড় চলেছে ওখানে । অগ্নাঘ্ন কাজও মোটা-
মুটি শেষ হয়ে এসেছে ।

বেল শুনে বেয়ারা এসে পড়েছিল ।

ঋতু বলল, স্ট্রাকেশ তুটো আর টুকিটাকি যে সমস্ত জিনিস রয়েছে, সমস্ত
২১০ নম্বর ঘরে গিয়ে রাখো ।

বেয়ারা কাজে লেগে গেল ।

কুশল দ্রুত গলায় বলল, এ কি করছো ?

—তুমি ঘাবড়ে গেলে ?

—তা নয় । আমরা একই ঘরে থাকলে তোমার শব্দরবাড়ির লোকেরা,
তোমার দাদা ঝামেলা বাধাতে পারে ।

ঋতু মিষ্টি করে হেসে বলল, ওরা জেনেছে, কাল রাতে আমরা একই ঘরে
ছিলাম ।

—আমি তোমার ভালর জন্যই বলছি, এখন আমাদের আলাদা আলাদা ঘরে

ধাকাই ঠিক হবে।

—এখন তো মালপত্রগুলো তোমার ঘরে ঢুকুক, তারপর না হয় যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

পরিহার সহকারীদের কিছু নির্দেশ দিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে করিডরে এসে দাঁড়ালেন। তখনও সেখানে বেশ কয়েকজন ঐশ্বর্য্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ইন্সপেক্টরকে দেখেই পিছু হটলেন কয়েকজন।

পরিহার গলা তুলে বললেন, এখানে ব্রজবাবু আছেন?

একজন এগিয়ে এসে বললেন, আজ্ঞে, আমি ব্রজমোহন বর্মণ।

—কিছু কথা আছে। আপনার ঘরে চলুন।

—২২ নম্বরে আছি। আহুন—

ঘরে এসে পরিহার বললেন।

ব্রজবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন বিনীত ভঙ্গীতে।

—আমায় কিছু বলবেন বলছিলেন?

—হ্যাঁ। ভারী বিস্তী ব্যাপার ঘটে গেছে কি বলেন?

—সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। এমন যে এখানে ঘটবে ভাবাই যায়নি।

—আপনি কতাদন এদের এখানে চাকরি করছেন?

—তা বছর কুড়ি হবে।

পরিহার একটু হেলে বসে বললেন, তার মানে মাথুর সাহেবের আমল থেকে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিন আমাকে চাকরি দিয়েছিলেন।

—আপনার কাজটা কি?

—কলকাতা আর পাটনায় অনেকগুলো বাড়ি আছে মেমসাহেবের। ভাড়া আদায় করি। প্রয়োজনে মেরামতের কাজ তদারক করি। ব্যবসার কাজেও মাঝেমধ্যে আমাকে লাগিয়ে দেওয়া হয়।

—এই প্রথম এলেন, ন', আগেও পাটনায় এসেছেন?

—মেমসাহেব যখনই পাটনায় আসেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন।

—বর্মণবাবু, এবার ভেবেচিন্তে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। এই পরিবারের ভেতরের ব্যাপরটা কি বলুন তো? ইতস্তত করবেন না, মনে রাখবেন, আপনি পুলিশের জেরার মুখে আছেন।

একটু থেমে, নিজের সঙ্কোচ কাটিয়ে বোধহয় ব্রজবাবু বললেন, পারিবারিক গোলমাল এঁদের দীর্ঘদিনের। সাহেব যখন বেঁচে ছিলেন, দুই ছোট ভাই ওকে সব সময় উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা করতেন। উনি মায়া যাবার পর থেকে মেমসাহেবকে

কম ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে না। সবই বিষয়সম্পত্তি নিয়ে। মেজবাবু আর ছোট-বাবু দুজনেই ভারী লোভী। তবে মেমসাহেব শক্ত ধাতের মহিলা। ওঁকে কবজায় আনা সহজ কথা নয়।

—মায়া গেছেন যিনি—লোকেশ ট্যাগুনকে চিনতেন ?

—চিনবো না ! মেজবাবুর শালা। রঙীন মেজাজের লোক। ছিল।

—ওর সম্পর্কে আপনি আর কি জানেন ?

—ইদানীং একটা কথা কানে আসছিল, উনি নাকি মেমসাহেবকে বিয়ে করতে চান। আপনি বুঝতেই পারছেন স্মার, এ সমস্তই সম্পত্তি গাপ করার ষড়যন্ত্র।

—এ সম্পর্কে আপনার মেমসাহেবের মনোভাব কি ?

—খুবই খারাপ। আমি স্মার সামান্য কর্মচারী। তবু উনি একদিন আমার বলছিলেন—

—কি বলাছিলেন ?

—মেমসাহেব বলছিলেন, এরা ভাবেটা কি ? আম বোকা। একটা থার্ড ক্লাস লোকের সঙ্গে আমি ঘব করবো ? ব্রজবাবু, আপন অ্যাটর্নীকে খবর দিন। পাকাপোক্তভাবে সমস্ত আলাদা করে নিই।

—কবে বলাছিলেন একথা ?

—অ্যাস্ত্রে, পাটনাতেই। দিন তিনেক আগে।

পারহারা ব্রজবাবুকে ভাল করে একবার দেখে নিয়ে বললেন, এদিকের ব্যাপারটা বুঝলাম। এবার বলুন তো লোকেশ ট্যাগুন আপনার মেমসাহেবের বথরুমে গিয়ে মায়া পড়ল কি ভাবে ?

চিন্তিত গলায় ব্রজবাবু বললেন, আমও বিষয়টা নিয়ে অনেক ভেবেছি স্মার। কোন কুলকিনারাই পাচ্ছ না।

—কাজটা আপনার মেমসাহেবের নয় তো ?

—তা কি ভাবে সম্ভব স্মার ? উনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। তাছাড়া এখনও তো বোকা যায়নি, লোকেশবাবু কি ভাবে মায়া গেছেন। হার্টফেলও করে থাকতে পারেন।

—তা পারেন। তবে হার্টফেল করার জায়গাটা আপনার মেমসাহেবের বথরুমে কেন ? এখানেই ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠেছে।

—আমি আর কি বলবো স্মার। এরমক ঘোরাল ব্যাপারের মুখোমুখি হলে আমার মাথা তেমন খোলে না।

—রাকেশ দ্বিক্ত কেমন লোক ?

—ভাল বলেই তো মনে হয়। মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে মাঝেমধ্যে আসেন। এলাহাবাদ আর পাটনায় ব্যবসা আছে।

—কুশল বানার্জীকে চেনেন?

—আজই ওর নাম শুনলাম। এক ঝলক দেখেছিও।

—ওর সম্পর্কে আপনি কি কিছু শুনেছেন?

কিছু বলতে গিয়েও থামলেন ব্রজবাবু।

পরিহার এবার ধমকের স্বরে বললেন, বলুন, কি শুনেছেন?

—আমি স্ত্রীর আদার ব্যাপারী—তবে, আপনি যখন জানতে চাইছেন বলছি শুনলাম মেমসাহেবের উনি নাকি পুরনো বন্ধু। গতরাত্রে দুজনে একই ঘরে ছিলেন—এই সব আর কি। আমি এ সমস্ত বিশ্বাস করি না।

—কার কাছ থেকে শুনলেন?

—কর্তারা আলোচনা করছিলেন, কানে এল।

—আপনার সঙ্গে মিসেস মাথুরের শেষ কখন দেখা হয়?

—ডিনারের পর উনি যখন ঘরে ফিরছিলেন।

—কি কথা হয়েছিল?

—তেমন কিছু নয়। শুধু—

—বলুন?

—উনি বলেছিলেন সাড়ে দশটার মধ্যে ঠুকে একবার ফোন করতে।

—নিশ্চয় ফোন করেছিলেন। কি কথা হয়েছিল?

দোনামনা করে ব্রজবাবু বললেন, ফোন করা হয়নি। আমি স্ত্রীর বিয়ার খেয়ে ফেলেছিলাম। অনভ্যাসের ফোটা। বিছানায় সেই যে পড়ললাম, চোখ খুলল আজ সকালে। মেমসাহেব অবশ্য এই ধরনের বেয়াদাপি পছন্দ করেন না।

পরিহার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এখন এই পর্যন্তই। প্রয়োজন হলে পরে আবার কথা বলা যাবে।

কথা শেষ করেই উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মুহম্মান অবস্থায় খাটের ওপর এলিয়ে ছিল বিনোদ। রাকেশ দিক্‌বিতের মুখ অসম্ভব গম্ভীর। সে সোফায় বসে অবিচল সিগারেট টেনে চলেছে। প্রমোদ উত্তর দিকের জানলার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ।

দুশো ছাব্বিশ নম্বর ঘরের আবহাওয়া তখন ধমধম করছে। পরিস্থিতির গতি যে এইরকম দাঁড়াবে কে ভাবতে পেরেছিল। বিশেষ করে কলকাতার

বাইরে। পোস্টার্টমের রিপোর্ট সম্ভাবজনক না হলে পুলিশ সহজে কাউকে ছাড়বে বলে মনে হয় না।

ইন্সপেক্টর জানিয়ে গেছেন, রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ পুলিশের অহুমতি না পেয়ে কেউ পাটনা ছাড়তে পারবেন না। এয়ারলাইন্সের কর্তৃপক্ষকেও এ কথা জানিয়ে রাখা হয়েছে। আশার কথা, বিশেষ ব্যবস্থার আজ সম্ভার মধ্যেই পোস্ট-মর্টমের রিপোর্ট পাওয়া যাবার সম্ভাবনা।

বিনোদ উঠে বসে মনমরা গলায় বলল, আমি ভারি অস্থায়ী করেছি। লোকেশকে এখানে না নিয়ে এলে কখনই মারা যেত না।

জানলার কাছ থেকে সরে এসে বলল, এখন হা-হতাশ করে কি করবে? এই ভাগ্যকে তো আর খণ্ডানো যাবে না?

—তুমি হয়তো ঠিকই বলছো। কিন্তু আমার অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে ভেবে দেখেছো একবার?

—কিসের অবস্থা?

—খন্তরবাড়িতে আমি কখনও মূখ দেখাতে পারবো? ওঁরা সকলেই লোকেশের মৃত্যুর জন্য আমাকে দায়ী করবেন।

—তুমি একটু বেকায়দায় পড়েছো ঠিকই। তবে করার কি থাকতে পারে বল না? ভাল কথা, তোমার খন্তরবাড়িতে খবর পাঠানো হয়েছে?

বিমর্ষভাবে মাথা হেলিয়ে বিনোদ বলল, হ্যাঁ। ফোনে প্রথমে চেষ্টা করেছিলাম, লাইন পাওয়া গেল না। অগত্যা তার করতে হল।

—সময়মত তার পেলে ওঁরা কাল দুপুর নাগাদ চলে আসবেন। তার মধ্যেই আমরা পুলিশের কাছ থেকে তেডবডি পেয়ে যাবো।

—আমার ঝামেলা তো ওখানেই। ওঁরা এসে পড়ার পর আমার অবস্থাটা কিরকম দাঁড়াবে সেই কথা ভেবেই তো কাহিল হয়ে পড়েছি প্রমোদ।

—করার তো কিছু নেই। সব ঝড়ঝাপটা সহ করে যেতেই হবে।

এতক্ষণ পরে রাকেশ কথা বলল, তোমরা একটা বিষয় নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করছো না।

—কোন বিষয়?

প্রমোদের প্রশ্নের উত্তরে রাকেশ বলল, পোস্টমর্টমের রিপোর্টে যদি জানা যায় লোকেশের মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়।

বিনোদ দ্রুত গলায় বলল, তা কি ভাবে সম্ভব? আমরা না জানলেও, লোকেশ নিশ্চয় হার্ট পেশেন্ট ছিল।

—হার্ট ফেল করে লোকেশ যদি মারা গিয়ে থাকে তবে তো মিটেই গেল।
তা যদি না হয়ে থাকে—আমরা ভীষণ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব।

হুই ভাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

—আপনি বশতে চাইছেন,—বিনোদ বলল, লোকেশ খুন হয়েছে ?

রাকেশ সিগারেটের টুকরোটা অ্যান্ড্রেতে গুঁজে দিয়ে বলল, আমি ব্যাপারটার
ওপর জোর দিচ্ছি না। সম্ভাবনার কথা বলছিলাম।

—সম্ভাবনার কথা ছাড়ুন। যা হবার হবে। মনকে আর অকারণে ভর
পাইয়ে দিতে চাই না।

—এক দিক থেকে কথাটা ঠিক। নাড়ে ছটা বাজল। রিপোর্ট তৈরী থাকলে
ইন্সপেক্টর যে কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে।

—রাকেশবাবু—

—বলুন ?

প্রমোদ বলল, আমি অন্য একটা প্রসঙ্গ তুলতে চাই। এখন, এই দুঃসময়ে
আমাদের কাছাকাছি বৌদির থাকা উচিত ছিল, নয় কি ?

—আপনি ঠিকই বলেছেন, তবে—

—হঠাৎ গুর মনমেজাজ এমন বিগড়ে গেল কিভাবে বোঝা যাচ্ছে না। একটা
কাউণ্ডেলের সঙ্গে আঠার মত জুড়ে আছেন, ভাবা যায় না।

—গুর কাণ্ডকারখানায় আমি হতবাক। কিন্তু আমার হাত পা বাঁধা।
আমি কিছুই করতে পারছি না।

বিনোদ বলল, ছেলোমামুষের মত কথা বলবেন না। আপনি ভুলে যাচ্ছেন,
আমাদের বৌদি আপনার বোন। দায়িত্ব আপনি এডিয়ে যেতে পারেন না।

প্রমোদ বলল, আমাদের পারিবারিক সম্মান ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। বৌদি যে
নিজেকে এত সস্তা করে ফেলবেন আগে কে ভেবেছিল। এখন আপনি সবদিক
রক্ষা করতে পারেন। ভেবে দেখুন আপনার এখন কি করণীয়।

চিন্তিত গলায় রাকেশ বলল, আমি সব বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করতে
পারি বলুন ? ঋতুর আমি গার্জেন নই। কিছু বলতে গেলে সে আমাকে তোয়াক্কার
মধ্যে আনবে না।

—ব্যাপারটা ছেলেখেলা নয়। যা হবার হয়ে গেছে। এবার বৌদিকে বাধা
দ্বিভেই হবে।

—কি ভাবে বলুন ?

হুই ভাইয়ের কপালে এবার চিন্তার রেখা ঘন হয়ে এল।

—ওদিকে—

ডেলিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কুশল দাঁড়ি কামাচ্ছিল। নানা ঝামেলার দরুন সময়মত দাঁড়ি কামানো সম্ভব হয়নি। এখন কাজটা সেয়ে নিচ্ছে। ঋতু বিছানার আধশোওয়া অবস্থায় ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। ওর স্ত্রী মুখের উপর আশঙ্কার ছায়া।

—বেঞ্—

—কি হল ?

—আমার ভীষন ভয় করছে। লোকটা মরার আর জায়গা পেল না !

—লোকটা কিন্তু সত্যি অদ্ভুত। লোকটার যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে থাকে তবে ভয়ের কিছু নেই।—একটা প্রশ্ন থেকে যায়, তোমার বাধক্রেম কি করতে চুকেছিল ?

—চান করার জ্ঞান। তুমি দেখ নিও, লোকেশ ট্যাগুন স্বাভাবিক ভাবে মরেনি।

—এক-এক সময় আমারও তাই মনে হচ্ছে।

—কি হবে ? আমি তো—

তোয়ালে দিয়ে মুখ ঘষতে ঘষতে এগিয়ে এসে কুশল বলল, কেন আজবাঞ্জে কথা ভাবছো। আমি তো রয়েছি।

ফিকে হেসে ঋতু বলল, ভাবতেও আমার ভাল লাগে এখন। কতদিন পরে আজ আমি তোমাকে নিজের পাশে পেয়েছি।

—আমার খুশীর গভীরতা কিভাবে তোমাকে বোঝাব ! আমার কি মনে হচ্ছে জান—

—কি মনে হচ্ছে বল না—?

বলা আর হল না।

মিষ্টি স্বরে বেল বেজে উঠল।

জু কুঁচকে উঠল হৃদয়ের। মনের আনাচেকানাচে বিরক্তির খোঁচালাগা স্বাভাবিক। এখন আবার কে এস ? শান্তিতে কথাবার্তা বলার স্বেচ্ছাও তাড়ের নেই। কুশল এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মন আশঙ্কায় ভরে গেল। চোঁকাঠের ওধারে বিনোদ, প্রমোদ এবং রাকেশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। বলা-বাছল্য তিনজনের মুখ অসম্ভব গভীর।

রাকেশ কুশলকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল।

ঋতু একই ভাবে খাটের উপর বসে রয়েছে।

—এ সমস্ত কি হচ্ছে ?

ঋতু কোন উত্তর দিল না ।

রাকেশ এবার ফেটে পড়ল ।

—আমি জানতে চাই এ সমস্ত কি হচ্ছে ?

—আমিও জানতে চাই—ঋতু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, পরের ঘরে এসে এত হাঁসি-তর্কি করছো কেন ? সভ্যতার পাট কি একেবারে চুকিয়ে ফেলেছো ?

—বেহায়াপনার একটা সীমা থাকা উচিত । এই পরের ঘরে তুমি কি করছো ? দুটো পরিবারের মুখে কালির ছোপ লাগাতে তোমার সঙ্কোচ হল না ?

—একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে একটা বুড়ো লোকের বিয়ে দেওয়ার সময় তোমাদের সঙ্কোচ হয়নি ? আর এঁরা—এঁদের মন্তব্য বলে কিছু আছে ? আমার সমস্ত কিছু হাতাবার জন্ত মরিয়া হয়ে দৌঁড়োদৌঁড়ি করে বেড়াচ্ছেন । আমাকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই দাদা । কেঁচো খুঁড়তে চেয়েছিলে—সাপ কিন্তু বেরিয়ে পড়েছে ।

—তোমাব ভুল ধারণা বোঁদি । তোমার বিষয়সম্পত্তির ওপর আমাদের কোন লোভ নেই । অকারণে কেন দোষ দিচ্ছ ?

হুই ভাই তখন ঘবেব মধ্যে ।

বিনোদের কথা শুনে ঋতু বলল, অ্যাটর্নী অনেক কিছুই ফাঁস কবে দিয়েছে । বলুন, শুনে চান সে সমস্ত কথা ?

অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে প্রমোদ বলল, বিষয়সম্পত্তির কথা এখন থাক । আপনার প্রতি অনেক অবিচার হয়েছে তাও মেনে নিলাম । তবু বলবো, আমাদের পরিবারের মানসম্মান এই ভাবে নষ্ট করবেন না ।

—আমার ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কিছুই নেই ? আমাকে আজীবন সমস্ত অবিচার সহ্য করে যেতে হবে হুই পরিবারের মেকী সম্মান রক্ষা করার জন্ত ? সম্ভব নয় । আপনাদের পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিতে চাই, কোন সম্পর্কের বন্ধন আর নেই । এখন থেকে আমার ভবিষ্যতের দায় আমার নিজের হাতে । আমার কোন ব্যাপারে আপনাদের দেখতে হবে না ।

—কিন্তু বোঁদি—

—বোঁদি নয় । আমার নাম আছে । নিতান্তই যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে আমার নাম ধরে ডাকুন ।

—আপনি কি সমস্ত বলছেন ? আপনার ভবিষ্যৎ—

—বললাম তো, আমার হাতে । ভবিষ্যতে পা কি ভাবে ফেলবো, তাও স্থির

করে ফেলেছি। আমি সহজ এবং স্বাভাবিক জীবন চাই। আমি প্রাণভরে বাচতে চাই। তাই আমি মিলেস ব্যানার্জী হাত চেয়েছি।

—ঋতু !!!

রাকেশ ফেটে পড়ল।

—কি পেয়েছো এই লোকটার মধ্যে। একটা ইভিয়েট, একটা স্বাউণ্ডেল—
সামান্য একটা মাইনর স্কুল-মাস্টারের ছেলে—

—রাকেশবাবু,—কুশল গম্ভীর গলায় বলল, আমার স্বর্গীয় বাবাকে এখানে
টেনে আনবেন না।

—একশবার আনবো। কি করবে তুমি ?

—কি ধরনের ট্রিটমেন্ট চাইছেন ?

—ট্রিটমেন্ট। আমাকে চ্যালেঞ্জ করছো ? এতবড় সাহস ! তুমি জান না,
আমি ইচ্ছে করলে—

—তোমাকে আমি জানি দাদা—ঋতু বলল, তুমি ইচ্ছে করলেও কিছু করতে
পারবে না। মনে রাখার চেষ্টা করো, আমি এখন ব্যানার্জীর দিকে।

—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ? ভুলে গেছো তুমি বিধবা—তোমার এই
বাচালতা তোমাকে কত ছোট করে দিচ্ছে তা তোমার একবারও মনে পড়ছে না ?

ঋতু দ্রুত গলায় বলল, কেন মনে পড়বে ? লোকেশ ট্যাঙনের সঙ্গে যখন
আমার বিশ্বের ব্যবস্থা কর ছিলে তখনও আমি বিধবা ছিলাম ? ঐ বিয়েতে
সম্মতি দিলে, আমার বাচালতা প্রকাশ পেত না ? দুই পরিবারের সম্মান নষ্ট হত
না, এই কথাই কি বলতে চাইছো ?

বিনোদ বলল, অনেক হয়েছে, আর নয়। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, লোকেশকে
এরাই ছুনিয়া থেকে সরিয়েছে।

প্রমোদ বলল, তুমি ঠিক বলছো মেজদা। নিজেদের পথ পরিষ্কার করার জন্য
এরা লোকেশকে মেরে ফেলেছে।

রাকেশ বলল, আমারও এখন তাই সন্দেহ হচ্ছে।

—সন্দেহ আর প্রমাণ এক কথা নয় দাদা।—ঋতু বলল, আর কিছু নিশ্চয়
বলার নেই ? অবশ্য বলার থাকলেও আমরা আর শুনতে চাই না। তোমরা এবার
যেতে পারো।

—ঠিক আছে। তবে শেষ রক্ষা করতে পার কিনা দেখ।

রাকেশ কথা শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আগুনঝরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে বিনোদ বলল, আপনার নৈতিক মান যে

এত নীচুতে আমরা জানতাম না। তবে মনে রাখবেন, আজকের অপমান কোনো মতেই ভুলবো'না। এস প্রমোদ।

দুই ভাই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর ঋতু কুশলের দিকে তাকাল। ওর দৃষ্টিতে অসহায়তা ছাপিয়ে এসেছে। কুশল এগিয়ে গেল। ওর কাঁধে আলতোভাবে হাত রাখল। ঋতু দৃষ্টি মেলাতে পারছে না। কিছু একটা বলতে গিয়ে থামল, তারপর কুশলকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আন্দাজ রাত সওয়া নটার সময় ইন্সপেক্টার পরিহার সদলবলে হোটেলে প্রবেশ করলেন। পোস্টমর্টমের রিপোর্ট ঘণ্টাখানেক আগে পেয়েছেন। প্রথমত পাটনার সদর এস পির সঙ্গে তাঁর কিছু কথাবার্তা হয়েছে। প্রয়োজনীয় নির্দেশ পেয়ে তবেই এসেছেন এখানে।

হোটেলে ঢুকেই তিনি ম্যানেজারের ঘরে চলে গেলেন। কি সমস্ত কথাবার্তা হল দুজনের মধ্যে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, লিফটের সাহায্য না নিয়েই সিঁড়ির দিকে এগুলেন। কেন যে নিজের স্থূল শরীরকে কষ্ট দিতে চাইলেন বোঝা গেল না। সঙ্গে ম্যানেজারও আছেন।

সেকেণ্ড ফ্লোরে পৌঁছবার পর পরিহার বেশ ঈপ্সিয়ে পড়লেন। পকেট থেকে ক্রমাল বার করে নিয়ে নাক ঝেড়ে নিলেন সশব্দে, তারপর ম্যানেজারের দিকে তাকালেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। ম্যানেজার এবার সেনাপতির ভূমিকা নিয়ে সকলের আগে এগিয়ে গিয়ে নক করলেন ২১০ নম্বর ঘরে।

দরজা খুলে গেল।

গভীর মুখে পরিহার ঘরে প্রবেশ করলেন। পিছনে আর সকলে। ঋতু খাটের উপর বসে ছিল আগেকার মতট। কুশল ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দুজনের মুখেই ঘনায়মান আশঙ্কা। পরিহার দ্রুত চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে খাটের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালেন।

বললেন, পোস্টমর্টমের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। লোকেশ ট্যাণ্ডনের পেটে মার-কিউরিক ক্লোরাইড ছিল।

ওরা কিছু বলল না।

উনি আবার বললেন, বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়, এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। এটা মার্ডার কেস।

কুশল বলল, আত্মহত্যাও হতে পারে।

—না, পারে না। কেউ আত্মহত্যা করতে চাইলে, অসময়ে পরের ঘরে—

বিশেষ কোন মহিলার ঘরে গিয়ে চোকে না। বাথরুমে গিয়ে মুখ খুবড়ে মরে পড়ে থাকে না। কাজেই এটা মার্ডার কেস। মিসেস মাথুর, আপনি কিছু বলবেন ?

ঋতু অসংলগ্ন গলায় বলল, আমি আর কি বলবো ?

—তাহলে এবার আমিই আসল কথাটা বলি।

পরিহার নিজের শরীরকে একটু হেলিয়ে ছুলিয়ে নিলেন।

লোকেশ ট্যাঙনকে হত্যা করার অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। ওয়ারেন্ট সঙ্গে আছে দেখতে পারেন। অবশ্য আপনাকে হ্যাণ্ডকাপ পরানো হবে না। লেডি কনস্টবল বাইরে অপেক্ষা করছে।

এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও ঋতুর কপালে ঘাম দেখা দিল।

—সে কি ! আমাকে—

নিজের অসহায়তা কাটিয়ে নিয়ে কুশল বলল, শুধু সন্দেহ করছেন না, গুঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আছে ?

—যা আছে কোর্টে আমরা দাখিল করবো। এখন বলতে বাধ্য নই। আপনি তৈরী হয়ে নিন মিসেস মাথুর। বানওয়ারী—

একজন এগিয়ে এসে বলল, স্যার—

—গিরিজা দেবীকে ডাকো।

ঋতু কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে কুশলের হাত চেপে ধরল।

—বেঞ্জ—

—নিজেকে শক্ত করো ঋতু।

—কি হবে এখন ?

—দেখছি কি করা যায়।

কথা শেষ করেই কুশল ঘুরে দাঁড়াল।

—ইন্সপেক্টার, উনি একজন সম্মানিতা মহিলা আজ রাত্রে গুঁকে খানায় নিয়ে যাবেন না। এই ঘরেই রাখুন। পাহারা বসিয়ে দিন। কাল সকালে আইনজ্ঞর সঙ্গে পরামর্শ করি, তারপর না হয়—

পরিহারের মুখে বিজ্ঞের হাসি দেখা দিল।

—তা হয় না। আইনের চোখে সকলেই সমান। খানার লকআপ আরামদায়ক নয়, একথা সকলেই জানে। তবে যতদূর সম্ভব স্বযোগ-স্ববিধে গুঁকে দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে মধ্যবয়স্ক লেডি কনস্টবল ঘরে এসে গিয়েছিল।

—মিসেস মাথুর, এবার যেতে হবে।

ঋতুর চোখ ফেটে জল আসছিল। কুশলের মুখ কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে।
চোখের উপর আঁচল বুলিয়ে নিয়ে নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করল।

কোন রকমে বলল, যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, আমাকে যেতেই হবে। তুমি—

—আমি কালই বেল-এর ব্যবস্থা করছি। কুশল বলল, ইন্সপেক্টর অবশ্য
একটা স্বেয়োগ দিতে পারতেন। তবে—

—ওঁকে অহরোথ জানানো বুঝা। তুমি আছো, এই আমার পক্ষে অনেক।
ব্রজবাবুকে সঙ্গে রেখো—কাজের লোক।

পরিহার বললেন, মিঃ ব্যানার্জী, আমাদের অত্মমতি ছাড়া আপনি এখন
পাটনা ছাড়বেন না। সন্দেহের তালিকায় আপনাকেও রাখতে হয়েছে।

—বরং আমাকেই অ্যারেস্ট করুন। ওঁকে ছেড়ে দিন। ওঁকে বরং সন্দেহের
লিস্টে রাখুন।

—ছেলেমানুষী করবেন না। আপনার নামে এখনও ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়নি।
এবার যাওয়া যেতে পারে।

ঋতু কুশলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে এগুলো।

করিডরে তখন বোর্ডারদের ভীড় হয়ে গেছে। একজন অভিজাত মহিলা খুন
করার দায়ে অ্যারেস্ট হয়েছেন, এমন ঘটনা বারবার ঘটে না। তাও আবার দামী
এবং নামী হোটেলে। ব্রজবাবু দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। পুলিশ তাঁকে
ঘরে ঢুকতে দেয়নি। মেমসাহেবের এই বিপাকের দরুন তিনি ভারী বিমর্ষ।

ঋতুর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। নাক মুখ থেকে যেন গরম ভাপ বেরুচ্ছে। তবু
সংযত পায়ে করিডর মাড়িয়ে এগিয়ে চলল। রাকেশ এগিয়ে এসে ইন্সপেক্টরকে
কিছু বলল। উনি মাথা নাড়লেন। বিনোদ আর প্রমোদ নিজের নিজের ঘরের
সামনে নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এরকম একটা কিছু যে হবে তা যেন
আগেই জানা ছিল।

কুশলও গেল পিছু পিছু। মনের মধ্যকার হাহাকার ওকে আচ্ছন্ন করে
রেখেছে। গাড়িবারান্দায় এসে ঋতুকে জীপে বসানো হল। জীপ রওয়ানা হয়ে
গেল তারপরই। কুশল ব্রজবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আবার উপরে এল। ব্রজবাবু
কেমন হাঁকপাঁক করছেন।

—এখানকার কোন ভাল উকিলকে চেনেন?

ব্রজবাবু বললেন, ইনকামট্যাক্সের উকিল ব্রিজেশ শ্রীবাস্তবকে জানি। উনি
আমাদের কাজটাজ দেখেন।

—ক্রিমিনাল লাইডের কাউকে চেনেন কিনা জানতে চাইছি?

—না, স্ত্রীর । তেমন তো কেউ—

—ঠিক আছে । আমি অল্পভাবে চেষ্টা করছি । আপনার মেমসাহেবকে যে কোন মূল্যে বাঁচাতে হবে । আপনি আমার ঘরে আসুন । মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমাদের এখন আলোচনা করতে হবে ।

ঘরে ঢোকান মুখেই রাকেশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ।

রাকেশের গলায় উত্তেজনা ।

—তোমার হঠকারিতার দরুনই ঋতু এইভাবে ফেঁসে গেল ।

—আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না ।

—তা চাইবে কেন ? এই কাজটা তোমার । ঋতুকে পাবার জন্য তুমি পথের কাঁটা এইভাবে সরিয়েছো ।

কুশলের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল ।

—অনেক বড় বড় ইন্ডিয়ট দেখেছি, কিন্তু এরকম দেখার সুযোগ হয়নি । ঋতুকে পাবার জন্য ওর দিকে ফাঁসির দড়ি এগিয়ে দিলাম । চমৎকার । পুলিশ আমাকে সন্দেহের লিস্টে রেখেছে । পুলিশের কাছে বলুন গিয়ে নিজের কথা । এরকম সাক্ষী পেলে ওরা দু হাত তুলে নাচবে ।

কথা শেষ করেই কুশল ঘরে ঢুকে গেল ।

রজবাবুও গেলেন পিছু পিছু ।

অপমানে রাকেশের মুখ কালো হয়ে উঠেছে ।

ঘরে গিয়েই কুশল রিসিভার তুলে নিল ।

—হ্যালো—এক্সচেঞ্জ—

—এক্সচেঞ্জ—

—৫৪৮০০—লাইনটা একটু তাড়াতাড়ি দেখুন—

রিসিভার নামিয়ে রেখে কুশল বলল, আমাদের পার্টনার ব্রাঙ্কের স্থপারভাইজার গোঁতম চৌহানের সঙ্গে কথা বলে দেখছি । চৌহান নিশ্চয় ভাল উকিলের ব্যবস্থা করে দেবে ।

—মেমসাহেবকে এই ঝামেলা থেকে বের করে আনতে সমস্ত কিছু করতে হবে । কি দুর্বিপাক বলুন তো স্ত্রীর ? কষ্ট কাকে বলে উনি জানেন না । অথচ আজ—

রজবাবুর কথা শেষ হবার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল ।

রিসিভার তুলে নিল কুশল ।

—হ্যালো—চৌহান, ব্যানার্জী কথা বলছি—

ওধার থেকে চৌহানের গলা ভেসে এল, স্ত্রীর, আপনার তো কলকাতা ফিরে
যাবার কথা—এখনও রয়েছেন—অথচ—

—যাওয়া হয়নি—একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি—তোমাকে এই অসময়ে
বিরক্ত করার জগ্গ ভারী দুঃখিত—ক্রিমিনাল সাইডের কোন ভাল উকিলকে ভূমি
চেনো ?

—কয়েকজনের সঙ্গে চেনাজানা আছে— স্ত্রীর, কেসটা কি—

—মার্ডার কেস—আমার এখন দরকার ভাল বেল মুভার—

—বসন্ত সান্তালকে দিয়ে কাজটা করানো যেতে পারে । বেল নেওয়ার ব্যাপারে
ওর বেশ সুনাম আছে । আমি তো স্ত্রীর কিছুই বুঝতে পারছি না—যদি অল্পমতি
করেন তবে এখনই আপনার কাছে পৌঁছতে পারি—কোথায় রয়েছেন এখন—

—তুমি নয়—আমি আসছি তোমার কাছে—

কুশল রিসিভার নামিয়ে রাখল ।

—চলুন, ব্রজবাবু, কাজে নেমে পড়া যাক ।

তখন রাত এগারটা দশ ।

বাজেস্ট্রনগরের স্বদৃশ এক দোতলা বাড়ির সামনে অফিসের গাড়ি থেকে নামল
কুশল । সঙ্গে চৌহান এবং ব্রজবাবু । বসন্ত সান্তালের সঙ্গে ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট
করে নেওয়া হয়েছিল । সময় অবশ্য অল্পকূল নয়, তবে অভিজ্ঞ সান্তাল বোঝেন
মক্কেলের মনগুস্ত ।

বেল শোনার পর, ডেসিগাউন পরিহিত গৃহস্থায়ী স্বয়ং দরজা খুললেন । ভাবী
মক্কেলদের সাদরে নিয়ে গিয়ে বসালেন অফিস রুমে । পরিচয় ও অস্ত্রাস্ত্র হু-চার
কথার পর, আসল ঘটনায় কেন্দ্রীভূত হলেন সকলে । মন দিয়ে সমস্ত কথা শুনলেন
সান্তাল । যতদূর সম্ভব খুঁটিনাটি সমেত সমস্ত কথা বলে গেল কুশল । এমন কি
ওর এবং স্বত্বের বর্তমান সম্পর্ক কি তাও উল্লেখ করতে ভুলল না ।

সান্তাল মিনিট খানেক ওয়ালক্লকের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, নিয়ম
অনুসারে পুলিশ প্রথমে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করবে ।
মিসেস মাধুরকে ওখানেই আমরা ‘বেল’ মূভ করবো । অবশ্য ‘বেল’ নাকচ হবে ।
এ সবই প্রাথমিক ব্যাপার ।

—তাহলে তো—

—বাস্তব হবেন না । আরেক গ্রন্থ কাগজপত্র তৈরী থাকবে । নাকচ হবার পরই
আমরা ডিষ্ট্রিক্ট জাজের এজলাসে আবেদন করবো । ওখান থেকে নিশ্চিত ভাবে

‘বেল’ পেয়ে যাবো ।

—আপনি শ্রাবুইন হচ্ছেন কি ভাবে ?

সান্তাল হাসলেন ।

—এই ভাবে নিশ্চিত হবার পিছনে আমার ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে মিঃ ব্যানাজী । এখনও আমি পুলিশের বক্তব্য জানি না । তবু বলছি । কারণ এখানে একটা গ্লাস পয়েন্ট রয়েছে । আসামী শুধু মহিলাই নয়, অভিজাত ঘরেরও ।

কুশল বলল, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বেল নাকচ করবেন এ সম্পর্কে যখন নিশ্চিত তখন প্রথমেই ডিক্রিকে জাজের ওখানে গেলেই তো হয় ।

—তা হয় না । নিয়মাহুসারে সি. জে. এম.-এর কাছে প্রথমে যেতেই হবে । আর একটা কথা—

—বলুন ?

—পুলিস আপনাকে সন্দেহ করছে । হয়তো কালই কোন সময় অ্যারেস্ট করবে । প্রথম শ্রযোগেই তাই ডিফেন্স নিয়ে রাখা ভাল ।

—কি ধরনের ডিফেন্সের কথা বলছেন ?

—অ্যাটর্নিসফেটরা বেল । আমাদের আবেদনে যদি বিচারপতি সম্মতি জানান তবে পুলিশ আপনাকে ছুঁতে পারবে না ।

—যদি বলছেন কেন—

—এই ধরনের বেল অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না । আমরা অবশ্য জোর চেষ্টা করবো । নিতান্তই যদি নাকচ হয়, হাইকোর্ট রয়েছে । ওখানে কোন ভাল বেক দেখে আবেদন করতে হবে ।

—ব্যাপারটা তাহলে—

—আপনি চিন্তিত হবেন না মিঃ ব্যানাজী । আমার পরিশ্রম আর অভিজ্ঞতা দেখুন না, ব্যাপারটাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায় । কাগজপত্র আমি সব ঠিক করে রাখবো । আপনারা বরং সকাল সাড়ে আটটার সময় আসুন ।

কুশল উঠে দাঁড়াল ।

দশটা একশো টাকার নোট টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বলল, কত ধরচ হবে আমার জানা নেই । এখন হাজার টাকা রেখে যাচ্ছি । কাল হিসেব পেলে বাকী টাকা মিটিয়ে দেব ।

—ধন্যবাদ ।

—আরেকটা কথা মিঃ সান্তাল—

—বলুন ?

—আমার অ্যাটিনিসেটোরি বেল অ্যাপ্রভ না হলে কোন ক্ষতি নেই। ঋতুর কিন্তু হওয়া চাই।

—হবে। আপনার সম্পর্কে আমি যে নিরাশ, তা নয়। দেখুন না, শেষ পর্যন্ত কি হয়। তাহলে ঐ কথাই রইল।

উনিও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

চিক জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে যথানিয়মে ‘বেল’ রিজেক্ট হল। ঋতুর চেহারা বাসী ফুলের আকার নিয়েছে। ও বার বার তাকাচ্ছিল কুশলের দিকে। হাকিম বেল নাকচ করে ওকে জেলে পাঠাবার আদেশ দিলেন। পুলিশের পক্ষ থেকে চারদিনের জগ্ন ‘রিমাণ্ড’-এর আবেদন করেছিল। সে আবেদনও খারিজ করা হল। এই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হল, ‘রিমাণ্ড’-এর আবেদন ডিস্মিস্ট জাজের কাছে পুলিশ পক্ষ করতে পারেন।

পূর্বব্যবস্থা মত ‘বেল’ পিটিশন সান্তাল জমা দিলেন ডি. জে.র এজ্ঞাসে। কুশলের পিটিশন আগেই জমা পড়ে গিয়েছিল। লাঞ্চার পর শুনানি আরম্ভ হল। জেলা জজের বিশাল কক্ষ জনাকীর্ণ। সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় ‘লোকেশ ট্যাগুন মার্ডার’ সংক্রান্ত খবর ছাপা হয়েছিল। কাজেই সাধারণের মধ্যে আগ্রহ জাগবেই। বিশেষ একজন বিধবা, হুকপা মহিলা এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত।

ঋতুকে এবাব কোর্টে আনা হয়নি। ওকালতনামাতে ওর সাক্ষর আছে কাজেই উপস্থিতি বর্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়। বিনোদ, প্রমোদ এবং রাকেশও উপস্থিত রয়েছে। কুশল সবিস্ময় লক্ষ্য করল ঋতুর মা ও বাবাও এসে পড়েছেন।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ওরা এলেন কি ভাবে? মনে হয় রাকেশ রাড্রেই ট্রাক করেছিল ওঁদের। সকালে নিশ্চয় কোন ফ্লাইট আছে। ওতেই চলে এসেছেন দুজনে। সান্তাল ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন। সরকারী উকীলকে পিটিশনের নকল দেওয়া হয়েছে।

এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

‘বেল’ হয়ে গেল ঋতুর। কুশলেরও।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই কোর্ট থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে কুশল ছুটল পাটনা সেন্ট্রাল জেলের দিকে। এমন কি সান্তালকে ধন্যবাদও জানানো হল না। জেলে গিয়ে সমস্ত নিয়মকানুন মেনে ঋতুকে বার করে আনতে ঘণ্টাখানেক আরো লাগল।

বিপত্তি ঘটল এরপরই।

ঋতু উচ্ছলিত। কুশলের কার্যকারণে ওর বুক ফুলে উঠছে। কিন্তু সব উচ্ছ্বাস নিভে গেল জেল গেট পার হবার পর। মা ও বাবাকে দেখে একেবারেই ভাল লাগল না। ওঁরা একটা ফিয়েট গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিনোদ প্রমোদ এবং রাকেশও রয়েছে।

মা এগিয়ে এলেন। বাবাও।

মেয়ের গাল টিপে মা বললেন, খবর পাবার পর যে কি দুশ্চিন্তা হয়েছিল বলার নয়। এমন ঝামেলায় কেউ পড়ে ?

ঋতু নিস্পৃহ গলায় বলল, ঝামেলায় আমি পড়িনি মা। ঝামেলায় আমাকে ফেলা হয়েছে।

—ওকথা এখন থাক। শরীর একেবারে শুকিয়ে গেছে। এখন তোমার বিশ্রামের দরকার। চল, ঘাই এবার।

বাবা বললেন, কেসটা ভাল করে লডতে হবে। উকিল-টুকিলের ব্যবস্থা আজ দক্ষার মধ্যে করতে হবে।

—তোমরা ও সমস্ত নিয়ে মাথা ঘামিও না।

—সে কি ! কি বলছো কি ? আমরা ছাড়া মাথা ঘামাবে কে ? কর্মচারীদের দিয়ে এ সমস্ত কাজ হয় না।

ঋতুর গলায় এবার দৃঢ়তা প্রকাশ পেল।

—একটা কথা জানতে চাই বাবা ? তোমরা কি এখানে মজা দেখতে এসেছিলে ?

—কি বলছো আজ্ঞেবাজে। চল, যাওয়া যাক। পরে—

—পরে নয়, এখনই। ভাল ভাবে কেস লডতে চাও, অথচ ‘বেল’ মূভ করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখালে না ? আমার ‘বেলার’ কে হবে তা নিয়ে তোমাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না ! এখন ভালবাসা উথলে উঠছে।

—তুমি চাইছোটা কি ?

—আমি কি চাইছি, তোমার অজানা নয়। দাদা তোমাদের সব কথাই বলেছে আমি জানি। স্বচ্ছন্দে তোমরা আমাকে খরচের খাতায় লিখে নিতে পারো।

রাকেশ মুখ অঙ্ককার করে এগিয়ে এল।

—প্রত্যেক ব্যাপারের একটা সীমা থাকা উচিত।

—এখানে সিনক্রিয়েট করো না, এটা তোমাদের কোর্টইয়ার্ড নয়।

কথা শেষ করেই ঋতু অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা কুশলের দিকে তাকাল।

—তুমিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছো। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। চল, এবার যাই। ব্রজবাবু, আমরা এগুচ্ছি। আপনি একটা গাড়ির ব্যবস্থা দেখুন।

কয়েক জোড়া স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে ঋতু কুশলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলল। কে বাধা দেবে? আইন তাহলে হাতে নিতে হয়।

কুশল বলল, তুমি যে এত বেপরোয়া হতে পারো, না দেখলে কখনই বিশ্বাস করতাম না।

—তুমি আমাকে বেপরোয়া করে তুলেছো।

—আমি।

—হ্যাঁ, বেঙ্গ তুমি। হারিয়ে যাওয়া কিছু ফিরে পাবার পর, সাহসী আর বেপরোয়া হতেই হয়, নইলে ভয় থাকে আবার হারিয়ে যাবার। ভারী মিষ্টি হাসি দেখা দিল ঋতুর মুখে।

এরপর সাড়ে চার মাস কেটে গেছে।

পুলিস চার্জশিট দাখিল করেছে কোর্টে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ১২০ বি ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে ঋতুর বিরুদ্ধে। অর্থাৎ হত্যা এবং ষড়যন্ত্র। বিশ্বাসের বিষয় সহযোগী হিসাবে কুশল বা আর কাকুর নাম দেওয়া হয়নি। এবার এই মামলা নিয়মাহুসারে সেশান কোর্টে চলবে।

পরওয়ানা পাওয়া গেছে।

এগারই মে ঋতুকে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজের এজলাসে উপস্থিত হতে হবে। ঋতুকে ডিফেন্স দেওয়ার জন্য সান্ত্বাল অবশ্য আদালতে উপস্থিত থাকবেন না। তাঁর পবামর্শেই ক্রিমিনাল সাইডের ব্যবহারজীবী নরেন্দ্র আহুজাকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

আহুজা সাহেব কেস বুঝে নিয়েছেন।

এবং ভরসা দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে ঋতু ও কুশলের ব্যক্তিজীবনে মধুর পরিবর্তন এসেছে। অর্থাৎ জনচার্যক পরিচিতদের নিয়ে ওরা একদিন কলকাতার এক ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। অনাড়ম্বর ভাবে বিয়ে হয়ে গেছে দুজনের। বাপের বাড়ি আর স্বশ্রববাড়িকে গ্রাছের মধ্যে না এনে ঋতু গিয়ে উঠেছে কুশলের ছোট ক্ল্যাটে।

এত আনন্দের মধ্যে কিন্তু আশঙ্কার কীট দুজনকে কুরে কুরে খেয়ে চলেছে। আইনজ্ঞ মোটামুটি ভরসা দিয়েছেন। তবু মন মানতে চাইছে না। খুনের মায়ালা

বলে কথা—আদালতের কার্যক্রমে কত বিপরিতর্কীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন দেখা দিতে পারে। তখন—কি হবে তখন ?

অবশ্য হাইকোর্ট আছে। আছে সুপ্রিম কোর্ট।

আদালত

আদালত আরম্ভ হবার পরই ঋতুর ডাক পড়ল। বিচারপতি নিজের চেয়ারে এসে কয়েক মিনিট আগে বসেছেন। জনাকীর্ণ আদালত গৃহের চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। ঋতুর শবীর ঝিমঝিম করছিল। কুশল তাকে সাহস দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য কবল।

ঋতু গিয়ে দাঁড়াল আসামীর কাঠগড়ায়।

রেলিং চেপে ধরল। ভয় হচ্ছিল পড়ে যাবে।

সরকারী পক্ষের আইনজীবী রণধীর ভর্মা উঠে দাঁড়ালেন। বহু যুদ্ধের জয়ী সেনাপতি ভর্মাকে দেখে মনে হচ্ছিল, বিশেষ অসুবিধার মুখোমুখি আজ তাঁকে হতে হবে না। বিচারপতিব ইঙ্গিত পাবার পরই তিনি বলতে আরম্ভ করলেন।

—ইওর অনার, আমি আজ এমন একটি কেস নিয়ে আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছি যার তুলনা সচরাচর মেলে না। ঋতু মাথুর কলকাতার ধনাঢ্য এবং অভিজাত পরিবারের বিধবা বধু। উনি ভালবেসে ফেলেছিলেন নিজের দেওর বিনোদ মাথুরের সম্বন্ধী লোকেশ ট্যাগুনকে। দুজনের বিয়ের কথাবার্তাও চলছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় লোকেশ ট্যাগুনকে হত্যা করে আজ উনি আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। কাজেই ঋতু মাথুরকে ৩০২ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। এবার আমি ঘটনা প্রসঙ্গে যেতে চাই। ৮ই জানুয়ারী অভিযুক্তা নিজের পরিবারের অগ্রাগ্রা ব্যক্তি এবং প্রেমিক লোকেশ ট্যাগুনের সঙ্গে পাটনা থেকে কলকাতা যাবার উদ্দেশ্যে বিমানবন্দরে গিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু সেদিন জলহাওয়া অত্যন্ত শোচনীয় হওয়ার দরুন যাত্রা করা সম্ভব হয়নি। কর্তৃপক্ষ যাত্রীদেয় হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। এখানেই অভিযুক্তার সঙ্গে তাঁর কুমারী জীবনের প্রেমিক কুশল ব্যানার্জীর সঙ্গে নাটকীয় ভাবে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। ইওর অনার, সমস্ত সময় দেখা যায় মাহু বচিচ্চ মনোবিচারের শিকার হয়ে যায়। এখানেও এই ধরনের উদাহরণ উপস্থিত। বর্তমান প্রেমিককে উপেক্ষা করে অভিযুক্তা পুরনো প্রেমের বস্ত্র ভেঙ্গে গেলেন।। লোকলজ্জা বিসর্জন দিয়ে আঠার মত স্টেটে রইলেন কুশল ব্যানার্জীর সঙ্গে। অনেক বুঝিয়েও

ওঁর বড় ভাই এবং দেওররা ওঁকে এই নকারজনক পরিস্থিতি থেকে সরিয়ে আনতে সমর্থ হননি। বরং লোকেশ ট্যাগুন তখন অভিযুক্তার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

পাবলিক প্রসিকিউটর ভর্মা এক সেকেন্ড থেমে আবার আরম্ভ করলেন, এই অবস্থার মধ্যে পড়ে লোকেশ ট্যাগুনও ভারী বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। অগত্যা তিনি রাত সাড়ে দশটার পর অভিযুক্তা ঋতু মাথুরের ঘরে গেলেন বোঝাপড়া করতে। আর তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখা যায়নি। ট্যাগুনের মৃতদেহ পরের দিন ভোরে অভিযুক্তার বাথরুম থেকে আবিষ্কৃত হয়। অভিযুক্তা রাতভোর কুশল ব্যানার্জীর ঘরে ছিলেন একথা আমরা যেনে নিচ্ছি। এতে কিন্তু উনি দোষমুক্ত হচ্ছেন না। প্রকৃত ঘটনা হল কুশল ব্যানার্জীর ঘর থেকে এক সময় বেরিয়ে উনি নিজের ঘরে যান, মৃত লোকেশ ট্যাগুনের সঙ্গে কথা বলেন। মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশ্রিত পানীয় ওঁকে খেতে দেন। এই পানীয় গ্রহণ করতে লোকেশ দ্বিধা করেনি এটাই স্বাভাবিক। তার মৃত্যু হবার পর অভিযুক্তা আবার কুশল ব্যানার্জীর ঘরে ফিরে আসেন। ইওর অনাব, এক্ষেত্রে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এই মামলা ধারা ৩০২-এর আওতায় পড়ে। কাজেই অভিযুক্তার বিরুদ্ধে ২২৮ ধারা অহুসারে চার্জ গঠন অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

ভর্মা বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আসামী পক্ষের আইনজ্ঞ নরেন্দ্র আহজা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন শান্ত গলায়, ইওর অনার, এই মামলায় এমন কোন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী নেই যার ওপর নির্ভব করে ধারা ৩০২-এর আরোপ তুলে চার্জ গঠন করা সম্ভব হয়। আদালতের কাছে আমরা সবিনয় অমুরোধ ভারতীয় দণ্ডবিধি ২২৭ ধারা অহুসারে অভিযুক্তাকে এই মামলা থেকে মুক্তি দেওয়া হোক।

বিচারপতি বললেন, প্রথমে দেখতে হবে, সরকার পক্ষ অভিযুক্তার বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য কোন বা একাধিক সাক্ষী উপস্থিত করতে পারছেন কিনা। যদি পারেন তবে তাদের কথা আমরা শুনতে হবে। তারপর বিবেচনার বিষয় হবে, এই মামলায় ২২৮ ধারা অহুসারে অভিযুক্তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হবে না, ধারা ২২৭ ধারা অহুসারে অভিযুক্তাকে মুক্তি দেওয়া হবে।

ভর্মা দাঁড়িয়ে বললেন, ইওর অনার, আদালতে মুক্তি যথার্থ। এবার আমি নিজের সাক্ষীর তালিকা প্রস্তুত করতে চাই। আদালতের সুবিধার জন্য আমি সংখ্যা দ্বিগুণে সাক্ষীদের চিহ্নিত করতে চাই।

এক ॥ হোটেলের সেকেন্ড ফ্লোরের বেয়ারা রামনরবংশ—যে গভীর রাতে কুশল ব্যানার্জীর ঘর থেকে অভিযুক্তাকে বেরিয়ে নিজের ঘরে যেতে দেখেছিল। এবং মৃতদেহ আবিষ্কারের সময় সকালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল।

দুই ॥ বাকেশ দীক্ষিত, অভিযুক্তার বড় ভাই। যিনি অভিযুক্তাকে কুশল ব্যানার্জীর সঙ্গে মেলোমেশায় আপত্তি করেছিলেন।

তিন ॥ বিনোদ মাথুর। যিনি অভিযুক্তার দেওর। যার কাছ থেকে এই মামলার কাজে লাগে এমন অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে।

চার ॥ প্রমোদ মাথুর। ইনিও অভিযুক্তার দেওর। নিঃসন্দেহে একজন মূল্যবান সাক্ষী।

পাঁচ ॥ ব্রজমোহন বর্মন। অভিযুক্তার কর্মচারী। অনেক তথ্য এর কাছে পাওয়া যাবে।

ছয় ॥ হোটেলের ম্যানেজার।

সাত ॥ ইন্সপেক্টর পরিহার। যিনি এই ‘কেস’ নিয়ে তদন্ত করেছেন।

আট ॥ ডাঃ প্রকাশ শ্রীবাস্তব। যিনি লোকেশ ট্যাণ্ডনের মৃতদেহ পোস্টমর্টম করেছেন।

এবং একজিবিট হিসাবে উপস্থিত করা হচ্ছে একটি লেডিস কুমাল। যা মৃত লোকেশ ট্যাণ্ডনের মৃত্যুর মধ্যে ছিল। ইওর অনার, এই কুমাল অভিযুক্তা ঋতু মাথুরের। আমার সাক্ষী এবং প্রমাণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করবে, এই মামলা ২২৭ ধারা অনুসারে অভিযুক্তাকে মুক্ত করার নয়—বরং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় ঋতু মাথুরকে অভিযুক্ত করে মামলাকে আগে বাড়াবার স্বযোগ দেওয়া হবে এই অনুরোধ আমি আদালতের সামনে রাখছি।

ভর্মা কুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বসে পড়লেন।

নরেন্দ্র আহুজা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে কিছুটা গম্ভীর দেখাচ্ছিল। দীর্ঘদেহী আহুজা শালীন ভঙ্গীতে বলতে আরম্ভ করলেন, ইওর অনার, সরকারীপক্ষের আমার মাননীয় বন্ধু আদালতের সামনে যে দলিল প্রস্তুত করলেন, তার তাৎপর্যের কোন গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি না। গুটিকয়েক সাক্ষীর নাম আওড়ে যাওয়া কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। এক্ষেত্রে দেখতে হবে ঐ সমস্ত সাক্ষীর বয়ান এই মামলার শেষ কথা কিনা। দুর্ভাগ্যক্রমে সেরকম আস্থাপ্রচক কোন ইঙ্গিত এখনও পাওয়া যায়নি।

সরকারীপক্ষ বলছেন, মৃত লোকেশ ট্যাণ্ডনের হাতে অভিযুক্তা ঋতু মাথুরের কুমাল পাওয়া গেছে। ইওর অনার, আমি আদালতের সামনে প্রমাণ রাখছি, কি ভাবে প্রমাণ হবে ঐ কুমাল অভিযুক্তার? উনি কি স্বীকার করেছেন ঐ কুমাল আর কাকর নয়, তাঁরই? নিজের স্টেটমেন্টে অভিযুক্তা এ সম্পর্কে কিছুই বলেননি। এমন কি পুলিশের পক্ষ থেকে কুমাল সংক্রান্ত কোন প্রায়ই করা হয়নি। আদালতে

‘পুলিস ডায়রী’ উপস্থিত করা হয়েছে। এটাই নিয়ম। ডায়রীর সার্টিফিকেট কপি আমার কাছে রয়েছে। আমি লক্ষ্য করেছি কোন সাক্ষীকেই ক্রমাল লম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা হয়নি। সুতরাং এই অহুমাননির্ভর একজিবিট আদালতের সামনে উপস্থিত করার অর্থ কি? সরকারী পক্ষের বোঝা উচিত অহুমান এবং প্রমাণ একই কথার এপিঠ-ওপিঠ নয়।

আহজা ধামলেন।

চশমা ঠিক করে নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, ইওর অনার, এই লম্বন্ধে আরো কিছু বলার আগে একটি বিষয়ের উল্লেখ রাখতে চাই। বিজ্ঞ সরকারী উকীল সাক্ষীর যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন, সবিস্ময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাতে দুজন বিশেষ সাক্ষীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। একজন রেস্টুরেটের বেয়ারা, যে মিসেস মাথুর এবং লোকেশ ট্যাগনের কথাবার্তা শুনেছিল। দ্বিতীয় জন হলেন কুশল ব্যানার্জী। যার ঘরে সে রাতে মিসেস মাথুর ছিলেন বলে জানা গেছে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় সরকারী পক্ষ এক বিশেষ ক্ষেত্রে আদালতকে অন্ধভাবে রাখবার চেষ্টা করছেন। ইওর অনার, আমি মেনে নিচ্ছি, মিসেস মাথুর, সে রাতে ২১০ নম্বর ঘর থেকে এক সময় বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়েছিলেন। এবং লোকেশ ট্যাগনের সঙ্গে কিছুক্ষণ ছিলেন—এতে কিন্তু প্রমাণ করা যায় না অভিযুক্তাই এই হত্যাকাণ্ডের জন্ত দায়ী। ভারতের বহু হাইকোর্টে এবং সুপ্রিম কোর্টে সময় সময় পরিস্থিতিগত প্রমাণ সম্পর্কে যে মত দেওয়া হয়েছে, তাতে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে, অভিযুক্তকে শেষবার মৃতকের সঙ্গে দেখা গেছে, শুধুমাত্র এই কারণেই তাকে হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মাননীয় চন্দ্রচূড় কর্ণাটক প্রদেশ বনাম এম. এল. মুনিশ্বামী এবং অন্তান্তদের মামলায় বলেছিলেন, অভিযুক্তার বিরুদ্ধে যে প্রমাণ প্রস্তুত করা হয়েছে তা মেনে নেবার পরও যদি দেখা যায় শাস্তি দেওয়ার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়, তবে অভিযুক্তকে মুক্তি দেওয়া উচিত। এ. আই. আর. ১৯৭৭ সুপ্রিম কোর্ট জার্নালের ১৪৮৯ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে। আমি পূর্বেও বলেছি, আবার বলছি, অভিযুক্তা সেদিন গভীর রাতে কিছুক্ষণ লোকেশ ট্যাগনের সঙ্গে ছিলেন—সাক্ষীদের এই উক্তিভেদে কিন্তু কোন-রকমেই প্রমাণিত হয় না, অভিযুক্তাই এই হত্যাকাণ্ডের জন্ত সর্বাংশে দায়ী।

ইওর অনার, এই মামলার অন্তিম পরিণতি যদি এই হয়, তবে কি প্রয়োজন আদালতের মূল্যবান সময় অকারণে নষ্ট করার? কি প্রয়োজন সরকারী ব্যায়কে বাড়িয়ে তোলার? এই সঙ্গে অভিযুক্তার মানবিক দিক এবং ধরনের বহর সম্পর্কেও

বিবেচনা করার অবকাশ রয়েছে। সুতরাং আমার সবিনয় নিবেদন, অভিযুক্ত ঋতু মাথুরকে এই মামলা থেকে মুক্তি দেওয়া হোক।

নরেন্দ্র আহুজা নিজের ব্যক্তব্য শেষ করে বসে পড়লেন।

বিচারপতি সরকারী উকীলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার আর কিছু বলার আছে? বিশেষে সুপ্রিম কোর্টের কলিং সম্পর্কে মিঃ আহুজা যা বললেন তা নিয়ে আপনার কোন ব্যক্তব্য আছে?

রনধীর ভর্মা দাঁড়ালেন।

মুখে হাসি টেনে বললেন তিনি, ইওর অনার, আমার মাননীয় বন্ধু সুপ্রিম কোর্টের যে কলিং আদালতের সামনে উপস্থিত করেছেন, আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে তা পুরাতত্ত্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। কারণ এরপরও আরো গুরুত্বপূর্ণ কলিং রয়েছে। ঐ ১৯১৭ সালের সুপ্রিম কোর্ট জার্নালের ২০১৮ পাতায় উল্লেখ রয়েছে, মাননীয় বিচারপতি উটওয়ার্লীয়া বলেছেন, যথেষ্ট সন্দেহের পরও কাউকে সাজা দেওয়া যায় না, তবে অপরাধ সম্পর্কে যদি সন্দেহের অবকাশ থাকে তাহলে অভিযুক্তের উপর আরোপ গঠন করা সাক্ষীদের উপস্থিত করে মামলাকে আগে বাড়াবার সুযোগ থাকা প্রয়োজন। সুতরাং বর্তমান ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে এখনই মুক্তি দেওয়ার কোন প্রস্তাব গুঠে না। বরং চার্জ গঠন করে মামলাকে আগে বাড়ানোই হবে সর্বাংশে যুক্তিযুক্ত।

নিজের ব্যক্তব্য শেষ করে রণধীর ভর্মা আসন গ্রহণ করলেন। নরেন্দ্র আহুজা আর কোন ব্যক্তব্য রাখলেন না। চিন্তিত মুখে বসে রইলেন নিজের চেয়ারে। বিচারপতি পর্যায়ক্রমে দুজনের দিকে তাকিয়ে নেবার পর বুঝলেন, এবার তাঁর বলার পালা। স্বাভাবিক কারণেই এখন তাঁর ব্যক্তব্য ভারী সংক্ষিপ্ত।

তিনি বললেন, আদালত শেষ হবার আগেই আমি নিজের ব্যক্তব্য আপনাদের জানিয়ে দেব।

অর্থাৎ শেষ বেলায় উনি জানাবেন, এই মামলা দায়রা সপর্দ হবে কিম্বা অভিযুক্তকে মুক্তি দেওয়া হবে। কুশল ঋতুকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। ঋতুর মুখ এখন চিন্তাভাবনায় লাল হয়ে রয়েছে। নিজের সহকারীকে নিয়ে নরেন্দ্র আহুজা এগিয়ে এলেন এই সময়। বহুদর্শী ব্যবহারজীবী। অভিযুক্তার মনোভাব এই পরিস্থিতিতে কোন পর্যায় গিয়ে দাঁড়ায় তিনি ভাল রকমই বোঝেন।

নবম গলায় বললেন, চিন্তিত হবেন না। মামলা যদি শেষ পর্যন্ত সেসালে পৌঁছয়, তাতেও কিছু আসবে যাবে না। হ্যারাসমেন্ট একটু হবে, তবে ম্যাডামকে ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারে সফল হব বিশ্বাস করি। ঠিক আছে। আবার এখানেই

বিকলে দেখা হবে।

উনি চলে গেলেন।

ঋতু বলল, উকীলরা এরকম বলেই থাকে। আমার ভারী ভয় করছে।

—এত নার্ভাস হলে কি চলে—কুশল বলল, মনকে এখন সামাল দিতে হবে।

মিঃ আহুজা আইন জগতের একজন দিগ্‌গজ ব্যক্তি। আজ্ঞেবাজ্ঞে কথা বলে মক্কেলের মন ভেজাবেন না।

—আমি তা কি জানি না। তবু মনকে বোঝাতে পারছি না।

—মনকে বোঝাও মাইডিয়ায়। তুমি ভেঙে পড়লে আমার খুব ভাল লাগবে ভেবেছো? ও সমস্ত কথা এখন থাক। চল, খাওয়াদাওয়ার পাট এই বেলা চুকিয়ে ফেলা যাক।

আদালত চত্বরের একধারে বহু গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। ওদের ফিয়েটও ছিল ঐ যান্ত্রিক জঙ্গলের মধ্যে। দুজনে সেদিকেই এগুলো। ঋতুর বাড়িতে নয়, ওরা উঠেছে ‘মোঁষ অ্যাণ্ড ক্লার্ক,’ হোটেলে। ওখানকার রেস্টুরাঁতে খাওয়াদাওয়া শেষে আবার ফিরে আসবে এখানে। কিন্তু গাড়ির কাছবরাবর পৌঁছবার আগেই ওদের পথরোধ করে দাঁড়াল রাকেশ।

ঋতুর ভ্রু কুঁচকে উঠল।

রাকেশ দ্রুত গলায় বলল, গতকাল পাটনায় এসেছি। গুনানির সময় আমি উপস্থিত ছিলাম।

—থাকাই তো উচিত। তোমরা সকলেই সরকারী পক্ষের সাক্ষী। আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার বড় রকম হুমিগ তোমাদের হাতে এসে গেছে।

—ও ভাবে বলছো কেন? তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কি লাভ হবে? আমাদের সাক্ষী হতে বাধ্য করা হয়েছে।

ঋতু এগুবার উপক্রম করে বলল, আর কিছু বলবার নেই বোধহয়? বেলা পড়ে আসছে। আমরা লাঞ্জে যাচ্ছি।

—একটা খবর দিতে এসেছিলাম। সন্ধ্যার ট্রেনে মা-বাবা আসছেন। তোমার সঙ্গে ওঁরা দেখা করতে চান।

—আমি ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে চাই না। ভবিষ্যতে তুমিও আমার সঙ্গে কথা বলতে না এলে খুশী হব।

—কিন্তু কেন?

—জীবনের সেরা অবলম্বন এতদিন পরে আমি পেয়েছি। তোমরা হলে দুষ্টগ্রহ। তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকলেই আমার মঙ্গল। বেঞ্চ, এস। আর

সময় নষ্ট করলে খিদে মরে যাবে ।

হতভম্ব বাকশের সামনে দিয়ে ওরা গাড়িতে গিয়ে বসল ।

স্টার্ট নেবার পর কুশল বলল, তুমি ও ভাবে না বললেও পারতে ।

—না বলে থাকতে পারি পারি না । ওরা শুধু আমারই ক্ষতি করেনি তোমার জীবনও নষ্ট করে ফেলেছিল ।

—শেষ রক্ষা তো আমরা করলাম ।

—আমাদের কৃতিত্ব এখানেই ।

কথা শেষ করে ঋতু হাসল ।

ফিয়েট তখন রাস্তায় নেমেছে ।

বেলা তখন চারটে ।

অ্যাডিশনাল ডিপুটি জজ এর এজলাস থেকে আহ্বান পেয়ে ঋতু গিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালো । আসামী পক্ষের ব্যবহারজীবী নরেন্দ্র আহুজা আগেই উপস্থিত হয়েছেন । রণধীর ভর্মা রয়েছেন যথানিয়মে । বিচারপতি বিন্দু মাত্র সময় নষ্ট না করে নিজের আদেশ পালন করার জগু তৎপর হলেন । তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, অভিযুক্ত পক্ষের প্রথ্যাত ব্যবহারজীবী মিঃ আহুজা নিজের দলিল উপস্থিত করার সময় বলেছেন, পরিস্থিতিগত প্রমাণে যতক্ষণ না এটা প্রমাণিত হচ্ছে, যে আসামীর বাঁচার আর কোন উপায় নেই ততক্ষণ তাকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না । উনি যে অগ্গায় কিছু বলেছেন তা নয় । তবে এক্ষেত্রে আমি তাঁর দলিল মেনে নিতে সম্মত হচ্ছি না । কারণ এখন, এ বিচারের প্রয়োজন নেই যে অভিযুক্তা দোষী কিংবা নির্দোষ । বরং যে সাক্ষী ও প্রমাণের কথা বলা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে দেখা দরকার এই মামলার পরিণতি কি হতে পারে । সুতরাং অভিযুক্তা ঋতু মাথুরের উপর ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং বি ১২০ ধারায় আরোপ গঠন করার আদেশ দিলাম । এই সঙ্গে সাক্ষী তালিকায় কুশল ব্যানার্জী এবং রেস্টুরেন্টের বেয়ারার নাম যুক্ত করা হল ।

বিচারপতি থামতেই ঋতুর মনে হল, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না । কাঠগড়ার রেলিং ছুঁ হাত দিয়ে চেপে ধরে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করতে লাগল । শরীরে যেন ঘামের বজ্রা নেমেছে । কুশল অবশ্য নিজেকে মোটামুটি প্রস্তুত করে রেখেছিল, তবু সমস্ত শরীর ঝনঝনিয়ে উঠল ।

বিচারপতি এবার নিয়মবিধি অনুসরণ করে বললেন, আমি, বিচারপতি আর. কে. দাস ক্রীমতী ঋতু মাথুরের উপর এই আরোপ গঠন করছি যে, তিনি

১৯৯০ সালে ১১ই এবং জাহ্নবীর রাজ্যে পাটনা শহরের এয়ার লাইন্স হোটেলে ।
লোকেশ ট্যাগুনকে হত্যা করেছেন । কাজেই ধারা ৩০২ এবং ১২০ অনুসারে
মামলা পরিচালিত হবে । এ সম্পর্কে অভিযুক্তার কি কিছু বলার আছে ?

ঋতু মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল ।

বিচারপতি আবার বললেন, আপনি কি অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছেন ?

ঋতু এবার মুখ তুলল ।

বলল ভেজা গলায়, আমি কোন অপরাধ করিনি । পুলিশের পক্ষ থেকে জোর
করে এই মামলায় আমাকে জড়ানো হয়েছে ।

এই মামলায় আজকের বিধিব্যবস্থা এখানেই শেষ হল । এই মাসের ২৭
তারিখ থেকে মূল কার্যকরণ আরম্ভ হবে । এবং এও স্থির করে দেওয়া হল,
বিচারের কার্যক্রমদিন প্রাতিদিন চলতে থাকবে রায় না হওয়া পর্যন্ত । মনমরা
ঋতুকে সঙ্গে নিয়ে কুশল আদালতকক্ষ থেকে বেরিয়ে এল । বারান্দাতে দাঁড়িয়েই
নরেন্দ্র আজ্ঞার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা হল, তারপর ওরা রওয়ানা হল ফিয়েটের
উদ্দেশ্যে ।

আজ বিচার আরম্ভ হবার দিন ।

লাঞ্চার পর আদালত থেকে ভাক পাওয়া গেল । আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে
দাঁড়াল ঋতু । আজ তাকে কিছুটা স্বচ্ছন্দ দেখাচ্ছে । সান্ধীমুখে এসে দাঁড়িয়েছেন
এয়ারলাইন্স হোটেলের ম্যানেজার । বিব্রতভাবে নিয়ে তিনি ঘামছেন । পাবলিক
প্রসিকিউটর রণধীর ভর্মা উঠে দাঁড়ালেন । ইতিমধ্যে গীতা ছুঁয়ে ম্যানেজারকে
প্রতিজ্ঞা করানো হল ।

রণধীর ভর্মা : আপনার নাম ?

ম্যানেজার : প্রেমপ্রকাশ মিনহাস ।

ভর্মা : হোটেলে কতদিন ধরে কাজ করছেন ?

ম্যানেজার : ন বছর কয়েক মাস ।

ভর্মা : ১৯৯০ সালের ১২ই জাহ্নবীর সকালে আপনি কোন হত্যাকাণ্ডের
সূচনা পান ?

ম্যানেজার : হ্যাঁ ! সকাল সাড়ে ছটা আন্দাজ সময় সেকেণ্ড ফ্লোরের বেরায়া
রান্নাঘর আমাকে গিয়ে জানায় ২১৬ নম্বর ঘরের বাধকমে একজন মর্মে পড়ে

আছে। ঐ ঘর ঋতু মাথুরের নামে বুক ছিল। গিয়ে দেখলাম ২২৮ নম্বর ঘরের লোকেশ ট্যাগুন মরে পড়ে রয়েছেন। আমি খুব দাবড়ে গিয়েছিলাম। স্থানীয় থানায় সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠালাম।

ভর্মা : ঋতু মাথুরের সঙ্গে আপনার কোন কথা হয়েছিল ?

ম্যানেজার : সামান্যই। উনি আমায় জানিয়েছিলেন, খুন সম্পর্কে কিছুই জানেন না। রাত্রে উনি নিজের ঘরে ছিলেন না।

ভর্মা : ঋতু মাথুর সম্পর্কে আপনি কি জানেন ?

ম্যানেজার : শুনোছিলাম, উনি কলকাতার এক ধনী পরিবারের বধু। ব্যবসার কাজে পাটনায় এসেছিলেন।

ভর্মা : লোকেশ ট্যাগুন ও ঋতু মাথুরের মধ্যকার সম্পর্ক সন্দেহজনক ছিল কিনা বলতে পারেন ?

ম্যানেজার : থাকলেও থাকতে পারে। বড় ঘরের বড় ব্যাপার।

ভর্মা : সম্পর্ক ছিল কিনা বলুন ?

ম্যানেজার : মনে হয় ছিল।

ভর্মা : কি ভাবে বুঝলেন ?

ম্যানেজার : লোকেশ ট্যাগুন আমার কাছ থেকে ঔর ঘরের নম্বর চেয়েছিলেন। ঔর গতিবিধি সম্পর্কেও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

ভর্মা : মিসেস মাথুর আপনাকে বলেছিলেন, সে রাত্রে উনি ঘরে ছিলেন না—কথাটা বিশ্বাস যোগ্য ?

ম্যানেজার : সকালে উনি ২১০ নম্বর থেকে বেরিয়েছিলেন, ঐ ফ্লোরের বেয়ারা দেখেছে।

ভর্মা : এমন কি হতে পারে না ম্যানেজার সাহাব, উনি গভীর রাতে ২১০ নম্বর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়েছিলেন, কিছুক্ষণ পরে আবার ২১০ নম্বর ঘরে ফিরে গেছেন ?

ম্যানেজার : হতে পারে।

ভর্মা : লোকেশ ট্যাগুনের সঙ্গে ঔর দেখা হয়েছিল ?

ম্যানেজার : নিজের ঘরে যখন গিয়েছিলেন, দেখা হবার কথা।

ভর্মা : এরপর সকালে আমরা লোকেশকে মৃত অবস্থায় পাচ্ছি। এতে প্রমাণ হচ্ছে নাকি, এই হত্যাকাণ্ডের জন্তু ঋতু মাথুরই দায়ী। আপনার মত কি ?

ম্যানেজার : আমি কি বলবো স্ত্রার। পুলিশের বিবেচনাকে সঠিক বলেই মনে করতে হবে।

ভর্মা : লোকেশ কেন খুন হল বলতে পারেন ?

ম্যানেজার : প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে অনেক সময় এরকম দুর্ঘটনা ঘটে ।

ভর্মা : আপনি স্বীকার করছেন, দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ?

ম্যানেজার : ঋতু মাথুর সম্পর্কে লোকেশ ট্যাগুনের ব্যস্ততা ও আগ্রহ দেখে আমার তাই মনে হয়েছিল ।

রণধার ভর্মা এবার বিচারপতির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, আমার প্রশ্ন শেষ হয়েছে । আসামাপক্ষ স্মরণে নিতে চাইলে নিতে পারেন ।

নরেন্দ্র আহুজা উঠে দাঁড়ালেন ।

এগিয়ে গেলেন সাক্ষীমঞ্চের দিকে ।

আহুজা : লোকেশ ট্যাগুন নিজেই নিজের ঘর বুক করেছিলেন ?

ম্যানেজার : বিনোদ মাথুর, লোকেশ ট্যাগুন এবং প্রমোদ মাথুরকে সঙ্গে নিয়ে কাউটারে এসেছিলেন । ওঁর কথাতাই আমি তিনজনকে তিনটে ঘরের ব্যবস্থা করেছি ।

আহুজা : ঋতু মাথুরের ঘর কি ভাবে বুক হয়েছিল ?

ম্যানেজার : ওঁর এক কর্মচারী ব্রজমোহন বর্মণ মিসেস মাথুরের জগা ঘর বুক করেছিলেন । পবে আমরা ঘরে রেজিস্ট্রার পাঠিয়েছি, উনি সই করে দিয়েছিলেন ।

আহুজা : আপনি বলেছেন, মিসেস মাথুর সম্পর্কে লোকেশ আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন । মিসেস মাথুরও কি লোকেশ সম্পর্কে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন আপনার কাছে ?

ম্যানেজার : না ।

আহুজা : ওঁর হাবভাবে বুঝতে পেরেছিলেন কি, লোকেশ ট্যাগুনের প্রতি ওঁর দুর্বলতা আছে ?

ম্যানেজার : না, মানে—হাবভাব বুঝবো কি ভাবে ? দুর্ঘটনার আগে ওঁর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি ।

আহুজা : তবে আপনি বললেন কি ভাবে, প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্রে এরকম ঘটেই থাকে ?

ম্যানেজার : লোকেশ ট্যাগুনের হাবভাব দেখে আমার মনে হয়েছিল দুজনের মধ্যে সম্পর্ক নিশ্চয় আছে ।

আহুজা : একজনের হাবভাব দেখেই, ঋতু মাথুরের মত একজন অভিজাত মহিলা সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুললেন ?

ম্যানেজার : আমার মনে হয়েছিল—মানে—

আহজা : মনে হওয়ার কথা বাদ দিন। পরিষ্কার করে বলুন, লোকেশ ট্যাণ্ডনের প্রতি ঋতু মাথুরের দুর্বলতা ছিল কি ছিল না ?

ম্যানেজার : আমি জানি না।

আহজা : কি জানেন না ?

ম্যানেজার : মিসেস মাথুরের কোন দুর্বলতা ছিল কিনা আমি জানি না।

আহজা : আপনাদের হোটেলে প্রতি ফ্লোরে কজন করে বেয়ারা ডিউটি দেয় ?

ম্যানেজার : প্রতি ফ্লোরে ছজন করে আছে।

আহজা : সেকেন্ড ফ্লোরের কথাই ধরা যাক। ছজন বেয়ারা নিশ্চয় চাবিশ ঘণ্টা ডিউটি করে না ?

ম্যানেজার : ডিউটি ভাগ করা আছে। প্রাতঃসিফটে তিনজন করে কাজ করে।

আহজা : সফটের ডিউরেশন। ক ?

ম্যানেজার : সকাল ছটা থেকে বেলা দুটো। আবার বেলা দুটো থেকে রাত দশটা।

আহজা : রাত দশটা থেকে ভোর পর্যন্ত কেউ থাকে না ?

ম্যানেজার : রাত্রে তো তেমন কোন কাজ থাকে না। তবে একজনকে রাখতে হয়। বলা তো যায় না। কিছু। যে থাকে তাকে ওভারটাইম দেওয়া হয়।

আহজা : এই বছরের ১১ই জানুয়ারী একজন নিশ্চয় ডিউটিতে ছিল। তার কি নাম বলতে পারেন ?

ম্যানেজার : প্রেমকুমার মিনহাসের পায়ের কাছে খানপাঁচেক বাঁধানো রেজিস্টার ছিল। ঝুঁকে তার মধ্যে থেকে একখানা বেছে নিয়ে পাতা উল্টে দেখতে লাগলেন। তারপর সেই রেজিস্টার নামে রাখলেন।

ম্যানেজার : কেউ ডিউটিতে ছিল না ?

আহজা : আপনি একটু আগেই বলেছেন, প্রতি রাত্রেই একজন ডিউটি দেয়। যার জন্য আপনাদের ওভারটাইম দিতে হয়।

ম্যানেজার : সেদিনের ব্যাপারটা ছিল অত্যন্ত রকম।

আহজা : কি রকম ছিল ব্যাপারটা ?

ম্যানেজার : সেদিনকার জলহাওয়া ছিল অত্যন্ত খারাপ। সন্ধ্যার পর কোন ফ্লাইট পর্যন্ত রওয়ানা হতে পারেনি। অনেক কর্মচারী ডিউটিতে আসতে পারেনি। এই কারণেই সেকেন্ড ফ্লোর আর ফোর্থ ফ্লোরে কাউকে ডিউটিতে পাঠানো সম্ভব হয়নি।

আহজা : এর মানে দাঁড়াল, সারা রাত ব্যাক থাকার পর, পরের দিন ভোর

ছটায় ভিউটি করতে এসেছিল একজন।

ম্যানেজার : আপনি ঠিক বলছেন ?

আহজা : ঐ বেয়ারার নাম কি ?

ম্যানেজার : রামনরেশ সোনী।

আহজা : রামনরেশই আপনাকে গিয়ে দুর্ঘটনার কথা বলেছিল ?

ম্যানেজার : হ্যাঁ।

আহজা : পনের দিন সকালে পুলিশ অভিযুক্তার ঘর শিল করার আগে ঐ ঘরের চাবি আপনি পেয়েছিলেন ?

ম্যানেজার : হ্যাঁ।

আহজা : কোথায় ছিল চাবি।

ম্যানেজার : ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখা ছিল।

নরেন্দ্র আহজা আর কোন প্রশ্ন করলেন না। ফিরে গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে। ম্যানেজারও নেমে এলেন সান্ধ্যকাল থেকে। সরকারী উকীল বর্ণধীর ভর্মা নিজের মুহুরীকে চাপা গলায় কিছু বলে উঠে দাঁড়ালেন।

ভর্মা : আজ আর একজন সাক্ষীকে উপস্থিত করতে চাই ইওর অনার।

বিচারপতি : ভাল কথা উপস্থিত ককন তাঁকে।

মুহুরীর ইশারায় বিনোদ মাথুর সাক্ষীমঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর চেহাবায় অস্বাচ্ছন্দ্যের কোন লক্ষণ নেই। মনে হয় অতীতে নানা মামলায় সাক্ষী দেবার অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। গীতা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি শেষ হল।

বর্ণধীর ভর্মা এগিয়ে এলেন।

ভর্মা : আসামীর কাঠগড়ায় যে মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে আপনি চেনেন ?

বিনোদ : হ্যাঁ। উনি আমার বৌদি।

ভর্মা : উনি আসামীর কাঠগড়ায় কেন ?

বিনোদ : আমার সম্বন্ধী লোকেশ ট্যাগুনকে হত্যা করার অপরাধে পুলিশ ওকে অভিযুক্ত করেছে।

ভর্মা : হত্যা করার কারণ কি ?

বিনোদ : উনি এরকম জঘন্য কাজ করেছেন বিশ্বাস করা শক্ত। তবে পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না।

ভর্মা : ধরুন উনি খুন করেছেন। আমি জানতে চাইছি এই খুনের পিছনে মোটিভ কি ?

বিনোদ : বলতে পারবো না। তবে—

ভর্মা : বলুন ?

বিনোদ : দাদা মাঝা যাবার পর উনি ভারী অস্থি ছিলেন । আমরা চাই-ছিলাম লোকেশের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে যাক । কিন্তু কুশল ব্যানার্জী এসে পড়ায় সব গোলমাল হয়ে গেল । পথের কাঁটা সরাবার জন্য যদি ব্যাপারটা ঘটে থাকে—অবশ্য আমি জোর দিয়ে কিছু বলছি না ।

ভর্মা : এই কুশল ব্যানার্জীর ব্যাপারটা কি ?

বিনোদ : বৌদির কুমারী জীবনের বন্ধু । এলাহাবাদে একই পাড়ায় দুজনে থাকতেন । কিছু দিন হল বৌদি ব্যানার্জীকে বিয়ে করেছেন ।

ভর্মা : মোটিভ তাহলে পারিষ্কার ?

বিনোদ : আমি স্থির বলেছি, জোর দিয়ে কিছু বলবো না ।

ভর্মা : লোকেশের সঙ্গে অভিমুক্তার সম্পর্ক কেমন ছিল ?

বিনোদ : খুবই ভাল ছিল । তাইতো আমরা দুজনের বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহশীল হয়ে পড়েছিলাম ।

ভর্মা : শেষ রক্ষা হল না । ওয়েল মিঃ বিনোদ, লোকেশ অভিমুক্তার ঘরে সেদিন কেন গিয়েছিল বলতে পারেন ?

বিনোদ : ঠিক বলতে পারবো না । তবে বৌদির ব্যাপারস্বাপার দেখে সে ভারী মর্মান্বিত হয়েছিল । মনে হয়, সোজামুজি কথা বলতেই সেদিন ওঁর ঘরে গিয়েছিল ।

ভর্মা : তখন রাত কটা ?

বিনোদ : সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিল ।

ভর্মা : আপনার বৌদি বলছেন উনি ঘরে ছিলেন না । তাই যদি হবে, তবে লোকেশ ওঁর ঘরে ঢুকলো কি ভাবে ?

বিনোদ : বৌদি পুলিশকে বলেছিলেন, দরজায় তালা না লাগিয়েই উনি কুশল ব্যানার্জীর ঘরে গিয়েছিলেন ।

ভর্মা : ঘরে দামী জিনিসপত্র রয়েছে, তা সত্ত্বেও বোর্ডার দরজায় চাবি দেবে না কথাটা বিশ্বাসযোগ্য ?

বিনোদ : আমার মনেও খটকা লেগেছিল । এখন মনে হচ্ছে কথাটা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয় ।

ভর্মা : তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল ? ঋতু মাথুর সে সময় ঘরেই ছিলেন । আপনার মত কি ?

বিনোদ : এখন মনে হচ্ছে আপনি ঠিকই বলছেন ।

ভর্মা : লোকেশ গিয়ে দরজা নক্ করে । অভিজুতা দরজা খুলে দিয়ে তাকে ঘরে প্রবেশ করার স্বযোগ করে দেন—ব্যাপারটা এইভাবে দাঁড়িয়েছিল, কি বলেন ?
বিনোদ : আপনি ঠিকই বলছেন ।

ভর্মা : পোস্টমর্টমের রিপোর্ট অনুসারে মারকিউরিক ক্লোরাইড লোকেশের মৃত্যুর জন্ত দায়ী ।

বিনোদ : আমিও সে কথা শুনেছি ।

ভর্মা : আপনার ধারণায় কি ভাবে মারকিউরিক ক্লোরাইড খাওয়ানো হয়েছিল ?

বিনোদ : লোকেশ নিশ্চয় জল খেতে চেয়েছিল । ঐ জলেই মেশানো ছিল বিষ ।

ভর্মা : অভিজুতার কাণ্ডকারখানায আপনাদের পরিবারের দুর্নাম রটেছে নিশ্চয় ?

বিনোদ : হ্যাঁ । আমরা সমাজে মুখ দেখাতে পারছি না । শেষ কাজটাও উনি খুবই খারাপ করেছেন ।

ভর্মা : শেষ কাজ বসতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন ?

বিনোদ : কুশল ব্যানার্জীকে বিয়ে করা ।

ভর্মা : উদ্দেশ্য তাহলে তো পরিষ্কার ।

বিনোদ : সকলে তাই বলছে ।

ভর্মা : সকলের কথা ছেড়ে দিন । আপনার মত বলুন ।

বিনোদ : আপনাকে তো আগে বলেছি, আমি নিশ্চিত নই । তবে বৌদি নিজের চরিত্রের যে পরিচয় দিয়েছেন, তাতে সবই সম্ভব ।

বর্ণধীর ভর্মা আর কোন প্রশ্ন করলেন না । নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন । নরেন্দ্র আহজা উঠে দাঁড়ালেন । এখন তাঁকে আত্মপ্রত্যয়ের প্রতীক মনে হচ্ছে । মস্তুর পায়ে আগুয়ে গেলেন সান্ধ্যকালের দিকে । বিনোদের মুখে আশঙ্কার চিহ্ন ।

আহজা : আপনার বৌদির সঙ্গে লোকেশ ট্যাঙ্কের পরিচয় হয় কবে ?

বিনোদ : বছর পাঁচেক আগে ।

আহজা : লোকেশ তো নাগপুরে ব্যবসা করতেন । দুজনের দেখাসাক্ষাৎ হত কি ভাবে ?

বিনোদ : ব্যবসার প্রয়োজনে লোকেশ প্রতি মাসেই কলকাতা আসতো । দেখাসাক্ষাতের কোন অস্ববিধা ছিল না ।

আহজা : আপনি বলতে চাইছেন, বছর পাঁচেক ধরে দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ?

বিনোদ : আমি তাই বলতে চাইছি ।

আহুজা : এতে আপনাদের পারিবারিক সম্মান নষ্ট হয়নি ?

বিনোদ : না, মানে—ব্যাপারটা নিজের মধ্যকার, তাই—

আহুজা : আপনি ধারাবাহিক ভাবে মিথ্যে কথা বলে চলেছেন। অভিযুক্তার সঙ্গে লোকেশ ট্যাগুনের কোন সম্পর্ক ছিল না। অভিযুক্তার বিশাল সম্পত্তির লোভেই আপনি নিজের সম্বন্ধটাকে মাঠে নামিয়েছিলেন।

বিনোদ : কথাটা ঠিক নয়।

আহুজা : ঠিক কথাটা কি ?

বিনোদ : কুশল ব্যানার্জী হঠাৎ এসে না পড়লে বৌদির সঙ্গে লোকেশের বিয়ে হত।

আহুজা : আপনি বলছেন, পাঁচ বছর ধরে দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তাই যদি হবে, এক সন্ধ্যায় অভিযুক্তার মত পালটে গেল কি ভাবে ? উনি এত আন্তরিক ভাবে কুশল ব্যানার্জীর দিকে ঝুঁকলেন কেন ?

বিনোদ : জীচরিত্র বোঝা এত সহজ নয়।

আহুজা : সাবেকি উক্তি আউডে ভাল ডিফেন্স নিয়েছেন। সরকারী পক্ষকে আপনি প্রকারান্তরে জানিয়েছেন, খুনের জন্য দায়ী ঋতু মাথুর। আমার প্রশ্ন এই পরিস্থিতিতে খুন করা কি অনিবার্য ছিল ?

বিনোদ : কি জানতে চাইছেন বুঝলাম না।

আহুজা : ঋতু মাথুর ধনবতী, ক্ষমতাশালী এবং স্বাধীনচেতা মহিলা। তিনি যা চাইতেন তাই করতে পারতেন। কুশল ব্যানার্জীকে বিয়ে করে তিনি নিজের স্বভাবের প্রমাণ রেখেছেন। লোকেশ ট্যাগুন পথের কাঁটা হতে যাবেন কেন ?

বিনোদ : পথের কাঁটা কেন হবে আমি কি করে বলবো ?

আহুজা : আপনিই বলবেন। সরকারী পক্ষকে এই রকম ইলারাই আপনি দিয়েছেন।

বিনোদ : পুলিশ বৌদিকে সন্দেহ করেছে। তাঁকে অভিযুক্ত করেছে কোর্টে। স্বাভাবিক কারণেই ধারণা হয়েছিল, ব্যাপারটা হয়তো ঠিক।

আহুজা : ধরুন, লোকেশ ট্যাগুন মাঝা যাননি। আপনার বৌদি কুশল ব্যানার্জীকে বিয়ে করলেন—কি ক্ষতি করতে পারতো লোকেশ আপনার বৌদির ?

বিনোদ : ক্ষতি আর কি করতে পারতো।

আহুজা : ঠিক। তাহলে লোকেশ ট্যাগুনকে পথের কাঁটা বলা যায় না ?

বিনোদ : কথাটা ঠিক—মানে—

আহুজা : পরিষ্কার করে বলুন।

বিনোদ : আপনার কথার কি উত্তর দেব বুঝে উঠতে পারছি না।

আহুজা : ঋতু মাথুর কুশল ব্যানার্জীকে বিয়ে করেছেন—আপনারা বাধা দিতে পেরেছিলেন ?

বিনোদ : না।

আহুজা : আপনাদের উনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। যা মন চেয়েছে তাই তাই করেছেন। লোকেশকে বাধা মনে করবেন কেন ?

বিনোদ : আমি কি করে বলবো ?

আহুজা : প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে লোকেশ অভিযুক্তার পথের কাঁটা ছিলেন না। তাই তো ?

বিনোদ : এ সম্বন্ধে আমার কোন মতামত নেই।

আহুজা : মারকিউরিক ক্লোরাইড বস্তুটা কি ?

বিনোদ : ঠিক জানি না। শুনেছি একধরনের বিষ।

আহুজা : এই বিষ সহজলভ্য ?

বিনোদ : বোধহয় না।

আহুজা : যে বস্তু সহজলভ্য নয়, আপনার বোদি কি ভাবে সংগ্রহ করলেন ?

বিনোদ : বলতে পারবো না।

আহুজা : আপনি তো অধিকাংশ প্রসঙ্গে এডিয়ে যাচ্ছেন। সাক্ষী হিসাবে যখন উপস্থিত হয়েছেন তখন প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক দিন।

বিনোদ : যা জানি না তার উত্তর কি ভাবে দেব ?

আহুজা : বেশ। যা জানেন সেই ধরনের প্রশ্নই করছি। আপনার বোদিকে কি বুদ্ধিমতী মহিলা বলা যায় ?

বিনোদ : ওকে কেউ নির্বোধ বলবে না।

আহুজা : কেন ?

বিনোদ : বুদ্ধি না থাকলে দাঁদার অল্পপস্থিতিতে এত ভাল ভাবে ব্যবসা চালাচ্ছেন কি ভাবে।

আহুজা : আপনি তাহলে স্বীকার করে নিচ্ছেন, কুশল ব্যানার্জীকে বিয়ে করে উনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন ?

বিনোদ : না, মানে—এই ব্যাপারটা—

আহুজা : বলতে চাইছেন এই ব্যাপারটা অল্প ধরনের। বেশ। এবার তাহলে অল্প আরেক দিক বিবেচনা করা যাক। একজন বুদ্ধিমতী মহিলা নিজের স্বরে—একজনকে খুন করবেন, এটা কতদূর যুক্তিসঙ্গত ?

বিনোদ : এরকম হওয়া তো উচিত ছিল না। অথচ হয়েছে। এ সম্পর্কে আমি আর কি বলবো ?

আহুজা : আপনিই বলবেন। আপনি স্বীকার করেছেন, উনি একজন বুদ্ধিমতী মহিলা। তবে কেন অভিযুক্তা নিজের ঘরে একজনকে খুন করে ফাঁসির দড়ি গলায় পরবার চেষ্টা করলেন ?

বিনোদ : আমি জানি না।

আহুজা : আপনি নিশ্চয় নির্বোধ নন। আপনার কমনসেন্স কি বলছে ? এরকম হওয়াটা কি উচিত ছিল ?

বিনোদ : না। খুন কিন্তু হয়েছে।

আহুজা : তা তো হয়েছেই। অল্প কেউ ঐ ঘরে লোকেশ ট্যাগুনকে খুন করে আপনার বৌদিকে ফাঁসাবার চেষ্টা করেছে, এখন কি আপনার তা মনে হচ্ছে না ?

বিনোদ : মনে হচ্ছে। তবে—

আহুজা : আপনি পরিষ্কার করে বলুন আমার যুক্তি ঠিক কিনা ?

বিনোদ : একদিক থেকে দেখতে গেল আপনার যুক্তি ঠিক।

আহুজা : আপনি তাহলে স্বীকার করে নিলেন, অভিযুক্তা লোকেশ ট্যাগুনকে খুন করেননি ?

বিনোদ : আমি স্বীকার করে নিলেও, একটা খুন কিন্তু হয়েছে।

আহুজা : বটেই তো। লোকেশকে অল্প কেউ খুন করে থাকলে বর্তমানে এই আদালতের কোন মাথাব্যথা নেই। বিচার্যের বিষয় হল অভিযুক্তা আরোপিত দোষ করেছেন কিনা। আপনি নিজের পরিষ্কার মত দিন, এখন কি আপনার মনে হচ্ছে, ঋতু মাধুরই লোকেশকে খুন করেছেন ?

বিনোদ : আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আপনার যুক্তি ঠিক হলে উনি লোকেশকে খুন করেননি।

আহুজা : ধন্যবাদ। আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।

নরেন্দ্র আহুজা নিজের জায়গায় এসে বসলেন।

ঋতু নেমে এল আসামীর কাঠগড়া থেকে।

বলা বাহুল্য এই মামলার কাজ আজকের মত শেষ হল।

রাকেশ দ্বিধিতকে আজ সাক্ষীর জগ্ন ভাকা হয়েছে।

বিব্রত ভাব নিয়ে এসে দাঁড়াল। গীতা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি শেষ হল এক

সময়। রণধীর ভর্মা এগিয়ে এসে তার পরিচয় আদালতের সামনে রাখলেন। তারপর প্রশ্ন-উত্তর আরম্ভ হল।

ভর্মা : আপনার সহোদরার সঙ্গে কুশল ব্যানার্জীর ভালবাসার সম্পর্ক ছিল ?

রাকেশ : অল্প বয়সের দুর্বলতা বলতে পারেন।

ভর্মা : দুজনের বিয়ে হল না কেন ?

রাকেশ : সামাজিক স্ট্যাটাসে পার্থক্য ছিল। কুশলের মত অতি সাধারণ ছেলেকে আমরা জামাই করতে রাজী হইনি।

ভর্মা : লোকেশ ট্যাঙনের ব্যাপারটা কি ?

রাকেশ : ঋতু খুব একা হয়ে পড়েছিল। ওর স্বত্ত্বরবাড়ির লোকেরা চাই-ছিলেন, ওর সঙ্গে লোকেশের বিয়ে হয়ে যাক।

ভর্মা : আপনি কি চাইছিলেন ?

রাকেশ : আমিও তাই চাইছিলাম।

ভর্মা : আপনার সহোদরার মত কি ছিল এ সম্পর্কে ?

রাকেশ : ওর অমত ছিল না।

ভর্মা : দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল কি ?

রাকেশ : ঠিক বলতে পারবো না। তবে মেলামেশা ভালই ছিল।

ভর্মা : তবু দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এ স্বস্তিসঙ্গত কারণ আছে নিশ্চয় ?

রাকেশ : কারণ একটাই। কুশল ব্যানার্জী। তার প্ররোচনাতেই লোকেশ খুন হয়েছে।

ভর্মা : আপনি বলতে চাইছেন, এই খুনের জন্ত দায়ী কুশল ব্যানার্জী ?

রাকেশ : হ্যাঁ। পুলিশের অপরিণামদর্শিতার দরুণ ঋতুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসল আসামী কুশল ব্যানার্জী।

এই সময় এক অভাবনীয় ব্যাপার হল।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ঋতু চিৎকার করে উঠল, মিথ্যে কথা। ব্যানার্জীকে মিথ্যে কথা বলে জড়ানো হচ্ছে।

রণধীর ভর্মা ওর দিকে এগিয়ে গেলেন।

ভর্মা : সত্যি কথাটা তাহলে কি ?

ঋতু : আমি জানি না।

ভর্মা : যখন জানেন না তখন কি ভাবে বলছেন, কুশল ব্যানার্জীর এই হত্যাকাণ্ডে হাত নেই।

ঋতু : আমরা দুজন সে রাতে একই সঙ্গে ছিলাম। একবারও ঘর থেকে

আমরা বাইরে আসিনি।

ভর্মা : কোন সাক্ষী নেই। কুশল বানাজীকে আড়াল করার অর্থ হল এই খুনের দায়িত্ব আপনি নিজের ঘাড়ে নিচ্ছেন।

ঋতু কিছু বলতে যাবার আগেই নরেন্দ্র আতঙ্ক উঠে দাঁড়ালেন।

আতঙ্ক : কথার মারপ্যাচে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না। চাক্ষুষ সাক্ষী কোথায় ?

ভর্মা : আমার মাননীয় বন্ধু ভুলে যাচ্ছেন, পরিস্থিতিগত প্রমাণ অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষার লক্ষ্য নয়।

আতঙ্ক : অনেক ক্ষেত্রের কথা বাদ দেন। আমি এই ক্ষেত্র সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছি।

ভর্মা কিছু বলার আগেই বিচারপতি মন্তব্য করলেন।

বিচারপতি : এই বির্তক এখন থাক। সাক্ষীকে জেরা করার ধারাবাহিকতা বাদীপক্ষ বজায় রাখুন।

ভর্মা : ইগর অনার, আদেশ আমরা মেনে চলবো।

উনি ঘুরে দাঁড়ালেন রাকেশ দীক্ষিতের দিকে।

ভর্মা : আপনি তো এলাহাবাদে থাকেন। ১১ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় আপনি পাটনা এয়ারপোর্টে পৌঁছলেন কি ভাবে ?

রাকেশ : ব্যবসার কাজে ঐদিন সকালে পাটনায় এসেছিলাম। সন্ধ্যার মুখে খবর পেলাম ঋতু এসেছিল এবং রাতের ক্লাইটে কলকাতা ফিরে যাচ্ছে।

ভর্মা : আপনি দেখা করতে গেলেন ?

রাকেশ : জল হাওয়া ভারী খারাপ ছিল। অনেক দিন গুর সঙ্গে দেখা হয়নি, তাই না গিয়ে থাকতে পারিনি।

ভর্মা : দুজনের মধ্যে কি প্রসঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল।

রাকেশ : গুর সঙ্গে লোকেশের বিয়ে নিয়ে কথা হয়েছিল।

ভর্মা : গুর মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন ?

রাকেশ : বিয়ের ব্যাপারে আপত্তি করেনি।

ঋতু আবার বাধার সৃষ্টি করল।

ঋতু : মিথ্যে কথা। প্রথম থেকেই এই বিয়েতে আমার আপত্তি ছিল। গুর মুখের উপর সেদিনও আমি আবার আপত্তি করেছিলাম।

ভর্মা : ইগর অনার, এইভাবে বারংবার বাধার সৃষ্টি হলে একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়।

বিচারপতি : অভিযুক্তকে সতর্ক করা হচ্ছে, এইভাবে বাধার সৃষ্টি করে

সময়ের অপচয় করবেন না।

ভর্মা : ওয়েল মিঃ রাকেশ, তারপর কি হল ?

রাকেশ : মিনিট কুড়ি ওখানে থাকাব পর আমি চলে এলাম।

ভর্মা : রাতে আপনি হোটেলেই ছিলেন ?

রাকেশ : হ্যাঁ। খাবার জল-চাওয়ার দকন ট্যাক্সি পেতাম না। হোটেলেই তাই থেকে যেতে হয়েছিল।

ভর্মা : দুর্ঘটনার কথা সকালে জানতে পারার পর আপনি কি করলেন ?

রাকেশ : আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। কি যে করবো ঠিক করা ঢকর হয়ে পড়েছিল। পুলিশ জিজ্ঞেসবাদ করলে, যা জানতাম বললাম। তারপর গুরা ঋতুকে ধরে নিয়ে গেল।

ভর্মা : আপনার বখায় আচ পাওয়া যাচ্ছে, কুশল ব্যানাজীও হঠাৎ উপস্থিত এই তত্ত্বাবধান মূল কারণ, নয় কি ?

রাকেশ : আপনি ঠিক বলাছেন।

ভর্মা : এমন তো হয়নি, আপনার সহোদর এবং কুশল ব্যানাজী ষড়যন্ত্র করে এই খুনের ব্যাপারে ঘটিয়েছেন ?

রাকেশ : খুনের সঙ্গে ঋতুর কোন সম্পর্ক নেই। ঋষাপরায়ণ হয়ে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বের কুশল ব্যানাজী মর্শিয়েছে।

ভর্মা : অসম্ভব বলেছেন, সে রাতে তিনি কুশল ব্যানাজীর ঘরে ছিলেন। আপনার কথাই যদি ঠিক হয় তবু প্রমাণ হচ্ছে না অভিযুক্ত। কল্পেই জানতেন না বা এই ব্যাপারে তার হাত নেই।

রাকেশ : আমার ধারণা ঋতু কিছুতেই জানতে। ন —এই ব্যাপারে তার হাত নেই।

ভর্মা : ‘ধারণা’ শব্দটা বোগাস। আপনি পরিষ্কার করে বলুন ?

রাকেশ : আমি যা বলবার বলেছি। আর কিছু বলার নেই।

ভর্মা : ঋতু মাথুরই লোকেশ ট্যাগুনকে খুন করেছেন—এটাই বাস্তব ঘটনা। ভেবেচিন্তে মত দিন।

রাকেশ : আপনার ধারণা সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না। আমার যা বলবার আগেই বলেছি।

ভর্মা : পুলিশ কিন্তু অভিযুক্ত করেছে ঋতু মাথুরকে।

রাকেশ : পুলিশের বিবেচনাবোধে আমি দখল দিতে পারি না। আমার আর কোন বক্তব্য নেই।

ভরম আর কোন প্রশ্ন করলেন না।

উনি আসন গ্রহণ করার পরই উঠে দাঁড়ালেন নরেন্দ্র আহুজা।

আহুজা : আপনি বলেছেন, কুশল ব্যানার্জী এই হত্যাকাণ্ডের স্রষ্টা দায়ী ?

বাকেশ : বলেছি।

আহুজা : পুলিশ যখন আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল তখন নিজের সন্দেহের কথা ওদের বলেছিলেন ?

বাকেশ : না।

আহুজা : কেন বলেন ন ?

বাকেশ : আমি নাতাস হয়ে পড়েছিলাম। ঠিক কি বললে পত্নীকে বাঁচানো যাবে বলে উঠতে পারিনি।

আহুজা : মিথ্যা কথা বলেছেন। ইচ্ছাকৃতভাবে তখন আপনি পুলিশকে কুশল ব্যানার্জী নাম বলেননি।

বাকেশ : আমি কোন মথ্যাপ আশ্রয় নইনি। ঋতুকে আমি বাঁচাতে চাই ন, এটি কথাই আপনি বলতে চাইছেন ?

আহুজা : ঠিক তাই। পুলিশকে আপনারা কেউ একবারও বলেননি এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অভিযুক্তার কোন সম্পর্ক নেই। আপনার নিজের সহোদর, তা সত্ত্বেও ‘বেল’ এর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাননি।

বাকেশ : কুশল সব ব্যবস্থা করছে। কাজেই—

আহুজা : কুশলকে তো আপনি পছন্দ করেন না। তাহলে ‘বেল’ নেওয়ার ব্যাপারটা তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়া হল কেন ?

বাকেশ : আমি কি বলবো। মানে—

আহুজা : এই স্পর্শকাতর ব্যাপারটা উপেক্ষার বিষয় নয়। শুধু আপনি নন, অভিযুক্তার খুশদ বাউল লোকেরাও কোন ইন্টারেস্ট নেননি। এই অনীহার কারণ কি তা জানার অধিকার এই আদালতের আছে। উক্ত দিন কেন আপনি ইন্টারেস্ট নেননি।

বাকেশ : আমি ‘কি বলবো’। কোন প্যাচালো চিন্তাধারা এর মধ্যে ছিল না। তবে এ ব্যাপারে আমার এগিয়ে না যাওয়াটা অত্যন্ত হয়েছে।

আহুজা : এটা ইচ্ছাকৃত। কারণটা বলুন ?

বাকেশ : আপনি বলতে চাইছেন, ঋতুর ফাঁসি বা আজীবন কারাবাস হয়ে যাক আমরা তাই চেয়েছিলাম ?

আহুজা : তা যদি না চাইবেন তবে ব্যস্ততা প্রকাশ করেননি কেন ? ছোটোছোটো

করে ওঁর 'বেল'-এর ব্যবস্থা করেননি কেন ? কেন এমন লোকের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন যাকে আপনারা কেউই পছন্দ করেন না ?

রাকেশ : ঋতুকে বিপদে ফেলে আমাদের কি লাভ ?

আহুজা : লাভক্ষতির হিসাব আপনার মুখ থেকে জানতে চাইছি ?

রাকেশ : কোন হিসাব নেই।

আহুজা : সে রাত্রে অভিযুক্তা কুশল ব্যানাজীর ঘরে ছিলেন, আপনি নিশ্চয় জানেন ?

রাকেশ : জানি।

আহুজা : আপনার বিধবা বোন পরের ঘরে গিয়ে রাত কাটালেন, এ সম্পর্কে আপনার কোন ব্যক্তব্য আছে ?

রাকেশ : কাকর ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি মাথা গলাই না।

আহুজা : মিথ্যে কথা বলছেন। লোকেশ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে অভিযুক্তার বিয়ে হয়ে যাক এ নিয়ে আপনি চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। এটা কি পরের ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলানো নয় ?

রাকেশ : আমি ঋতুর ভাল করতে চেয়েছিলাম।

আহুজা : আপনি সব সব সময়ে নিজের ভাল চেয়ে এসেছেন ?

রাকেশ : হ্যাঁ।

আহুজা : ভাল চাইলে, আপনি কুশল ব্যানাজীকে হত্যাকরী হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করতেন না।

রাকেশ : আমার বোনের ভাল-মন্দস সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নেই।

আহুজা : গভীর সম্পর্ক আছে। একই ঘরে দুজন রয়েছে। মনে রাখতে হবে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ভারী মধুর। এবজন ঘর থেকে বেকল গুরুতর অপরাধ করতে, অগ্নজন কিছু জানল না ?

রাকেশ নীরব রইল।

আহুজা : চূপ করে থাকবেন না। বলুন, এটা সম্ভব কিনা ?

রাকেশ : তখন হয়তো ঋতু ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আহুজা : পোস্টমর্টমের রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাত সাড়ে দশটা থেকে বারটার মধ্যে লোকেশ ট্যাণ্ডন মারা গেছেন। অভিযুক্তা সাড়ে দশটার সময় কুশল ব্যানাজীর ঘরে গিয়েছিলেন। বহু বছর পরে দুজনের একান্ত সাক্ষাৎ—সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ার প্রসঙ্গ ওঠে কি ?

রাকেশ নীরব।

আহজা : বলুন, আমি যা বলাছি ঠিক কিনা ?

রাকেশ : আপনার যুক্তি হয়তো ঠিক ।

আহজা : যুক্তি নয়, এটাই বাস্তব । স্বাভাবিক কারণেই ওঁরা অন্ততঃ ঘণ্টা তিনেক জেগে ছিলেন । তাহলে কি দাঁড়াল ?

রাকেশ : আমি তো বুঝতে পারছি না ।

আহজা : এই সহজ ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না ! পোস্টমর্টম রিপোর্টের সময়সীমার মধ্যে ওঁরা দুজনেই জেগেছিলেন । কাজেই একজন ঘর থেকে বেরুলে আর একজনের অজানা থাকার কথা নয় । এবার বলুন, কুশল ব্যানার্জী লোকেশ ট্যাগুনকে খুন করেছেন ?

রাকেশ : এখন মনে হচ্ছে, ঘটনাটা অত্যাশ্চর্যে ঘটেছে ।

আহজা : ওভাবে নয়, পরিষ্কার করে বলুন, কুশল ব্যানার্জী কি লোকেশ ট্যাগুনকে খুন করেছেন ?

রাকেশ : না, বোধহয় ।

আহজা : ঋতু মাথুর কি লোকেশ ট্যাগুনকে খুন করেছেন ?

রাকেশ : না ।

আহজা : অভিব্যক্ত কুশল ব্যানার্জীকে বিয়ে করার আপনি নিশ্চয় খুশী হতে পারেননি ।

রাকেশ : খুশী না হওয়াটাই স্বাভাবিক ।

আহজা : এই কারণেই আপনি কুশল ব্যানার্জীর উপর দোষ চাপাচ্ছিলেন । এও একধরনের প্রাতিশোধস্পৃহা—কি বলেন ।

রাকেশ নীরব রইল ।

আহজা : বলুন ? চূপ করে থাকবেন না ।

রাকেশ : আমার আর কিছু বলার নেই ।

নরেন্দ্র আহজা আর কোন প্রশ্ন করলেন না । উনি আসন গ্রহণ করার পরই, আরো একজন সাক্ষীকে উপস্থিত করার অহুমতি চাইলেন রণধীর ভর্মা । বিচারপতি সম্মতি জানানলেন । এবার সাক্ষীমঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন প্রমোদ মাধুর । শপথ গ্রহণ ও পরিচয়ের পালা শেষ হল অল্প সময়ের মধ্যেই ।

ভর্মা : লোকেশ ট্যাগুনের মৃত্যু সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ?

প্রমোদ : খুন হয়েছে ।

ভর্মা : তা তো হয়েছেই । আমি আপনার ধারণার কথা জানতে চাইছি ।

প্রমোদ : ধারণা তো পরিষ্কার । ওকে খুন করা হয়েছে ।

ভর্মা : আমার প্রাণ আপনি বোঝার চেষ্টা করুন। আমি জানতে চাইছি, আপনার ধারণায় লোকেশকে কে খুন করেছে ?

প্রমোদ : পুন্স সে কথা বলেছে।

ভর্মা : আদালত আপনার মুখ থেকে শুনতে চায়।

প্রমোদ : এ কাজ আমাদের বোদর।

ভর্মা : কেন তিনি লোকেশকে খুন করলেন ?

প্রমোদ : উনি যে এত বেহায়া আর বেপরোয়া আর্মি আগে বুঝতে পারিনি। কুশল ব্যানাজীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার পরই উনি নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছেন।

ভর্মা : খুনেব উদ্দেশ্য কি ?

প্রমোদ : প্রেম আর ব্যভিচারের তাড়নায় এই কাজ উনি করেছেন।

ভর্মা : কিন্তু এরকম শোনা গেছে, লোকেশের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ওর প্রেমের সম্পর্ক ছিল।

প্রমোদ : আমরাও তাই জানতাম। এই কারণেই দুজনের বিয়ে হয়ে যাক সকলে চেয়েছিল।

ভর্মা : অভিযুক্তা তো সে রাত্রে কুশল ব্যানাজীর ঘরে ছিলেন। খুন করলেন কি ভাবে।

প্রমোদ : একসময় উনি কুশল ব্যানাজীর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়েছিলেন। লোকেশ ওখানেই ছিল। তারপর ওকে ছলাকলায় ভুলিয়ে উনি নিজের কাজ সেরেছেন।

ভর্মা : গভীর রাতে অভিযুক্তা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, কুশল ব্যানাজী বুঝতে পারেনি।

প্রমোদ : বুঝতে পেরেছিল।

ভর্মা : আপনি বলতে চাইছেন, কুশল ব্যানাজীর এই ব্যাপারে সমর্থন ছিল ?

প্রমোদ : নিশ্চয় ছিল।

ভর্মা : অভিযুক্তার তালিকায় আর কারুর কিন্তু নাম নেই।

প্রমোদ : এটা পুলিশের দোষ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ভাল ভাবে তদন্ত না করেই কেস সাজায়।

ভর্মা : মার্কিউরিক ক্লোরাইডের সাহায্যে লোকেশকে খুন করা হয়েছিল, শুনেছেন বোধহয় ?

প্রমোদ : শুনেছি।

ভর্মা : এই ভেষজ অভিযুক্ত কি ভাবে সংগ্রহ করেছিলেন বলতে পারেন ?

প্রমোদ : টাকা খরচ করলে সবই পাওয়া যায়। উনি ধনী মহিলা। প্রচুর টাকা আছে তাঁর। ওষুধের দোকানও আছে বৌদির।

ভর্মা : ধন্যবাদ। আর কোন প্রশ্ন নেই।

রণধীর ভর্মা আসন গ্রহন করলেন।

উঠে দাঁড়ালেন নরেন্দ্র আহুজা। এগিয়ে গেলেন সাক্ষীমঞ্চের দিকে।

আহুজা : আপনি বলেছেন, অভিযুক্ত এবং কুশল ব্যানাজী বডবস করে লোকেশ ট্যাঙনকে খুন করেছেন ? এ কথা বলেছেন কি ?

প্রমোদ : বলেছি।

আহুজা : আদালতে সে কথা বলতে পারলেন, পুলিশকে বলেননি কেন ?

প্রমোদ : কেন কথা ?

আহুজা : কুশল ব্যানাজী এই হত্যাকাণ্ডের একজন অংশীদার—আপনার সন্দেহের কথা ?

প্রমোদ : কেন বলিনি মনে পড়ছে না।

আহুজা : সন্দেহ আর প্রমাণ এক কথা নয়, নিশ্চয় বোঝেন ? কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করছে আপনার অভিযোগ ?

প্রমোদ : প্রমাণ সংগ্রহ করার দায়িত্ব আমার নয়।

আহুজা : প্রমাণ ছাড়াই কারুর উপর দোষ চাপানো আপনার দায়িত্ব হওয়া উচিত নয়। আপনার সন্দেহের জোড় কত শক্ত এবার তাই দেখা যাক। লোকেশ ট্যাঙনের দেহের গঠন কেমন ছিল ?

প্রমোদ : দোহারি গভনের দীর্ঘকায় লোক ছিল।

আহুজা : ওরকম একজন ভারী চেহারার পুরুষকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখা অভিযুক্তার পক্ষে সম্ভব ?

প্রমোদ : লোকেশের মৃত্যুর পর কুশল ব্যানাজী হয়তো ওখানে গিয়ে পড়েছিল।

আহুজা : তারপর দুজনে মিলে মৃতদেহ বাথরুমে নিয়ে গেছেন ?

প্রমোদ : হ্যাঁ।

আহুজা : আপনার কথা মেনে নিয়েই প্রশ্ন করছি, মৃতদেহ বাথরুমে ফেলে রাখা হল কেন ?

প্রমোদ : আমি জানি না।

আহুজা : জানেন না ! অথচ বলেছেন, মৃতদেহ ওখানে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ? আদালতকে বলুন, আপনার ধারণায় মৃতদেহ ওখানে কেন পড়েছিল ?

প্রমোদ : আমার কোন ধরণা নেই ।

আহজা : অভিযুক্তা ঋতু মাথুরকে তো আপনি দীর্ঘদিন ধরে জানেন । ঠুঁকে কি নির্বোধ বলে মনে হয় ?

প্রমোদ : না ।

আহজা : উনি কি বুদ্ধিমত্তি মহিলা ?

প্রমোদ : হ্যাঁ ।

আহজা : অভিযুক্তা বুদ্ধিমত্তী হয়েও লোকেশের মৃতদেহ নিজের বাথকমে ফেলে রাখলেন কেন ? কুশল বানার্জীর সহযোগিতায় ঘরের বাইরে, কব্রিডরে ফেলে রাখলে কেউ ঠুঁকে সন্দেহ করতো না । এই সহজ বুদ্ধিটা ঠর মাথায় আসেনি কেন ।

প্রমোদ : আমি কি বরে বলবো ।

আহজা : আপনাকেই বলতে হবে । আপনি ওদের অভিযুক্তা রাখেন । কারুর নামে যা ইচ্ছে তাই এলাব অধিকার আইন স্ট্রেনি কাউকে ।

প্রমোদ : মৃতদেহ বাইরে সরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল ।

আহজা : স্বীকার করলেন । আবার একথাও বলেছেন, ঋতু মাথুর বুদ্ধিমত্তী মহিলা । আপনার ক মনে হচ্ছে না, অভিযুক্তাকে এক ষড়যন্ত্রে জড়ানো হয়েছে ?

প্রমোদ : কে ওকে ষড়যন্ত্র জড়াবে ?

আহজা : এখন বিচার তা নয় । এমন কি হতে পারে ন, অভিযুক্তার অল্পপস্থিতির স্বযোগ নিয়ে লোকেশকে খুন করেছে অথ কেউ ?

প্রমোদ : কে খুন করবে ?

আহজা : কে করেছে এখন তা বড় প্রশ্ন নয় । আমি যা বললাম, সে রকম সম্ভাবনা আছে কিনা তার উত্তর দিন ।

প্রমোদ : বৌদি দোষী না হলে এরকম সম্ভাবনা আছে ।

আহজা : এক টিলে দুই পাখী মায়া হয়েছে । লোকেশ মরেছে, এই সঙ্গে ঋতু মাথুরকেও সন্দেহের ঘেরায় এনে ফেলা সম্ভব হয়েছে । আপনি কি বলেন ।

প্রমোদ : আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না ।

আহজা : একটা কিছুতো বলতেই হবে । বলুন, আমি যা বলেছি, সেও এক সম্ভাবনা আছে কিনা ?

প্রমোদ : ইতঃস্তত ভঙ্গীতে চুপ করে রইল ।

আহজা : চুপ করে থাকবেন না । বলুন ?

প্রমোদ : সম্ভাবনা আছে ।

আহজা : আপনি সরকারী পক্ষের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, অভিযুক্তার সঙ্গে লোকেশ ট্যাঙনের প্রেম ভালবাসার সম্পর্ক ছিল ?

প্রমোদ : আমরা সেই রকমই জানতাম ।

আহজা : মেনে নিলাম । দুর্ঘটনার পর পুলিশ আপনাকে জেতা করেছিল ?

প্রমোদ : করেছিল ।

আহজা : পুলিশকে যা বলেছিলেন সব মনে আছে ?

প্রমোদ : মোটামুটি মনে আছে ।

আহজা : তাহলে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আপনার আজকের দেওয়া সাক্ষ্য মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে ?

প্রমোদ : কি ভাবে ? আমি তো—

আহজা : আপনি নিজেই নিজেকে মিথ্যাবাদী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ।

প্রমোদ : পুলিশকে আমি এমন কোন কথাই বলিনি, যাতে এখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলা যায় ।

আহজা : বলেছেন । পুলিশ-ডায়রীর সার্টিফিকেড কপি আমার কাছে রয়েছে । ইন্সপেক্টর পরিহার আপনাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার বৌদির সঙ্গে লোকেশের সম্পর্ক কেমন । ছল উত্তরে আপনি বলেছেন, কোন সম্পর্ক ছিল বলে আমি জানি না । কখনও দুজনকে আন্তরিক ভঙ্গীতে কথাবার্তা বলতেও দেখিনি । সেই-ই আপনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আদালতকে বিভ্রান্ত করছেন ।

প্রমোদ বিব্রত ভঙ্গীতে চূপ করে রইল ।

তার কপাল ও মুখে ঘামের স্রোত বয়ে চলেছে ।

আহজা : বলুন—বলুন—কোন কথাটা ঠিক ?

প্রমোদ : পুলিশকে কি বলেছিলাম, আমার মনে ছিল না ।

আহজা : এখন নিশ্চয় মনে পড়ে গেছে ? এবার আদালতকে সত্যি কথাটা বলুন । ঋতু মাথুরের সঙ্গে লোকেশ ট্যাঙনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল কি ছিল না ?

প্রমোদ : ছিল কিনা আমি জানি না ।

আহজা : কেউ আপনাকে বলেছিল ওঁদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক আছে ?

প্রমোদ : না ।

আহজা : তবে কেন এই আদালতে কিছুক্ষণ আগে আপনি মিথ্যার জাল বুনেছিলেন ।

প্রমোদ : আমি প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝতে পারিনি ।

আহজা : আবার মিথ্যাকথা বলছেন । প্রশ্নের গুরুত্ব ঠিকই বুঝেছিলেন ।

ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ ধরনের কথা বলে আপনি অভিযুক্তার বিরুদ্ধে মোটিভ তৈরী করার চেষ্টা করেছেন।

প্রমোদ : এতে আমার কোন স্বার্থ নেই।

আহজা : স্বার্থ না থাকলে, অস্তিত্ব নেই এমন ব্যাপারকে এত গুরুত্ব দেবার অর্থ কি ? অকারণে কেউ কাউকে খুন করে ?

প্রমোদ : না।

আহজা : অভিযুক্তা কুশল ব্যানাজীকে বিয়ে করেছেন। কাকব বাধা দেবার সাহস হয়েছে ?

প্রমোদ : না।

আহজা : কেন ?

প্রমোদ : বৌদ স্বাধীন ম হল। কাকব বাধা মানবেন কেন ?

আহজা : ঠিক বলেছেন। লোকেশের তাহলে কোন বাধা ছিল না। তাকে অগ্রাহ্য করেই অভিযুক্তা কুশল ব্যানাজীকে বিয়ে করতে পাবতেন ?

প্রমোদ : হ্যাঁ।

আহজা : আপনার কথায় এটা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, লোকেশকে খুন করার কোন মোটিভ ঋতু মাথুরের ছিল না।

প্রমোদ : আমি আর কি বলবো।

আহজা : মিথ্যাব জাল বুঝতে গিয়ে আপনি ধরা পড়ে গিয়েছেন। এখন আদালতের সামনে পরিষ্কার করে বলুন, অভিযুক্তার লোকেশকে খুন করার কোন মোটিভ ছিল কি। ছিল না ?

প্রমোদ : এখন মনে হচ্ছে ছিল না।

আহজা : ধন্যবাদ। আর কোন প্রশ্ন নেই।

নরেন্দ্র আহজা নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন।

আজকের মত এই মামলার কাজ শেষ হল।

নটা বাজতে তখন দশ মিনিট বাকী আছে।

“মোর্ধ অ্যাণ্ড ক্লাক” হোটেলের একশো কুড়ি নম্বর ঘর জোড়ালে আলোর উদ্ভাসিত। টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে ঋতু সোফায় এসে বসল। রুম মার্ভিসকে নৈশ আহারের মেহ জানিয়ে দিল। এই সঙ্গে এণ্ড বলেছিল, খাবার যেন সাড়ে নটার পর পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ঋতুর চেহারার এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিয়ের পর গুরু চাপা লাগিত্য

যেন ফুটে বেরিয়েছে। কুশল এখন ঘরে নেই। কোর্ট থেকে ফেরার পর আবার বেরিয়ে গেছে। যদিও ছুটিতে আছে। তবু গেছে ওদের জোনাল অফিসেই। কার সঙ্গে কি যেন কথা আছে।

ঋতু রিস্টওয়ার্চের দিকে তাকিয়ে নিল।

ওকে আজ কেমন মনমরা দেখাচ্ছে।

কুশল ফিরল সওয়া নটার সময়। টাই-নট্ টিলে করতে করতে হাসল। তার-পর এসে বসল সোফায়। দুহাত দিয়ে ঋতুকে নিজের কাছে টেনে নিল। বহু বছরের ফাঁকটা এমন ভাবে বুজে গেছে যে, এখন মনেই হয় না ওরা সত্ত্ব বিবাহিত।

ঋতু অন্ত্রযোগের শুরুর বলল, কতক্ষণ ধরে আমি একা রয়েছি বল তো ?

—একটু দেরি হয়ে গেল।

—একটু নয়। বেশ দেরিতে ফিরেছো।

—বায়চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আজই এসেছে কলকাতা থেকে। এখন আমার কাজ ঐ দেখছে। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল।

—এটিকে আমি চুপ করে বসে আছি। কিছুই করার নেই।

কুশল মুহূ হেসে বলল, সঙ্ক্যার কথা বাদ দাও। পুরো রাত পড়ে রয়েছে। অনেক কাজ করার সুযোগ আমরা পাবো।

ঋতু ওকে ঠেলা দিয়ে বলল, অসভ্য কোথাকার।

—সত্যি কথা বলতে কি আমি ভারী ভাল ছেলে ছিলাম। কিন্তু এমন নেশা তুমি ধরিয়েছো যে সব লাগামের বাইরে চলে গেছে।

—ভূতপূর্ব ভাল ছেলেটির জন্ত এখন কিন্তু আমি বেশ চিন্তিত।

—কেন মাইডিয়্যার, আমি আবার কি করলাম ?

—তুমি কিছু করনি। কিছু লোক তোমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে।

সবিস্ময়ে কুশল বলল, সে কি ! তারা কারা ?

—বেঞ্জ, তোমাকে নিয়ে আর পারলাম না। চোখ কান বন্ধ করে থাকে নাকি ?

—কি হয়েছে বল তো ?

—আমি কোর্ট এর কথা বলছি।

—কোর্টের কথা বলছো ? সব তো ঠিকমতই এগুচ্ছে। দেখে নিও, আমার মন যা বলছে তাই হবে। কোর্ট তোমাকে ছেড়ে দেবে।

ঋতু ওর মুখে ঠোট বুলিয়ে নিয়ে বলল, আমি আমার কথা বলছি না। আমার

দুশ্চিন্তা তোমাকে নিয়েই। ওরা তোমাকে জড়াবে দৃঢ় কোটে কি রকম চেঁচা চালিয়ে যাচ্ছে দেখছে তো!

—চেঁচা চালাতে দাও। আমাদের চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই।

—তুমি হাঙ্কা ভাবে ব্যাপারটা নিও না। চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। এক, এক সময় আমার মনে হচ্ছে, তোমার জীবনে আমি না এলেই ভাল হত।

—কি আজবাজে বলছো?

—ঠিকই বলছি। তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হলে তুমি এই ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে না। একটা বিপদের সম্ভাবনা তোমাকে ভাড়া করে ফিরতো না।

জোরে হেসে উঠল কুশল।

তারপর হালকা গলায় বলল, সুপারস্টেশনকে প্রায় দেওয়ার অর্থই হল নিজেকে দুর্বল করে তোলা। আর দুশ্চিন্তা—আমাকে তুমি ভারী ভালবাস, দুশ্চিন্তা তো হবেই। শোন, হাজার চেঁচা করলেও এই মামলার ওরা আমাকে জড়াতে পারবে না। মিঃ আইজার জেরায় এটা প্রকাশ পেয়ে গেছে লোকেশ ট্যাঙনকে খুন করার ব্যাপারে তোমার বা আমার কোন মোটিভ ছিল না।

—তবু মনকে বোঝাতে পারছি না।

—আমি বলছি কিছুই হবে না। তুমি দেখে নিও, আমাদের বাকী জীবন ভারী আনন্দের মধ্যে দিয়ে কাটবে।

ঋতু দু হাত দিয়ে কুশলের গলা জড়িয়ে ধরল।

—আমি কোন মূল্যেই তোমাকে আর হারাতে চাই না। তাই তো সব সময় এত শক্তিত হয়ে থাকি।

কুশল কিছু বলার আগেই ভোরবেল বেজে উঠল।

এখন নটা বেজে কুড়ি। বেয়ারা এত তাড়াতাড়ি খাবার নিয়ে এসেছে। ঋতুর, চোখে ভাজ, মুখে আঁচল বুলিয়ে নিয়ে ও উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। লবিন্সয়ে দেখল বেয়ারা নয়, রাকেশ দাঁড়িয়ে আছে। মন ভারী হয়ে উঠল।

ঝাঁজ যেখানে গলায় ঋতু বলল, কেন আমাকে বারবার বিরক্ত করছো বল তো?

রাকেশ বলল, মা-বাবা কাল আসবেন তোমাকে বলেছিলাম। ওঁরা আজ কিছুক্ষণ আগে পাটনায় এসেছেন।

—তোমাকে বলেছি, আমি ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে চাই না।

—ওঁরা কারাশিরাং থেকে আসছেন।

ঋতুর মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা গুলিয়ে উঠল।

—কারশিয়াং থেকে কেন ?

—ওঁরা লুনাকে সঙ্গে এনেছেন। বাবাকে ফুলে লুনাব গাজেন তুমিই করেছিলে। উনি সঙ্গে করে ওকে আনতেই পারেন।

—এখন ওর কোন ছুটি নেই।

—তবু এনেছেন। লুনার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করতে চাও ?

কারডোবের দেওয়ালের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল লুনা। স্ট্রটেশ রাখা ছিল ওর পাশেই। এবার এগিয়ে এল। মিষ্টি চেহারায় লুনাকে বয়সের চেয়ে বড় দেখায়। মা ও মেয়ে এখন মুখোমুখি।

—মাশা—

হু হাত বাড়িয়ে দিয়েছে লুনা।

ঋতু ওকে জাডয়ে ধরল। চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে তুলল মুখ।

তারপর—

—তুমি এবার যেতে পারো দাদা। লুনা আমার কাছেই থাকবে।

ঋতু এগিয়ে গিয়ে স্ট্রটেশ তুলে নিল। ঘরে ফিরে এসে বাকেশের মুখের উপব দরজা বন্ধ করে দিল। কুশল একই ভাবে বসেছিল সোফায়। শুনতে পেয়েছিল সব কথা। একটা অস্বস্তি ওর মনকে পাক দিয়ে চলেছে।

ঋতু খাটের উপর বসাল লুনাকে।

ওর চুল ঠিক করতে করতে ঋতু বলল, কেমন আছো বেবী ?

লুনার স্পষ্ট উত্তর, ভাল নেই।

—কেন ? কি হল আবার ?

—তুমি আমাকে বিরক্ত করে তুলেছো।

—পাকা মেয়ে। আমি কি করলাম ?

লুনা দ্রুত গলায় বলল, দাছ বলেছিলেন তুমি বিয়ে করেছো। কেন তুমি বিয়ে করবে ?

ঘরে আকাশ ভেঙে পড়ল।

আট বছরের মেয়ের মুখ থেকে এই ধরনের কথা আশা করা যায় না। যদিও লুনা স্মার্ট মেয়ে, পরিষ্কার ভঙ্গীতে কথা বলে, তবু এখন বুঝতে অস্ববিধা হয় না, মামার বাড়ির লোকেরা আচ্ছন্নত ওর ব্রেনওয়ার্ম করেছে।

ঋতু অসহায় দৃষ্টিতে কুশলের দিকে তাকাল।

লুনা আবার বলল, তুমি চূপ করে কেন আছো মাশা ? বল না, কেন তুমি

বিয়ে করলে ?

—তোমার জন্ম বেবী। সকলের পাপা আছে, তোমার নেই। তাইতো তোমার জন্ম পাপা আনলাম।

—চাই না আমার পাপা।

—ওকথা বলতে নেই। পাপা না থাকলে আমাদের কে আগলে রাখবে ?

অস্থির ভঙ্গীতে লুনা বলল, আমি কোন কথা শুনতে চাই না। মাম্মা, শুধু তুমি থাকবে, আর বেউ নয়।

—গত বছর ভেঙেসনে এসে তুমি একটা কথা বলেছিলে মনে আছে ?

—কোন কথা ?

—তুমি বলেছিলে সকলের পাপা স্কুলে যায়, কত প্রেজেন্টেশন দেয়। তোমার মন খারাপ হয়ে যায় তখন।

—বলেছিলাম। তাতে হয়েছেটা কি ?

—তোমার কথা শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই তো তোমার জন্ম পাপা নিয়ে এলাম। এবার থেকে তোমার স্কুলে যাবেন উনি। কত প্রেজেন্টেশন দেবেন। ভালবাসবেন তোমাকে।

—ভালবাসা আমার চাই না।

—ও ভাবে বলতে নেই।

—আমি বলবো।

—বেবী—

—বকছো কেন আমাকে ? একটা বাজে লোককে আমার পাপা বলতে হবে ? আমি বলবো না—বলবো না—

ঋতুর ধৈর্যচূড়ি ঘটল।

দু হাত দিয়ে কয়েকবার লুনাকে ঝাঁকুনি দিল।

—তুমি ভেবেছোটা কি ? আমার বাড়ির লোকেরা যা বুঝিয়েছে তাই বলবে ? লুনার দু চোখে জল।

—তুমি আমাকে মারলে মাম্মা—

কথা শেষ করেই বিছানার উপড় উপুর হয়ে পড়ল। কান্নায় ভেঙে পড়ল তারপর। অসহায় দৃষ্টিতে ঋতু স্বামীর দিকে তাকাল। এত তাড়াতাড়ি যে এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে একেবারেই বুঝতে পারেনি। জলন্ত বাস্তবকে এখন কি ভাবে পাশ কাটাতে ?

—বেবী, শোন—

কোন উত্তর নেই। একটানা কান্না।

—শোন বলছি—লক্ষ্মী মেয়ে—শোন আমার কথা—

—শুনবো না—

কুশল খাটের কাছে এগিয়ে এসেছে। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। তবু মন বলছে, কিছু একটা করা দরকার। ঋতু ওর একটা হাত চেপে ধরল।

—বেশ, সকলে আমার পিছনে লেগেছে। আমি এখন কি করবো—আমার কিছু ভাল লাগছে না।

কুশল কিছু না বলে দু হাত দিয়ে লুনাকে তুলে নিল। ছটকট করে লাগল—তারপর কুশলের কাঁধে মাথা রেখে একটানা কেঁদে চলল। ওর কান্নায় দুজনের কেউ বাধা দিল না।

কয়েক মিনিট পরে—

কুশল নরম গলায় বলল, আমার দিকে তাকাও বেবী।

--তাকাবে না।

—আমি তোমার পাপা। আমাকে দেখো একবার।

—তুমি বিচ্ছিরি—আমার পাপা চাই না।

—বেশ তো। তুমি যা চাইবে তাই হবে। শুধু একবার আমার দিকে তাকাও।

—বলছি না, আমি তোমাকে দেখবো না।

—এত করে বলার পরও যখন শুনছে না, তখন আর কিছু বলবো না। আমার মত বিচ্ছিরি পাপা তোমার দরকার নেই, এই তো? তুমি তোমার মাম্মার কাছেই থাকো, আমি চলে যাচ্ছি।

কুশল ওকে খাটের উপর বাসিয়ে দিল। আলতো ভাবে চুমু খেল একবার। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ডোরবেল বেজে উঠল এই সময়। দরজা খুলতেই দেখা গেল, বেয়ারা খাবার নিয়ে এসেছে। সেন্টার পিসের উপর প্লেট সাজিয়ে রাখতে লাগল বেয়ারা। কুশল ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

—আর কিছু দরকার হবে ম্যাডাম?

ঋতু শান্ত গলায় বলল, না। দরকার পড়লে তোমাকে ডেকে পাঠাবো।

বেয়ারা বেরিয়ে যাবার মুখেই ঘরে এলেন ঋতুর মা ও বাবা। মন বিষিয়ে উঠল ঋতুর। এরা জ্যাকের মত লেগে রয়েছে। এত কাণ্ডের পরও এদের শিক্ষা হল না, এটাই আশ্চর্যের বিষয়।

—তোমরা কেন এলে?

বাবা বললেন, লুনাকে নিতে এলাম।

—আমি জানতে চাই, লুনাকে কেন তুমি স্থল থেকে পাটনার নিয়ে এলেছো ?

—যা ভাল বুঝেছি, তাই করেছি ।

তীক্ষ্ণ গলায় ঋতু বলল, তা তোমরা করতে পারো না । লুনা আমার মেয়ে ।
তার ভালমন্দ আমি দেখবো ।

বাবা হৃদয় ছাড়লেন ।

—তুমি আমার মেয়ে । আমার কোন্ ভাল কথাটা তুমি শুনেছো । লুনাও
তোমার কোন কথা শুনেবে না । ওকে নষ্ট করার স্বযোগ তোমাকে দেব না । লুনা
আমাদের সঙ্গে যাবে ।

—একটু বাচ। মেয়েকে তার মাব বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে তোমাদের লজ্জা
করেনি ? কি করেছি আমি—কেন তোমরা আমার পিছনে পড়ে আছো ?

—বেলেঙ্কার র আর কিছু বাকি রাখোনি ।

—আমি ভালভাবে বাচতে চেয়েছি, এটাই আমার অপবাধ । মা, তুমি চূপ
করে আছো কেন ? তুমিও কিছু বল ?

মা বললেন, তুমি যা করেছো, লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে ।
মেয়েটাকে আর নষ্ট করে ফেলো না । ওকে আমবাই মালুষ করবো ।

ঋতু ভ্রম হয়ে রহল কয়েক সেকেন্ড ।

পর্যায়ক্রমে মা এবং দাদামশাই-দিদিমার দিকে তাকাচ্ছে লুনা ।

কুশল কোথায় চলে গেল কে জানে ।

ঋতু ভেজা গলায় বলল, আমার মেয়েকে আমিই নষ্ট করে ফেলবো ।

বাবা বললেন, আমাদের তাই বিশ্বাস ।

—লুনাকে নিয়ে যেতে চাও ?

—হ্যাঁ ।

—বেবী, তুমি কি এদের সঙ্গে যেতে চাও ?

লুনা কিছু বলল না ।

ঋতু আবার বলল, তুমি পাপা চাও না, মাম্মাকে নিয়েই-বা তুমি কি করবে ?
তুমি ওদের সঙ্গে যাও বেবী । আমি মনে করবো আমার কোন মেয়ে নেই ।

—আমি যাব না মাম্মা—

লুনা ঝাঁপিয়ে পড়ল ঋতুর উপর ।

—আমি কোথাও যাব না । আমি তোমার কাছে থাকবো ।

ঋতু দু হাত দিয়ে মেয়েকে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে চাইল । চুমুতে
চুমুতে ভরিয়ে তুলল ওর সারা মুখ । তারপর সজল চোখে তাকাল নিজের

ঝামেলা স্টিকারী মা-বাপের দিকে ।

—তোমাদের আর কিছু বলার আছে ?

মেয়েকে অগ্রাহ্য করে নাতনীর দিকে তাকালেন দ্বিধিত সাহেব ।

—লুনা, এসো ভাই । এবার আমরা যাবো—

লুনা বলল, আমি যাবো না ।

—তুমি বলেছিলে, মার সঙ্গে একবার দেখা করে আবার চলে আসবে আমাদের কাছে ।

—তখন বলেছিলাম, এখন বলাছ, আমি যাবো না ।

ঋতু বলল, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই । রাত বাড়ছে । এবার তোমরা যাও ।

মা বললেন, কাজটা ভাল হল না । বাচ্চা মেয়েটা বুঝতে পারছে না । ওর যদি ভাল চাও ওকে বোঝাও ।

—আমি আবার বলছি, তোমরা এবার যাও । ভবিষ্যতে আমার কাছে আর এস না । সমাজে তোমাদের মাথা আরো হেঁট হবে । এস, বেবী—

—কোথায় মাম্মা—

—কোথাও একটা । এস—

লুনাকে নিয়ে ঋতু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ।

এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করেও কুশলকে পাওয়া গেল না । মনে মনে উদ্বিগ্ন হল ঋতু । ও কি রাগ করেছে—দুঃখিত হয়েছে ? আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে ফিরে এল ঘরে । সেন্টার পিসের কাছে এসে, একটা চেয়ারে বসাল লুনাকে ।

—তুমি এবার খেয়ে নাও ।

—তুমি খাবে না মাম্মা ?

—না । এখন নয় ।

—এস না, আমরা দুজন একসঙ্গে খেয়ে নি ।

ঋতু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার হাজবেওকে আগতে দাঁও, তারপর খাবো ।

—তুমি কার কথা বলছো মাম্মা ?

—যিনি তোমাকে আদর করে গেলেন । যাকে তুমি পাপা বলতে রাজী নও ।
উনি আমার হাজবেও বেবী । আমি তোমার মত অবুঝ হতে পারি না তো । ওঁর প্রতি আমার কিছু কর্তব্য আছে । তুমি খেয়ে নাও । উনি এলে তারপর আমি খাবো ।

দুজনের খাবার দেওয়া ছিল। এখন তিনজনের খাবার দরকার। লুনা অস্ত্র-
মনক্ ভাবে সেক্টার পিসের উপর স্ট্রেটে রাখা কোর্গিল্লোর দিকে তাকিয়ে
রইল। ঋতু এগিয়ে গেল কলিং পুল-এর দিকে। কুশল ঘরে এসে এই সময়। ওর
আঙুলের ফাঁকে জলন্ত সিগারেট।

লুনা মুখ তুলল।

ঋতু নরম গলায় বলল, কোথায় ছিলে তুমি ?

কুশল অ্যাসট্রেতে সিগারেট গুঁজে নিয়ে বলল, ম্যানেজারের কাছে
গিয়েছিলাম।

—কেন ?

—একই ঘরে বেবী আমার সঙ্গে থাকতে চাইবে না। একটা ঘরের ব্যবস্থা
করতে গিয়েছিলাম।

—আমার খেয়াল ছিল না। একটা ঘরের দরকার। পেয়েছো ?

—এখনও পাইনি। ম্যানেজার চেষ্টা করছেন। যদি না পাওয়া যায়, অফিসে
চলে যাবো। ওয়েস্টিং হলে রাত কাটাতে অস্ববিধা হবে না।

—ভাল লাগছে না। কিন্তু উপায়ও তো আর কিছু নেই।

ঋতু এগুলো হুইচ বোর্ডের দিকে।

—মাম্মা—

—কিছু বলবে বেবী ?

—কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

—বেয়ারাকে ডাকার ব্যবস্থা করছি। আরো একগ্রন্থ খাবার দিয়ে যাবে।

লুনা মুখ নীচু করল। বলল থেমে থেমে, এতে আমাদের তিনজনের হবে না ?

—বেবী—

উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ল ঋতু।

—আমরা তিনজনে ভাগাভাগি করে খাবো বলছো ?

—হ্যাঁ, মাম্মা। আমি, তুমি আর পাপা—

কথাটা শেষ করেই লুনা সেক্টার পিসের উপর মাথা রাখল।

—সোনা মেয়ে আমার। আবার কান্না কেন ? দেখ, পাপা তোমাকে কিছু
বলছেন।

লুনা একই ভাবে হুঁপিয়ে চলল। অহুশোচনার আবেগে ওর ছোট্ট শরীর
কঁপে কঁপে উঠছে। কুশল হুঁকে পড়ে চুমু খেল। তারপর মুখ তুলে, কদাচিৎ
ওর চোখের জল মুছে দিতে লাগল। সময়ের পাবাণ যে এত ভাড়াভাড়া

যাবে কে ভেবেছিল ! আনন্দে ঋতুরও চোখ ভীজে উঠেছে । মুখে হাসি টেনে কুশল গুণ দিকে তাকাল ।

আজ রামনরেশকে প্রথমে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে । হোটেলের সেকেণ্ড ফ্লোরের বেরান্দা । সরকারী পক্ষের একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী । রামনরেশ বেশ ঘাবড়ে গেছে মনে হয় । এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি সে আগে হয়নি । গীতা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞার পর পরিচয় ইত্যাদি শেষ হল । এবার সরকারী পক্ষ জেরা আরম্ভ করলেন ।

ভর্মা : কতদিন ওখানে তুমি চাকরি করছো ?

নরেশ : আট বছরের উপর ।

ভর্মা : সেকেণ্ড ফ্লোরেই সব সময় তোমার ডিউটি থাকে ?

নরেশ : সব ফ্লোরেই বদলী হতে হয় ।

ভর্মা : সেকেণ্ড ফ্লোরে কতদিন আছো ?

নরেশ : ছ মাসের উপর ।

ভর্মা : আসামীর কাঠগড়ায় যে মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন তাকে তুমি চেনো ?

নরেশ : ই্যা, স্ত্রী । উনি ঋতু মেমলাহাব ।

ভর্মা : ওঁর সঙ্গে তোমার কোথায় পরিচয় হয়েছিল ?

নরেশ : আমাদের হোটেলের ২১৬ নম্বর ঘরে উনি ছিলেন । ঐ ফ্লোরেই আমার ডিউটি থাকে ।

ভর্মা : এই বছরের ১২ই জানুয়ারী হোটলে কোন ঘটনা ঘটেছিল ?

নরেশ : ই্যা, স্ত্রী । লোকেশ ট্যাগুন নামে একজন বোর্ডার খুন হয়েছিলেন ।

ভর্মা : মৃতদেহ প্রহরে কে দেখতে পায় ?

নরেশ : আমি আর ঋতু মেমলাহাব ।

ভর্মা : ব্যাপারটা কি হয়েছিল বল তো ? আমি জানতে চাইছি, তোমরা মৃতদেহ কিভাবে একই সঙ্গে দেখতে গেলে ?

নরেশ : তখন বোধহয় সকাল সাড়ে ছটা । আমি ২১৯ নম্বর ঘরে চা দিয়ে ফিরছিলাম । ঋতু মেমলাহাব ২১০ নম্বর ঘর থেকে বেরলেন । আমাকে চা নিয়ে আগন্তে বললেন নিজের ঘরে ।

ভর্মা : তারপর—

নরেশ : কয়েক মিনিট পরেই আমি চা নিয়ে ২১৬ নম্বর ঘরে গেলাম । আমাকে

পেয়ালায় ঢা ঢালতে বলে মেমসাহাব বাথরুমের দিকে গেলেন—তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন । আমি দৌড়ে গিয়ে দেখলাম বাথরুমে একজন মরে পড়ে আছে ।

ভর্মা : লোকেশ ট্যাগুন ?

নরেশ : হ্যাঁ । পরে জানা গেল ।

ভর্মা : এত সকালে মেমসাহাব ২১০ নম্বর ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন কেন ?

নরেশ : রাত্রে উনি ২১০ নম্বর ঘরেই ছিলেন ।

ভর্মা : তুমি কি ভাবে জানলে ?

নরেশ : আমি ওকে রাত সাড়ে এগারোটার পব, নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে
২১ নম্বর ঘরে যেতে দেখেছি ।

ভর্মা : লোকেশ ট্যাগুনকে তুমি মেমসাহাবের ঘরে যেতে দেখেছিলে ?

নরেশ : হ্যাঁ, স্মার ।

ভর্মা : তখন রাত কটা ?

নরেশ : ঠিক সময় বলতে পারবো না । মনে হয় সওয়া দশটা সাড়ে দশটা হবে ।

ভর্মা : তাহলে মেমসাহাব রাত সাড়ে এগাবোটা পর্যন্ত নিজের ঘরেই ছিলেন । তারপর ২১০ নম্বর ঘরে চলে যান । সেখানেই শাতভোর থাকেন । সকাল ছটার পর আবার ফিরে আসেন নিজের ঘরে । এই কথাই তুমি বলতে চাইছো কি ?

নরেশ : হ্যাঁ, স্মার ।

ভর্মা : ২১০ নম্বর ঘরে কে ছিলেন ?

নরেশ : ব্যানাজী সাহাব ।

ভর্মা : কুশল ব্যানাজী ?

নরেশ : নাম মনে পড়ছিল না । ঐ নাম ।

ভর্মা : রাত সাড়ে এগারোটার পর যখন মেমসাহাব নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যানাজী সাহাবের ঘরে যাচ্ছিলেন তখন উনি নিজের ঘরের দরজায় চাবি লাগিয়ে-ছিলেন ?

নরেশ : চাবি লাগিয়েছিলেন ।

ভর্মা : কি ভাবে বুঝলে ?

নরেশ : আমি দেখলাম, দরজা বন্ধ করে চাবি উনি ভ্যানিটি ব্যাগে রাখলেন । তারপর ব্যানাজী সাহাবের ঘরের দিকে এগলেন ।

ভর্মা : লোকেশ ট্যাগুনকে তুমি জানতে ?

নরেশ : ঠিক ঘরে বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছিল । কিন্তু খোঁজা লোক ছিলেন ।

ভর্মা : লোকেশ ট্যাঙনের সঙ্গে মেমসাহাবের কথাবার্তা হতে দেখেছে ?

নরেশ : একবার দেখেছি ।

ভর্মা : কোথায় ?

নরেশ : সেকেন্ড ফ্লোরের খুল বারান্দায় ।

ভর্মা : তোমার ধারণায়, দুজনের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন ছিল ?

নরেশ : বেশ ভালই ছিল বলে আমার মনে হয় ।

ভর্মা : এবার একটু চিন্তা ভাবনা করে উত্তর দাও । লোকেশকে কে খুন করেছে বলে তোমার মনে হয় ?

নরেশ : পুলিশ তো বলছে ঋতু মেমসাহাবের কাজ ।

ভর্মা : তোমার মত জানতে চাইছি ?

নরেশ : আমি আর কি বলবো স্মার ।

ভর্মা : আমি তোমার মত জানতে চাইছি । উত্তর দাও ?

নরেশ : আমারও তাই মনে হয় ।

ভর্মা : কি মনে হয় তোমার ?

নরেশ : পুলিশ ঠিকই সন্দেহ করেছে । ঋতু মেমসাহাবই দোষী ।

ভর্মা : কেন খুনটা হল বলা তো ?

নরেশ : মেয়েমানুষ নিয়ে নাড়াচাড়া করলে অনেক সময় এরকম হয় ।

ভর্মা : ব্যানার্জী সাহাবের হাত আছে এতে ?

নরেশ : থাকতেও পারে । সঠিক কিছু বলতে পারবো না ।

রণধীর ভর্মা আর কোন প্রশ্ন করলেন না । আসন গ্রহণ করলেন ।

নরেশ আহজা উঠে দাঁড়ালেন । এগিয়ে গেলেন রামনরেশের দিকে ।

আহজা : তোমাদের হোটেল অ্যাটেণ্ডেন্স রেজিস্ট্রার আছে ?

নরেশ : আছে স্মার ।

আহজা : ঐ রেজিস্ট্রার কোন্ কাজে লাগে ?

নরেশ : আমরা যখন ডিউটিতে আসি তখন রেজিস্ট্রারে সই করি ।

আহজা : তার মানে ডিউটিতে এলে সই করতেই হবে ?

নরেশ : হ্যাঁ, স্মার ? সই না করলে গরহাজির করে দেবে । মাইনে কাটা যাবে ।

আহজা : কিছুক্ষণ আগে সরকারী উকীলের প্রপ্নের উত্তরে তুমি যা বলছো তোমার সব মনে আছে তো ?

নরেশ : মনে আছে ।

আহজা : ইগর অনার, হোটেলের কিছু খাতাপত্র একজিবিট হিসাবে আদালতে উপস্থিত করা হয়েছে। অ্যাটেওস রেজিস্ট্রার জেরা করার ব্যাপারে আমার প্রয়োজন পড়বে।

বিচারপতি সম্মতি জানানেন।

নরেন্দ্র আহজার সহকারী পেঙ্কারের ডেস্কের উপর থেকে রেজিস্ট্রার এনে নিজের সিনিয়রের হাতে দিল। আহজা রেজিস্ট্রারের পাতা উন্টে উন্টে কি দেখলেন। তারপর আঙুল দিয়ে একজায়গায় মার্ক রেখে রামনরেশের দিকে তাকালেন।

আহজা : আদালতে দাঁড়িয়ে তুমি এতক্ষণ অনেক মিথ্যা কথা বলেছো ?

নরেশ : আমি কোন মিথ্যা কথা বলিনি।

আহজা : সরকারী উকীলের উচিত ছিল তোমাকে জানিয়ে রাখা, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া বড় রকমের অপরাধ।

রনধীর দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন।

তর্মা : ইগর অনার, আমার মাননীয় বন্ধু, অল্পশিক্ষিত সাক্ষীকে ভয় দেখিয়ে কথা আদায় করবার চেষ্টা করছেন।

আহজা : আকাশে কেমন আমি বানাই না। ইগর অনার, হাতে প্রমাণ না থাকলে কাউকে চ্যালেঞ্জ করা আমার অভ্যাস নয়।

বিচারপতি : প্রসিড।

আহজা : (রামনরেশের দিকে তাকিয়ে) তোমাদের হোটеле একদিনে কটা সিকটে কাজ হয় ?

নরেশ : তিন সিকটে।

আহজা : এক একটা সিকট কখন থেকে কখন ?

নরেশ : সকাল ছটা থেকে বেলা দুটো। বেলা দুটোর পর থেকে রাত দশটা। রাত দশটার পর থেকে আবার সকাল ছটার আগে পর্যন্ত।

আহজা : ১১ই জাহুয়ারী তোমার কখন ডিউটি ছিল ?

নরেশ : সেদিন সকাল ছটা থেকে আমাকে ডিউটি করতে হয়েছিল।

আহজা : বেলা দুটোর সময় তোমার ডিউটি শেষ হয়েছিল ?

নরেশ : ই্যা।

আহজা : সেদিন তোমাকে ডবল ডিউটি করতে হয়েছিল ?

ভীত ভাব নিয়ে রামনরেশ চূপ করে রইল।

আহজা : চূপ করে থেকো না। তোমাকে ডবল ডিউটি করতে হয়েছিল ?

নরেশ : না ।

আহজা : এতক্ষণ পরে তুমি একটা সত্যি কথা বললে । অ্যাটেণ্ডেন্স রেজিস্ট্রার বগছে, সেদিন বেলা দুটোয় ডিউটি শেষ করে, আবার তুমি পরের দিন সকাল ছটার সময় ডিউটিতে যোগ দিয়েছিলে ।

বামনরেশের মুখে অসহায় ভাব ফুটে উঠল । উত্তর দেওয়ার বদলে খাবি খেতে লাগল ।

আহজা : ১১ই জানুয়ারী আর ১২ই জানুয়ারী, এই দুদিনই তোমার সকাল ছটা থেকে ডিউটি ছিল—তুমি সই করেছো । আমি ঠিক বলছি কিনা বলো ?

নরেশ : ঠিক বলছেন ।

আহজা : হোটেলের ম্যানেজার জেরার উত্তরে বসেছেন, জল হাওয়া ধারাপ হওয়ার দরুন ১১ই-১২ই রাত্রে ডিউটি করার জন্য কোন বেরারাকে পাওয়া যায়নি । কথাটা ঠিক ?

নরেশ : হ্যাঁ, সত্যি ।

আহজা : রাত্রে যখন তুমি ডিউটিতে ছিলে না তখন রাত সাড়ে এগারোটার সময় ঋতু মাথুরকে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ২১০ নম্বর ঘরে ঢুকতে কি ভাবে দেখলে ?

নরেশ চুপ করে রইল । অসম্ভব নার্ভাস হয়ে পড়েছে । ঘামের বিন্দু যেন সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে ।

আহজা : চুপ করে থাকলেই দোষ ঢাকা পড়বে না । সেদিন ঋতু মাথুরের এ ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়া কি ভাবে দেখলে ?

নরেশ : আমি—আমি দেখিনি ।

আহজা : ঋতু মাথুর নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে চাবি ত্যানিটি ব্যাগে রেখেছিলেন, কথাটা ঠিক ?

নরেশ : না ।

আহজা : হোটেলের সেকেন্ড ফ্লোরের দক্ষিণের বারান্দায় মেমলাহাবের সঙ্গে লোকেশ ট্যাঙনের কথা হচ্ছিল, তুমি লক্ষ্য করেছিলে ?

নরেশ : আমি কিছু দেখিনি ।

আহজা : ঋতু মেমলাহাবের সঙ্গে তোমার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল ?

নরেশ : না ।

আহজা : তবে কেন লয়কারী উকীলের গ্রন্থের উত্তরে একের পর এক মিথ্যা কথা বলে গেলো ?

রায়নরেশ নীরব রইল

আহুজা : এতগুলো মিথ্যা কথা কেন বললে ? চুপ করে থেকো না । বলো ?

নরেশ : বললে আমি ভাষণ বিপদে পড়বো ।

আহুজা : না বললেও তোমার বিপদ কমবে না ।

নরেশ : আমি আর কিছু বলতে পারবো না স্তার । আমায় মাক করে দিন ।

আহুজা মুহূর্তে বিচারপতির দিকে তাকালেন ।

আহুজা : সাক্ষীকে আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই । ইওর অনার, সরকারী পক্ষের আমার মাজবর বন্ধু, তাঁর নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর ভেঙে পড়া অবস্থা দেখে কি চিন্তা ভাবনা করছেন জ্ঞান না । আমার আদালতকে অত্যাচার, এই মিথ্যাবাদার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হোক । নইলে এই ধরনের সাক্ষীদের প্রভাবে ক্রমে ছায় বিচার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে ।

নরেশ আহুজা আসন গ্রহণ করলেন ।

বিচারপতি গম্ভীর ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন । তাকালেন সরকারী উকালের দিকে ।

বিচারপতি : মিঃ আহুজা যা বললেন, তার তাৎপর্যকে গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই । আপনি ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন । আর কোন সাক্ষী আছে ?

রণধীর ভূম্বা : আর একজনকে আজ উপস্থিত করতে চাই ইওর অনার ।

বিচারপতি : বেশ লাঞ্চার পর আসুন ।

কথা শেষ করেই বিচারপতি উঠে গেলেন ।

বিচারকক্ষের অবস্থা তখন ভাঙা হাটের মত । এই আকর্ষণীয় মামলা শোনার জন্য প্রচুর ভীড় হয় । শুধু সাধারণ মানুষজনরাই নয়, দল বেঁধে আইনজ্ঞরাও আসেন । সকলে বেরিয়ে আসছেন । কুশলের সঙ্গে লুনা এতক্ষণ ছিল । আদালতের কার্যকরণ তাকে অবাক করে দিয়েছে । হোটেলের একা রেখে আসা যায় না । বাধ্য হয়েই তাই লুনাকে সঙ্গে আনতে হয়েছে ।

বাইরে এসে আহুজা ওদের মুখোমুখি হলেন । মুহূর্তেই বললেন, কেমন বুঝছেন মিঃ ব্যানার্জী ?

হাসি মুখে কুশল বলল, ওয়েল প্রেড মিঃ আহুজা । ঠিক সময় আমরা ঠিক লোকের উপর নির্ভর করেছি ।

—ধন্যবাদ । এই বাচ্চাটি—

—আমাদের । হস্টেলে ছিল । কাল এসেছে ।

আহুজা লুনার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, মিসেস মাথুর—

ঋতু দ্রুত গলার বলল, আমার মিসেস ব্যানার্জী বলুন স্ত্রীর ।

—ওহো, তুলেই গিয়েছিলাম । এখন মামলার শুধু মিসেস মাথুর । ওয়েল মিসেস ব্যানার্জী, আপনি চিন্তা করবেন না । যুদ্ধের মোড ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে । চলি এখন—

উনি চলে গেলেন ।

ঋতু বলল, বেবী, তোমার নিশ্চয় খিদে পেয়ে গেছে ?

লুনা বলল, হ্যাঁ, মাম্মা—

—গাড়িতে লাঞ্চ বন্ধ আছে । চল, খাওয়ার পাটটা চুকিয়ে ফেলি ।

ওরা গাড়ির দিকে এগুলো ।

এই সময় ব্রজ বর্গন এসে উপস্থিত হলেন ।

তার মুখে হেঁ হেঁ মার্কী হাসি ।

কুশল বলল, আপনি আজ সাক্ষী দিচ্ছেন নাকি ?

ব্রজবাবু বললেন, সময় পেয়েই তো আসছি । আমাকে এর মধ্যে জড়াবার কি দরকার ছিল ?

—সত্যি কথা বলতে কি আমিও এর মানে বুঝতে পারছি না । ঋতু, ব্রজবাবু তোমার কথচারী, ওঁকে তোমার বিকল্পে সাক্ষী হিমায়ে উপস্থিত করার অর্থ কি ?

—আমিও ঐ কথাই ভাবছি । কি চাল থাকতে পারে এর মধ্যে ?

—আমার কি মনে হয় জানো, পুলিশ সাক্ষীর লিফট ব্রজবাবুর নাম চুকিয়ে দিয়েছিল । নিয়মানুসারে এখন ওঁকে না ডেকে আর উপায় নেই ।

ব্রজবাবু বললেন, ম্যাডাম, যে ভাবে বলবেন, আমি সেই ভাবেই সাক্ষী দেব ।

—আমি কিছু বলবো না—ঋতু বলল, আপনি নির্গোধ নন । যা উচিত কথা, যা সত্যি কথা তাই বলবেন ।

—আপনি ঠিকই বলছেন ।

—আপনার খাওয়া হয়েছে ব্রজবাবু ?

—আজ্ঞে, বাজার থেকে খেয়ে এসেছি ।

—সন্ধ্যার সময় হোটেল আসবেন । কাজকর্মের কথা কিছু হবে । ভাড়াটাড়া আদায় হচ্ছে তো ?

—আজ্ঞে, সব আপটুডেট করে রেখেছি ।

ব্রজবাবু চলে যাবার পর লুনা বলল, মাম্মা, তোমার জেল হয়ে যাবে ?

ঋতু ওকে বলে রেখেছিল, মামারবাড়ির লোকেরা তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে । মামলা করে জেলে পাঠাতে চায় ।

—না, বেবী। উকীল আকাল আমাকে বাঁচাবার জন্য কত চেষ্টা করছেন দেখেছে তে। তাছাড়া তোমার পাপা রয়েছেন, আমাদের তরু কি ?

লুনা কুশলের দিকে ঘেঁষে দাঁড়াল।

বেলা আড়াইটার সময় ঋতুর ডাক পড়ল।

ও গিয়ে দাঁড়াল আসামীর কাঠগড়ায়।

সাক্ষীরূপে ব্রজবাবুকে উপস্থিত করা হয়েছে। প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি শেষ হল।
পরিচয়ের পালাও।

ভরমা : আপনি মাথুর পরিবারে কতদিন কাজ করছেন ?

ব্রজবাবু : বারো বছরের ওপর।

ভরমা : আপনার মালিকিন ঋতু মাথুরকে তো আপনি ভালই চেনেন ? কেমন মহিলা উনি ?

ব্রজবাবু : চমৎকার। কর্মচারীদের ওপর ঠার ব্যবহার দেখার মত।

ভরমা : আমি ঠার স্বভাব চরিত্রের কথা জানতে চাইছি ?

ব্রজবাবু : বড় স্বরের মহিলাদের যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমন।

ভরমা : আপনি প্রেমের উত্তর পরিষ্কার ভাবে দিচ্ছেন না। দেওরদের সঙ্গে ঠার সম্পর্ক কেমন ছিল ?

ব্রজবাবু : ভাল নয়।

ভরমা : ভাল নয় কেন ?

ব্রজবাবু : বিষয়সম্পত্তি নিয়ে সব সময় টান-টান ভাব থাকতো।

ভরমা : লোকেশ ট্যাঙনের সঙ্গে অভিসূক্তার সম্পর্ক কেমন ছিল ?

ব্রজবাবু : আমি যতদূর জানি কোন সম্পর্কই ছিল না।

ভরমা : সম্পর্ক যদি না থাকবে তবে, বিয়ের কথা হচ্ছিল কি ভাবে ?

ব্রজবাবু : একতরফা কথা স্মার। ম্যাডাম কখনই বিয়েতে মত দেননি।

ভরমা : অভিসূক্তার চরিত্র সম্পর্কে ভাল সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, আপনি কি জানেন, কুশল ব্যানার্জীর সঙ্গে হোটেলে উনি রাত কাটিয়েছিলেন ?

ব্রজবাবু : জানি।

ভরমা : এরপরও বলছেন ঠার চরিত্র ভাল ?

ব্রজবাবু : হ্যাঁ, স্মার। এরপরও বলছি। উনি তো কুশল ব্যানার্জীকে বিয়ে করেছেন। কোন রকম কেচ্ছাকেলেকারীকে টেনে নিয়ে যাননি।

ভরমা : এত লোক অভিসূক্তা আর লোকেশকে জড়িয়ে এত কথা বলছে, সব

মিথ্যা ?

ব্রজবাবু : কে কি বলছে আমার জানা নেই। আমি যা জানি তাই আপনাকে বললাম।

ভর্মা : আপনি স্মার্ট হবার অনর্থ চেষ্টা করছেন। আমার প্রশ্নের উত্তর সোজা এবং সরল ভাবে দিন।

ব্রজবাবু : আমি বৃদ্ধ লোক। স্মার্ট হবার চেষ্টা করে আমার লাভ কি ? আমি যা জানি তাই আপনাকে বলছি।

ভর্মা : লোকেশ ট্যাঙনের সঙ্গে অভিযুক্তার মেলামেশা যদি না থেকে থাকে তবে ঐ অসময়ে ঠাঁর ঘরে ট্যাঙন গেলেন কি ভাবে ?

ব্রজবাবু : আমি বলতে পারবো না।

ভর্মা : সম্পর্কহীন কোন পুরুষ কোন মহিলার ঘরে হট করে যেতে পারে ? বিশেষ রাত সাড়ে দশটার পর ?

ব্রজবাবু : যেতে পারে না।

ভর্মা : উনি গিয়েছিলেন। এর কি উত্তর আছে আপনার কাছে ?

ব্রজবাবু : কেন গিয়েছিলেন জানি না। তবে ম্যাডাম ঐ সময় ঘরে ছিলেন না।

ভর্মা : কি ভাবে জানলেন ?

ব্রজবাবু : ম্যাডাম আমাকে বলেছিলেন দশটা আন্দাজ সময় ঘরে গিয়ে দেখা করতে। বেশী মাত্রায় বিয়ার খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। ধাতস্থ হবার পর দেখি দশটা কুড়ি হয়ে গেছে।

ভর্মা : তারপর কি হল ?

ব্রজবাবু : তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখলাম ম্যাডাম ঘরে নেই। সকালে শুনেছিলাম উনি রাজে ব্যানার্জীবাবুর ঘরে ছিলেন।

ভর্মা : আপনি বলতে চাইছেন, রাজে ২১০ নম্বর ঘর থেকে বেরিয়ে অভিযুক্তা একবারও নিজের ঘরে আসেননি ?

ব্রজবাবু : আমি তো তাই মনে করি।

ভর্মা : লোকেশ কি ভাবে মাঝা গেল তবে ?

ব্রজবাবু : ম্যাডাম এ কাজ করতে পারে না।

ভর্মা : কে এই কাজ করেছে ?

ব্রজবাবু : পুলিশ ভাল ভাবে তদন্ত করলেই জানতে পারতো।

রণধীর ভর্মা এবার একটা লেভিজ কমাল তুলে ধরলেন।

ভর্মা : এই কমালটা কার ?

ব্রজবাবু : অজ্ঞাতঃ আমার নয় ।

উপস্থিত সকলেই হেসে উঠলেন । এমন কি বিচারপতির চোঁটের কোনে হাসি দেখা দিল । ক্রুদ্ধ বণধীর ভর্যা একবার সকলের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সাক্ষীমঞ্চের খুব কাছে এগিয়ে গেলেন ।

ভর্যা : টয়্যাকি মারার জায়গা এটা নয় । আমি জানতে চাইছি এই কমাল আপনার পরিচিত কিনা ?

ব্রজবাবু : না ।

ভর্যা : এটা লোডজ কমাল ?

ব্রজবাবু : হ্যাঁ ।

ভর্যা : ভাল করে দেখুন, এই লেডিজ কমাল আপনার ম্যাডামের কিনা ?

ব্রজবাবু : ম্যাডামের কমাল সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই ।

ভর্যা : আপনি মিথ্যা কথা বলছেন । অভিযুক্তকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন আপনি । এই কমাল যত লোকেশ ট্যাগানের হাতে পাওয়া গিয়েছিল ।

ব্রজবাবু : হতে পারে । আমি আগে যা বলেছি, এখনও তাই বলছি, এই কমাল কাব আমি জানি না ।

বণধীর ভর্যা বুঝতে পেরেছিলেন পণ্ডশ্রম করে আর লাভ নেই । এই ধরণের সাক্ষীকে ভাড়া খুব শক্ত । ব্রজ বর্মনের নাম সাক্ষী তালিকায় যুক্ত করার জন্ত মনে মনে পুলিশের মুণ্ডপাত্ত করতে করতে বসে পড়লেন ।

নরেন্দ্র আহুজা উঠে দাঁড়ালেন ।

আহুজা : সরকারী পক্ষের বহুদশী আইনজ্ঞ আমার কিছু পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছেন তাই নয়, ব্রজমোহন বর্মনের মত একজন সাক্ষীকে উপস্থিত করে আমার কিছুটা উপকারই করেছেন । ধন্যবাদ । ইণ্ডর অনার, সাক্ষীকে কোন প্রদ্ব কবরার প্রয়োজনীয়তা আমি বোধ করছি না ।

ব্রজবাবু সাক্ষীমঞ্চ থেকে নেমে এলেন ।

ফেরার পথে লুনা বলল, বর্মন অ্যাকাল তুমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলে না ?

ব্রজবাবু সকৌতুকে বললেন, কখন বল তো ?

—যখন তুমি একটা ঘেরা জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলে । কোশ্চেনের অ্যাক্সার দিচ্ছিলে ।

—ও তখন, একদম ঘাবড়াইনি । বরং কালো কোট পরা লোকটাকে ঘাবড়ে দিয়েছি ।

কথা বলতে বলতে কুশল আর ঋতু কয়েক পা এগিয়েছিল ।

কুশল বলল, কাল আমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

—কালই ?

—মিঃ আহজার সহকারী তো তাই বললেন। আমি একটা কথা ভাবছিলাম।

—কি ভাবছিলে তুমি ?

—কাল কোর্টে লুনাকে আনা চলবে না। কত রকম প্রাঙ্গ উঠতে পারে। ওর কানে ঐ সমস্ত কথা না যাওয়াই ভাল।

ঋতু বলল, ওকে একেবারেই কোর্টে আনা উচিত হয়নি। প্রথমেই আমরা ভুল করেছি।

—ঠিকই বলছো। কাল কি করা যায় ?

—১৬ সি আর এর ব্যবস্থা করে দেওয়া যাক। হোটেলের ও ব্রজবাবুর সঙ্গে সিনেমা দেখবে। সিনেমা দেখতে খুব ভালবাসে।

কুশল সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, মন্দ হবে না।

—বেঞ্চ—

—বলো ?

—বেবীর কাণ্ডকারখানায আমি ভীষণ দমে গিয়েছিলাম। কিন্তু বলতেই হবে, ওর বাহাদুরী আছে। কি ভাবে নিজেকে সামলে নিল বল তো ? এখন তো তোমাকে রীতিমত পছন্দ করছে।

—আমি কিন্তু দমে যায়নি।

—কেন ?

—মা যাকে এত ভালবাসে, মেয়ে আজ নয় ঝাল তাকে ভাল না বেসে থাকতে পারবে না। এ বিশ্বাস আমার ছিল।

—বাবাঃ এত কনফিডেন্স।

কুশল কিছু না বলে হাসলো।

২১শ মে। ১৯৯০ ॥

প্রথমে কুশলকে নয়, বেলা সাড়ে এগারটার সময় সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করা হল, এয়ারপোর্ট রেষ্টুরেণ্টের বেয়ারাকে। যথা নিয়মে মিথ্যা কথা না বলার প্রতিজ্ঞা তাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া হল।

ভর্মা : তোমার নাম ?

সাক্ষী : ওসমান ইলাহি।

ভর্মা : আজ তোমাকে সাক্ষী দিতে এখানে কেন ডাকা হয়েছে জানো ?

ইলাহি : এয়ারলাইন্স হোটেলের একজন খুন হয়েছেন। আমাকে তাই এখানে ডাকা হয়েছে। আল্লাহুর নাম করে বলছি সাব, আমি কিছুই জানি না। এ হোটেলের কাজও করি না।

ভরমা : এত বাবড়াচ্ছ কেন ? খুনের সবকিছু প্রমাণ করা হবে কে বলল ? এখানে তুমি সেই সব প্রমাণের উত্তর দিবে যা তুমি জানো। সামনের দিকে তাকাও। এ মহিলাকে তুমি চেনো ?

ইলাহি : পূর্ণ দৃষ্টিতে ঋতুর দিকে তাকাল।

ইলাহি : ঠেকে আমি জানি।

ভরমা : ঠুর নাম কি ?

ইলাহি : তা বলতে পারবো না।

ভরমা : জানো বলছো। কি ভাবে এই মহিলার সঙ্গে তোমার জানাজানি হল ?

ইলাহি : উনি অনেক দিন ধরে পাটনা আর কলকাতার মধ্যে যাতায়াত করেন। এয়ারপোর্টে এলেই কফি খেতে আসেন রেস্টুরেন্টে। প্রায়ই দেখি বলেই ঠেকে জানি।

ভরমা : ঠুর সম্পর্কে আর কি জানো ?

ইলাহি : বুঝতে অসম্ভব হত না, উনি ধনী পরিবারের মহিলা।

ভরমা : এই মহিলাকে শেষবার কবে দেখেছো ?

ইলাহি : কয়েক মাস আগে। সেদিন খুব ঝড়জল হচ্ছিল। উনি এসেছিলেন রেস্টুরেন্টে। অনেকক্ষণ ছিলেন।

ভরমা : সেই দুর্ধোগপূর্ণ সন্ধ্যার সব কথা মনে আছে তোমার ?

ইলাহি : মোটামুটি মনে আছে।

ভরমা : আমি তোমার তারিখটা মনে করিয়ে দিচ্ছি, সেদিন ছিল ১১ই জানুয়ারী। অভিযুক্ত একাই রেস্টুরেন্টে এসেছিলেন ?

ইলাহি : সঙ্গে একজন বৃদ্ধা মত লোক ছিল।

ভরমা : তারপর কি হল ?

ইলাহি : বৃদ্ধা লোকটাই এক কাপ কফির অর্ডার দিল। কফি নিয়ে এলাম। বৃদ্ধা লোকটাকে মহিলা কিছু খোঁজ নেবার জন্য পাঠালেন।

ভরমা : মহিলা ওখানে বসে রইলেন ?

ইলাহি : হ্যাঁ, সাব। অন্তরমনস্ক ভাবে উনি কফি খেতে লাগলেন।

ভরমা : কফি শেষ হবার পর উনি চলে গেলেন ?

ইলাহি : না সাব ঠুর টেবিলের দুটো টেবিল পরে দুজন ভদ্রলোক বসে ছিলেন,

মহিলা তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। মনে হল খুব পরিচিত। একজন চলে যাবার পরে, উনি দ্বিতীয়জনকে সঙ্গে নিয়ে কোণের দিকের একটা টেবিলে গিয়ে বসলেন।

ভর্মা : এয়ারলাইন্স হোটেলে লোকেশ ট্যাগুন নামে একজন খুন হয়েছিল। তার নাম তুমি শুনেছিলে ?

ইলাহি : লোকেশবাবুকে আমি চিনি। বিনোদবাবুর শালা। ওঁরা অনেক দিন থেকে যাওয়া-আসা করছেন। ভাল টিপস দিতেন।

ভর্মা : অভিযুক্তা বিনোদবাবুর আত্মীয়। তুমি জানতে ?

ইলাহি : আগে জানতাম না। সেদিনই বুঝতে পারলাম।

ভর্মা : সেদিন সন্ধ্যায় লোকেশবাবু রেস্টুরেণ্টে এসেছিলেন ?

ইলাহি : বিনোদবাবু আর তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে এসেছিলেন।

ভর্মা : তারপর কি হল ?

ইলাহি : সেই বড়ো লোকটা এসে পড়েছিল এই সময়। মহিলা তাকে প্লেন কখন ছাড়বে খোঁজ নিতে বললেন। তারপর নিজেও বেরিয়ে গেলেন।

রণধীর ভর্মা বিচারপতির দিকে তাকিয়ে বললেন, ইন্ডর অনার, ডিক্লেসার অভিজ্ঞ ব্যবহারজীবী এই গুরুত্বহীন সাক্ষীকে মামলার সঙ্গে যুক্ত করার অহুয়োধ কেন জানিয়েছিলেন বোঝা দুস্কর। আদালতের সময় নষ্ট ছাড়া নিট ফল আর কিছু পাওয়া গেলো না। এই সাক্ষীকে আমার কোন প্রশ্ন নেই।

ভর্মা বসে পড়তেই আহজা উঠে দাঁড়ালেন।

আহজা : ইন্ডর অনার, কোন সাক্ষী গুরুত্বপূর্ণ আর কে নয়, অনেকের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। সাক্ষী ওসমান ইলাহিকে আমি দুটো মাত্র প্রশ্ন করবো। সঠিক উত্তর যদি পাওয়া যায়, তবে বুঝতে অসুবিধা হবে না, মামলার একটা দিক কত পরিষ্কার হয়ে গেলো।

আহজা ওসমান ইলাহির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আহজা : ওসমান, সেদিন সন্ধ্যায় অস্ত্রাস্ত্রদের সঙ্গে লোকেশ ট্যাগুন যখন এই মহিলার কাছে এসেছিলেন তখন তুমি কোথায় ছিলে ?

ইলাহি : আমি ওখানেই ছিলাম সাব। বিল নিয়ে গিয়েছিলাম।

আহজা : এবার ভেবে উত্তর দাও। লোকেশ ট্যাগুনের সঙ্গে মহিলার কোন কথা হয়েছিল ? কথা হলে থাকলেও কে কি বলেছিলেন, তোমার মনে আছে ?

ইলাহি : মনে আছে সাব। সে সাব চলে গিয়েছিলেন, তার সম্পর্কে লোকেশবাবু কিছু বলতেই মেমলাহাব রেগে গিয়েছিলেন। জোর গলায় বলে-

ছিলেন, ভবিষ্যতে তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে যেন মাথা না গলানো হয় ।

আছজা : ধন্যবাদ ।

সাক্ষী হিসাবে কুশলেন ডাক পড়ল লাক্শের পর । লুনাকে আনা হয়নি ।
ব্রজবাবুর সঙ্গে সে ভি সি আর এ “বর্ণক্সি” দেখছে । আজকের দৃষ্টি বাস্তবিকই
বৈচিত্র্যে ভরা । আসাম’র কাঠগড়ায় ঋতু আর সাক্ষীমঞ্চে কুশল । প্রাথমিক
ব্যাপার ইত্যাদির পর জেরা আরম্ভ হল ।

ভর্মা : অভিযুক্তকে আপনি চেনেন ?

কুশল : খুব ভাল ভাবে । উন আমার স্বা ।

ভর্মা : কবে বিয়ে হয়েছে আপনাদের ?

কুশল : এই বছরের ২৩শে জানুয়ারী ।

ভর্মা : অভিযুক্তা মাথুর পরিবারের বিধবা বধু ছিলেন । হঠাৎ ওকে বিয়ে
করে বসলেন কেন ?

কুশল : আপনি আমাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এত নাড়াচাড়া করছেন কেন
বুঝতে পারছি না । ইওব অনার আমি কি এ প্রশ্নে উত্তর দিতে বাধ্য ?

বিচারপতি : এই মামলার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কোন প্রমাণ না করাই ভাল ।

ভর্মা : ইওব অনার, যাকে ব্যক্তিগত প্রমাণ বলা হচ্ছে, এই মামলায় তার
প্রয়োজন আছে । লোকেশ হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে নারীষটিত ব্যাপার ছাড়া আর
কিছুই নেই । ওয়েল মিঃ ব্যানার্জী, একজন বিধবা মহিলাকে হঠাৎ বিয়ে করে
বসলেন কেন ?

কুশল : বিয়ে আমাদের বহু বছর আগেই হতে পাবতে । সামাজিক বাধা
আর অর্থনৈতিক কারণে সম্ভব হয়নি । এখন আর কোন বাধা ছিল না, তাই
আমরা বিয়ে করলাম ।

ভর্মা : বাধা ছিল না কি রকম ? লোকেশ ট্যাগুন তো আপনাদের দুজনের
মধ্যে চাইনিজ ওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল ।

কুশল : লোকেশ ট্যাগুনকে আমি চিনতাম না । জীবন্ত লোকেশ ট্যাগুনকে
চাক্ষুষ করার নাম মাত্র স্বযোগও আমার হয়েছিল । এমন একজন ব্যক্তি আমাদের
দুজনের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন কেন ?

ভর্মা : বাস্তব ঘটনা তাই । লোকেশ এবং অভিযুক্তার বিয়ে পাকা হয়ে
গিয়েছিল । হঠাৎ আপনি এসে পড়ায় পুরনো প্রেম চাগাড় দিয়ে উঠল ।
অভিযুক্তা আপনার দিকে অসম্ভব ঝুঁকে পড়লেন ।

কুশল : বাস্তবে তা ঘটেনি ।

ভর্মা : বাস্তবে কি ঘটেনি ?

কুশল : ঋতুর সঙ্গে লোকেশ ট্যাঙনের কোন সম্পর্কই ছিল না। সে তাঁকে কখনই বিয়ে করতে চায়নি। কয়েকজন আত্মীয়স্বজনের এই রকম ইচ্ছে ছিল।

ভর্মা : আপনাকে যা বোঝানো হয়েছে, আপনি তাই বুঝেছেন। লোকেশ যদি বাধা না হবে, তবে সে খুন হল কেন ?

কুশল : খুনের সঙ্গে ঋতুর কোন সম্পর্ক নেই।

ভর্মা : আপনি বলতে চাইছেন, পুলিশ অকারণেই অভিযুক্তার বিরুদ্ধে কেস সাজিয়েছে।

কুশল : পুলিশ অতীতে অজস্র কেস সাজিয়ে আদানতে উপস্থিত করেছে। তার অধিকাংশই বা তদন্ত হয়ে গেছে আপনার অজানা নয়।

ভর্মা : সাক্ষর দায়বদ্ধ ছাড়িয়ে এ গয়ে আসছেন আপনি।

কুশল : একেবারেই নয়। আপনি আমার কথাটা ভাল অর্থ করছেন মিঃ প্রসি কউটার।

ভর্মা : ওয়েল, এবার আমবা ১১ই জাগুয়ার'তে ফিরে যেতে পারি। এয়ার-লাইন্স হোটেলের ৮তম নম্বর ঘরে সেদিন আপনি ছিলেন ?

কুশল : দুশো দশ নম্বর ঘরে।

ভর্মা : অভিযুক্তাকে দুশো ষোল নম্বর ঘর দেওয়া হয়েছিল। উনি নজের ঘরে না গেলে, আপনার ঘরে রাতের আশ্রয় নিলেন কেন ?

কুশল : এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। বার বছর পরে আমাদের দুজনের দেখা হয়েছিল। অনেক কথা ছিল। ভবিষ্যৎ জীবনের কপরেখার চাবিকাঠি আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম। এরপর ঋতুর আর নিজের ঘরে ফিরে যাবার ইচ্ছে হয়নি।

ভর্মা : একজন বিধবা মহিলা এবং একজন অবিবাহিত পুরুষের এই ভাবে রাত কাটানো কি উচিত কাজ হয়েছিল ?

কুশল : ক্ষমা করবেন। এই প্রশ্নে উত্তর আমি দেব না।

ভর্মা কিছু বলার আগেই আহুজা উঠে দাঁড়ালেন।

আহুজা : অনধিকার চর্চা করার একটা সীমা থাকে উচিত। সরকারীপক্ষের মাননীয় প্রতিনিধি মামলাকে তাকে তুলে রেখে, পরের চরিত্রের খুঁত খোঁজার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, স্ত্রায় হাতের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে এর কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। ইগর অনার, এই ধরনের প্রশ্নে আমার গুরুতর আপত্তি আছে, আপনাকে জানিয়ে রাখা সমীচীন মনে করলাম।

বিচাপরপতি : আপত্তির যথার্থতা আমি স্বীকার করি। মিঃ ভর্মা, প্রশ্ন যাতে মামলার সীমা ছাড়িয়ে না যায় লক্ষ্য রাখবেন।

ভর্মা : এই মামলা এমন এক মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন এসে পড়তেই পারে। যা হোক। মিঃ ব্যানার্জী, অভিযুক্তা কটার সময় আপনার ঘরে এসেছিলেন ?

কুশল : রাত তখন সাড়ে দশটার কিছু বেশী হবে।

ভর্মা : উনি আপনার ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন কখন ?

কুশল : সকালবেলা।

ভর্মা : আপনি তখন জেগে ছিলেন ?

কুশল : না।

ভর্মা : কি ভাবে বুঝলেন, উনি সকালে বেরিয়েছিলেন ?

কুশল : আমি জানি সকালেই ঋতু ঘর থেকে বেরিয়েছিল।

ভর্মা : আপনি নিজেই বলেছেন, ঘুমচ্ছিলেন। কি ভাবে বুঝলেন, উনি মাঝ রাত্রে নয়, সকালে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন ?

কুশল : আমরা সাড়ে তিনটে পর্যন্ত জেগে ছিলাম।

ভর্মা : রাত সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত জেগে ছিলেন ? কোন মহৎ কর্মে ব্যস্ত ছিলেন না কড়িকাঠ গুনছিলেন ?

কুশল : আমরা মনস্তাত্ত্বিক চাপে ছিলাম আগেই বলেছি। অজস্র কথা ছিল। আবেগের ব্যাপারটাও চেপে রাখা যায়নি। কোন দিক দিয়ে যে এত সময় কেটে গেছে বুঝতে পারিনি আমরা।

ভর্মা : আপনি যে সত্যি কথা বলছেন তার প্রমাণ কি ?

কুশল : আমি মিথ্যা কথা বলছি তা কি আপনি প্রমাণ করতে পারবেন ?

ভর্মা : পান্টা প্রশ্ন করবেন না। আমার কথার উত্তর দিন ?

কুশল : আমি যা বলেছি, বাস্তবে তাই ঘটেছিল।

ভর্মা : আপনার কথা মেনে নিলেও ঘটনার বাস্তবতা কিন্তু একই রকম থেকে যাচ্ছে। অভিযুক্তার ঘরে লোকেশ ট্যাগুন গেলেন কি ভাবে ? তাঁকে চোকার স্বযোগ করে দেওয়া হয়েছিল তাই তিনি ঘরের মধ্যে যেতে পেরেছিলেন। এই স্বযোগ একমাত্র অভিযুক্তাই দিতে পারেন।

কুশল : ঋতু নিজের ঘরে চাবি লাগায়নি।

ভর্মা : ঘরে-দায়ী জিনিসপত্র ছিল। মহিলা চাবি বন্ধ না করেই আপনার ঘরে চলে গিয়েছিলেন ?

কুশল : ঘরে কোন দামী জিনিস বা টাকাপয়সা ছিল না। একটা অ্যাটাচি কেশ খান কয়েক জামাকাপড় আর প্রসাধনের জিনিস ছিল। তাছাড়া দামী হোটেলে চাবি দিয়ে দরজা দিয়ে দরজা বন্ধ করে রাখা কোন ফ্যাক্টর নয়।

ভর্মা : অভিযুক্তা ধনী মহিলা। প্রচুর টাকা সঙ্গে থাকারই কথা। টাকার বাঙিল নিয়েই উনি আপনার ঘরে গিয়েছিলেন ?

কুশল : না। টাকাপয়সা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সমস্ত ওর কর্মচারী ব্রজমোহন বর্মেনের হাতে ছিল। বড় ঘরের এটাই রেওয়াজ।

ভর্মা : লোকেশ ট্যাঙন তাহলে দরজা খোলা পেয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছিল ?

কুশল : হ্যাঁ।

ভর্মা : ঐ অসময় একজন মহিলার ঘরে লোকেশ গেল কেন ?

কুশল : আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

ভর্মা : আপনি সত্যের অনলাপ করছেন। অভিযুক্তা তখন ঐ ঘরে ছিলেন। পরের ঘরে এসে কাকর পক্ষে লোকেশকে খুন করা সম্ভব নয়। আমার যুক্তিতে জোর আছে কিনা বলুন ?

কুশল : যে কোন যুক্তি যে কেউ খাড়া করতে পারে। আমি বলেছি ঋতু সারারাত আমার ঘরে ছিল। তাছাড়া তার মত মহিলার পক্ষে কাউকে খুন করে বাথরুমে টেনে নিয়ে যাওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়।

ভর্মা : অভিযুক্তার একজন সহকারী কি থাকা সম্ভব নয় ?

কুশল : এক্ষেত্রে নয়। পুলিশ চার্জসিটে দ্বিতীয় কোন নাম উল্লেখ করেনি।

ভর্মা ভেবে দেখলেন, শিক্ষিত এই সাক্ষীকে আর ঘাঁটালে তাঁর পক্ষেই অস্ববিধা দেখা দিতে পারে। তিনি আর জেরার জের না টেনে বসে পড়লেন। নরেন্দ্র আহুজা উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন কুশলের দিকে।

আহুজা : মিঃ ব্যানার্জী, আপনি বলেছেন, রাত সাড়ে দশটার সময় আপনার ঘরে অভিযুক্তা গিয়েছিলেন। আপনি এও বলেছেন, সারারাত দুজনে একই ঘরে ছিলেন। একবারও বাইরে বেরোননি।

কুশল : হ্যাঁ। আমি তাই বলেছি।

আহুজা : সেবাবে আপনার ঘরের দুজনের কিছু প্রয়োজন হয়েছিল ?

কুশল : প্রয়োজন ? মানে—

আহুজা : আমি জানতে চাইছি, এমন কিছুর দরকার পড়েছিল কি, যা আপনার ঘরে ছিল না ?

কুশল : ও, হ্যাঁ গরম জলের দরকার পড়েছিল।

আহুজা : কেন ?

কুশল : ঋতু মুখ ধুয়ে ফেলে উইন্টার কেয়ার লোশান লাগাতে চাইছিল ।

আহুজা : জল পেয়েছিলেন ?

কুশল : হ্যাঁ ।

আহুজা : কি ভাবে পেলেন ?

কুশল : আমি বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকেছিলাম । কিন্তু কয়েকবার বেল বাজাবার পরও বেয়ারা আসেনি । তখন—

আহুজা : এক মিনিট । তখন রাত কটা ?

কুশল : রাত প্রায় এগারটা ।

আহুজা : তারপর কি হল ?

কুশল : তখন আমি কম সার্ভিসকে ফোন করলাম । ওখান থেকে একজন এসে জল দিয়ে গেল ।

আহুজা : বটা বেজে ছল তখন ?

কুশল : সাড়ে এগারটা বেজে গিয়ে ছল ।

আহুজা : ধন্যবাদ । আমি ফোন প্রসন্ন নেই ।

ঋতু আমায় পাঠ গড়া থেকে নেমে এল । কুশল ওকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে এসে বসল । দুজনে চলে চলল হোটেলের দিকে । ঋতুকে এখন বেশ মনমরা দেখাচ্ছে । কুশল বহু বয়সে গিয়েও বলল না ।

—বেঞ্জ—

—বলো ?

—আমায় তুমি ক্ষমা করো । আমার জন্মই তোমার এই হিউমিলেশন । সরকারী উকাল তোমাকে ছোট কববাবাক রকম চেষ্টা করছিল বল তো ?

কুশল মুখে হাসি টেনে বলল, এই কারণেই তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে ? কিন্তু একবারও ভেবে দেখেছো, অকারণে তুমি কত হিউমিলেট হচ্ছ ? গ্রাহ্যের ক্ষেত্রে পড়েছি আমরা । এই ধরনের অডল-এর মুখোমুখি হতে তো হবেই ।

—আমি কি যে করবো ? কিছু ভাল লাগছে না ।

—আমার একটা কথা শুনবে ?

—তুমি কি জান না, তোমার যে কোন কথা শোনার জন্য আমি তৈরী হয়ে আছি ।

—ঠিকই তো । আমি বলছিলাম, সমস্ত কিছু একপাশে সরিয়ে রেখে, প্রাণ খুলে হাসো । সেই হাসির জোয়ারে বেবি আর আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাও ।

ঋতু হেসে ফেলল।

—বেজ, তুমি সিরিয়াস হতে পারো না, না ?

—অকারণে তো নয়ই। হাসি উচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে দিন কাটিয়ে দেবার নামই হল জীবন। আমি অন্ততঃ তাই মনে করি মাই ডিয়ার।

কথা শেষ করেই কুশল মোড় ঘোরার জন্য স্ট্রিয়ারিংএ মোচড় দিল।

সাক্ষী নেবার আজই শেষ দিন।

প্রথমে যে চিকিৎসক লোকেশ ট্যাণ্ডনকে পোস্টমর্টম করেছিলেন তিনি এবং পরে কেস তদন্তকারী পুলিশ অফিসার পরিহার। ডাক্তারকে জেরা করতে উঠলেন রণধীর ভর্মা। মারকিউরিক ক্লোরাইডের গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। মৃত্যু কত দ্রুত হওয়া সম্ভব সে সম্পর্কেও মত নিলেন। তারপর তিনি আসন গ্রহণ করলেন। নয়েড্র আহুজা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না।

অর্থাৎ দশ মিনিটের মধ্যে ডাক্তারের সাক্ষী শেষ হল।

এবার সাক্ষীমঞ্চে এসে দাঁড়ালেন পরিহার। পুরো ইউনিফর্মে এসেছেন তিনি। আদালতের অভিজ্ঞতা তাঁর ভালই। অতীতে বহু মামলার সাক্ষী তাঁকে দিতে হয়েছে। কাজেই ঘাবড়ে যাবার মনোভাব তাঁর মধ্যে তিলমাত্র নেই। প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি শেষ হবার পর রণধীর ভর্মা উঠে দাঁড়ালেন।

ভর্মা : ১১ ও ১২ জানুয়ারী রাতে এয়ারলাইন্স হোটেলে যে মার্ডার হয়েছিল তার তদন্ত আপনি করেছিলেন। অভিসূক্তা ঋতু মাথুরই যে হত্যাকারী এ সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত ?

পরিহার : আমি নিশ্চিত।

ভর্মা : কি ভাবে নিশ্চিত হলেন ?

পরিহার : কেস তেমন জটিল ছিল না। প্রাথমিক তদন্তেই বুঝতে পেরেছিলাম কালপিটকে। এই কেস ট্র্যান্সলার লাভ অ্যাফিয়ার্সের পরিণতি।

ভর্মা : খুলে বলুন।

পরিহার : খোজখবর নিয়ে জানা গিয়েছিল, অল্প বয়সে বিধবা হবার পর ঋতু মাথুর ভারী অস্বস্তির মধ্যে জীবন কাটাতে। একদিন ঠর দেওর বিনোদ মাথুরের ঞ্চালক লোকেশ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে পরিচয় হল। তারপর প্রেম। দুজনের বিয়ের তোড়জোড় যখন চলছে তখনই অর্থাৎ ১১ই জানুয়ারী ১৯১০-এ অভিসূক্তার

অবিবাহিত জীবনের প্রেমিক কুশল ব্যানার্জীর সঙ্গে পাটনা এয়ারপোর্টে দেখা ।
মহিলা সঙ্গে সঙ্গে ভোল পাণ্টালেন । হুঁকে পড়লেন ব্যানার্জীর দিকে । ব্যানার্জীর
এতে আপত্তি হল না । কারণ এমন ধনবতী সহচরী চাইলেই পাওয়া যায় না ।

ভর্মা : তারপর কি হয়েছিল ?

পরিহার : লোকেশের বাধা তখন দুজনের কাছে ভারী বিরক্তিকর হয়ে
উঠেছিল । কাজেই তাকে ছুনিয়া থেকে সরে যেতে হল ।

ভর্মা : কি ভাবে খুনটা হয়েছে ?

পরিহার : অভিমুক্তার কাছ থেকে ডাক পেয়ে লোকেশ রাত সাড়ে দশটা
আন্দাজ সময় ২১৬ নম্বর ঘরে গিয়েছিল । নিশ্চিত ভাবে মহিলা তখন তাকে
মাতিয়ে তুলেছিলেন ।

নরেন্দ্র আহুজা উঠে দাঁড়ালেন ।

আহুজা : ইওর অনার, সাক্ষীর এই উক্তি আমার আপত্তি আছে ।

বিচারপতি : অবজেশন সাবস্টেন্সট ।

ভর্মা : কি হল এরপর ?

পরিহার : এই রকম পরিস্থিতিতেই কোন পানীয়ের সঙ্গে মারকিউরিক
ক্লোরাইড মিশিয়ে লোকেশকে খেতে দেওয়া হয়েছিল ।

ভর্মা : লোকেশ মারা গেল । অভিযুক্তা তখন কি করলেন ?

পরিহার : নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ২১০ নম্বর ঘরে চলে গেলেন । ঐ ঘর
কুশল ব্যানার্জীর নামে বুক করা ছিল ।

ভর্মা : আপনি ঋতু মাথুরকে কি ভাবে সন্দেহ করলেন ?

পরিহার : কারণ কয়েকটাই ছিল ।

ভর্মা : এক এক করে সেই কারণগুলো বলবেন কি ?

পরিহার : এক, মোটিভ । দুই, যতদেহ ঐ ঘরে পাওয়া যাওয়া । তিন, যুতের
হাতের মুঠোতে ঋতু মাথুরের কমাল । চার, ওঁর আত্মীয় পরিজনের বয়ান । পাঁচ,
আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরিণতি ।

ভর্মা : এই কেশ সম্পর্কে আপনার আর কিছু বলবার আছে ?

পরিহার : আমি আমার দীর্ঘ চাকরিজীবনে, কোন অভিজাত মহিলাকে
প্রকাশ্যে এই ভাবে কাউকে খুন করতে দেখিনি ।

ভর্মা : ধন্যবাদ ।

রূপধীর ভর্মা নিজের আসন গ্রহণ করলেন ।

নরেন্দ্র আহুজা উঠে দাঁড়ালেন ।

আহুজা : এতক্ষণ আমি আপনার একের পর এক উত্তর শুনে, অবাক হয়ে ভাবছিলাম, পুলিশ বিভাগের কতিপয় কর্মচারী নিজের গা বাঁচিয়ে, বিন্দুমাত্র পরিশ্রম না করে, কর্তব্যনিষ্ঠ হওয়ার অভিনয় করে যান কি ভাবে ?

পরিহার : আপনার কথাগুলো ঠিক বুঝলাম না ।

আহুজা : বুঝতে ঠিকই পেরেছেন, স্বীকার করার মত সংসাহস নেই । যা হোক, আপনি কিছুক্ষণ আগে বলেছেন, প্রাথমিক তদন্ত করেই বুঝতে পেরেছিলেন কালপটিকে । এই কথাই বলেছিলেন কি ?

পরিহার : বলেছিলাম ।

আহুজা : গভীরভাবে তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি ?

পরিহার : না ।

আহুজা : কেন ?

পরিহার : কেস একেবারেই জটিল ছিল না ।

আহুজা : এবার দেখা যাক কেস কত সরল ছিল । অভিযুক্তার সঙ্গে লোকেশ ট্যাঙনের ভালবাসার সম্পর্ক ছিল আপনি বলেছেন । এই রকম সম্পর্ক দুজনের মধ্যে সত্যি ছিল, তার কোন প্রমাণ আপনার হাতে আছে ?

পরিহার : অভিযুক্তার দুই দেওর আমাকে এ সম্পর্কে বলেছিলেন ।

আহুজা : জেরার মুখে ওঁরা স্বীকার করেছেন ব্যাপারটা আদৌ সত্যি নয় । ওঁদের উক্তি আদালতে রেকর্ডেড হয়েছে ।

পরিহার : কেউ মিথ্যা কথা বললে আমি কি করতে পারি ।

আহুজা : বটেই তো । কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কোন খোঁজ থবর গভীর ভাবে না নিয়েই মিথ্যা বা বাজে কথার উপর নির্ভর করে যে কোন কেসে কনক্লুশনে আসতে পারেন আপনি ।

পরিহার : ঠিক তা নয় ।

আহুজা : তবে যা ঠিক তাই বলুন । শোনা কথা নয় । আপনি আদালতকে বলুন, কোন্ প্রমাণের জোরে আপনি নিশ্চিত হলেন, অভিযুক্তা ও লোকেশ ট্যাঙনের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক ছিল ?

পরিহার কিছু বলতে গিয়ে বলতে পারলেন না ।

আহুজা : নীরবতাই বুঝিয়ে দিচ্ছে কোন প্রমাণ আপনার হাতে নেই । আপনি বলেছেন, অভিযুক্তার কাছ থেকে ডাক পেয়ে লোকেশ রাত সাড়ে দশটার সময় ২১৬ নম্বর ঘরে গিয়েছিল । কোন্ প্রমাণের জোরে আপনি এই সিদ্ধান্তে এলেন ?

পরিহার : প্রমাণ ? আমি বলতে চেয়েছিলাম—

আহুজা : এখন অন্য কোন কথা বললে গ্রাহ্য হবে না। অভিযুক্তা যে সত্যি লোকেশকে ভেঙে পাঠিয়েছিলেন, তার প্রমাণ দেখান।

পরিহার : এ সমস্ত ব্যাপার প্রমাণনির্ভর হয় না।

আহুজা : কোন সাক্ষীর নাম করুন, যিনি আপনাকে বলেছিলেন ব্যাপারটা ?

পরিহার : এ সমস্ত ক্ষেত্রে অহুমান করে নেওয়াই যথেষ্ট।

আহুজা : অহুমান। একজনের জীবনমরণ নির্ভর করবে আপনার অহুমানের উপর ? আপনি বলেছেন, কাজ শেষ হবার পর অভিযুক্তা ২১০ নম্বর ঘরে চলে গিয়েছিলেন। কোন সাক্ষী আছে যে দেখেছিল, অভিযুক্তাকে ২১৬ নম্বর থেকে ২১০ নম্বর ঘরে চলে যেতে ?

পরিহার : আছে। হোটেলের সেকেন্ড ফ্লোরের বেয়ারা রামনরেশ দেখেছিল।

আহুজা : না। সে দেখেনি।

পরিহার : সে নিজের স্টেটমেন্টে একথা স্বীকার করেছে।

আহুজা : রামনরেশ মিথ্যা কথা বলেছে। গা ঘামিয়ে তদন্ত করলে আপনাকে এভাবে হাঙ্গামাপদ হতে হত না। হোটেলের রেকর্ডস বলছে, সেদিন ঋণাৎপন্ন জলহাওয়ার দরুন রাড্রে সেকেন্ড ফ্লোরের জন্ত বেয়ারা পাওয়া যায়নি।

পরিহার : কিন্তু রামনরেশ—

আহুজা : কোন বেয়ারাই যখন ডিউটিতে ছিল না তখন কে কোন্ ঘর থেকে বেরিয়ে কোন্ ঘরে গেল তার চাক্ষুষ কোন প্রমাণ নেই।

পরিহার : কি বলবেন স্থির করতে পারলেন না। ঘামতে আরম্ভ করেছেন। এ রকমভাবে বেকায়দায় পড়ে যাবেন ভাবতেও পারেন নি।

আহুজা : এবার বলুন চাক্ষুষ কোন সাক্ষী আছে কি নেই ?

পরিহার : আপনার কথা ঠিক হলে সাক্ষী নেই।

আহুজা : অভিযুক্তাকে আপনার কি রকম মনে হয়—নির্বোধ মহিলা ?

পরিহার : আমি চালাক চতুর বলে মনে করি।

আহুজা : এতক্ষণ পরে একটা ঠিক কথা বললেন। একজন চালাক চতুর মহিলা নিজের ঘরে লোকেশ ট্যাগুনকে খুন করে ফাঁসির দড়ি গলায় জড়িয়ে নিয়ে অন্তের ঘরে গিয়ে রাত কাটাবেন ?

পরিহার : অনেক সময় এরকম হয়।

আহুজা : সেই চালাক চতুর মহিলা, নিজের রুমাল খুঁত ব্যক্তির হাতে রয়েছে যেখেনেও সরিয়ে ফেললেন না ?

পরিহার : হয়তো লক্ষ্য করেনি ।

আহুজা : ঐ রুমাল যে অভিযুক্তার তার প্রমাণ কি ?

পরিহার : রুমাল অভিযুক্তার ছাড়া আর কার হতে পারে ?

আহুজা : আপনি বিনোদ ও প্রমোদ মাথুরের কাছ থেকে জানতে চেয়ে-
ছিলেন, ঐ রুমাল অভিযুক্তার কিনা ?

পরিহার : না ।

আহুজা : অভিযুক্তার কর্মচারী ব্রজ বর্মনের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন ?

পরিহার : না ।

আহুজা : রুমাল সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আপনি অভিযুক্তাকে করেছিলেন ?

পরিহার : না ।

আহুজা : অথচ আপনি স্থিরনিশ্চিত হলেন ঐ রুমাল অভিযুক্তার ! দেখা
যাচ্ছে, আপনার সবই অহুমাননির্ভর ! লোকেশ ট্যাগনের কাঠামো কেমন ছিল ?

পরিহার : লম্বা ধাঁচের শরুপোক্ত চেহারা ছিল ।

আহুজা : অভিযুক্তার দিকে তাকিয়ে দেখুন । ঐ মহিলার পক্ষে একজন
দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান লোককে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখা সম্ভব ?

পরিহার : খুনের ব্যাপারটা হয়তো বাথরুমেই ঘটেছে ।

আহুজা : হয়তো ! আপনি অহুমানের উপর নির্ভর না করে এক পাও বাড়ান
না দেখছি । মিঃ ইন্সপেক্টর, এখানে কিন্তু আপনার অহুমানও খাটছে না ।

পরিহার : আমি আপনার কথা বুঝলাম না ?

আহুজা : কোর্টে আপনার যে ডায়রী সাবমিট হয়েছে, তাতে আপনি
লিখেছেন, যুতদেহ শোবার ঘর থেকে বয়ে নিয়ে গিয়ে বাথরুমে ফেলে রাখা
হয়েছিল ।

পরিহার : নীরব রইলেন ।

আহুজা : চূপ করে থাকবেন না । আমি যা বললাম, সে কথা আপনি
ডায়রীতে লিখেছেন কিনা ?

পরিহার : লিখেছি ।

আহুজা : আপনি বলেছেন, পানীয়র সঙ্গে মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশিয়ে
লোকেশকে খাওয়ানো হয়েছিল ?

পরিহার : হ্যাঁ ।

আহুজা : পানীয় নিশ্চয় কোন গেলাসে ছিল ?

পরিহার : গেলাসে তো ছিলই । নইলে খাবে কি ভাবে ?

আহুজা : কোথায় সেই গেলাস ? একজিবিট হিসাবে কোন গেলাস আপনি আদালতে উপস্থিত করেননি ।

পরিহার : গেলাস পাওয়া যায়নি ।

আহুজা : খুঁজে দেখার চেষ্টাও করেননি । মারকিউরিক ক্লোরাইডের কোন কাচ বা প্লাস্টিকের ফাইল পেয়েছিলেন ?

পরিহার : না ।

আহুজা : আপনি বলেছেন, লোকেশের বাধা তখন দুজনের কাছে ভারী বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল ? বলেছেন একথা ?

পরিহার : বলেছি ।

আহুজা : দুজন বলতে আপনি অভিযুক্তা এবং কুশল ব্যানার্জীকে মিন করেছেন ?

পরিহার : হ্যাঁ ।

আহুজা : আপনার মতে তাহলে, কুশল ব্যানার্জীও এই হত্যাকাণ্ডের একজন অংশীদার ?

পরিহার : অবস্থা সেই রকমই দাঁড়িয়েছিল ।

আহুজা : আপনাকে বাহবা না দিয়ে উপায় নেই ইন্সপেক্টর । কুশল ব্যানার্জী অভিযুক্তার সহযোগী, একথা মেনে নেবাব পরও আপনি তাঁকে গ্রেপ্তার করেননি । কেন ?

পরিহার : গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল ।

আহুজা : উচিত কর্মটা না করার কারণ কি ?

নিজের গাফিলতির সাজা পরিহার পাচ্ছেন ।

অস্থির মন নিয়ে চুপ করে রইলেন ।

আহুজা : বলুন, কেন গ্রেপ্তার করেননি ?

পরিহার : এখন আর কিছু বলা সম্ভব নয় ।

সহকারীর কাছ থেকে ওয়াটারবটল চেয়ে নিয়ে, কয়েক ঢোক জল খেয়ে নিলেন আহুজা । তারপর আবার গিয়ে দাঁড়ালেন ইন্সপেক্টর পরিহারের সামনে ।

আহুজা : মারকিউরিক ক্লোরাইড বস্তুটা কি ?

পরিহার : একধরনের পয়জন ।

আহুজা : আপনি নিশ্চিত ?

পরিহার : আমি এই রকমই শুনেছি ।

আহুজা : আপনি তুল শুনেছেন । আপনার অপদার্থতার আরেকটা নিদর্শন :

মার্কিউরিক ক্লোরাইড এক ধরনের সন্ট। তার সঙ্গে আরো কিছু রাসায়নিক পদার্থ মেশানো থাকে। ডায়রেটিক পয়জন বলা চলে না। অতিমাত্রায় পেটে পেলে অম্ল কথা। এই বস্তু সহজলভ্য? যে কোন ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়?

পরিহার : না। বড় দোকানে পাওয়া যাবে।

আহুজা : পাটনা এয়ারপোর্টের কাছাকাছি কোন বড় ওষুধের দোকান আছে?

পরিহার : না।

আহুজা : কোন ছোট দোকান?

পরিহার : না।

আহুজা : মার্কিউরিক ক্লোরাইড অভ্যুক্তা পেলেন কোথা থেকে?

পরিহার : উনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন।

আহুজা : এতে আপনি কি প্রমাণ করলেন জানেন? কোন কেশ কি ভাবে তদন্ত করতে হয় তার কণামাত্র জ্ঞান আপনার নেই।

পরিহার : আপনি ক্রমান্বয়ে আমাকে ছোট করবার চেষ্টা করছেন।

আহুজা : আপনি প্রকৃত অর্থেই যে মহা অপদার্থ আমি আদালতের সামনে তাই উপস্থিত করার চেষ্টা করছি। সোঁদন অভ্যুক্তা এয়ারপোর্টে কটার সময় এসেছিলেন?

পরিহার : সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ।

আহুজা : আপনি স্বীকার করেছেন তবু প্রশ্ন করছি, এয়ারপোর্টেই কি হঠাৎ দেখা হয়েগিয়েছিল অভ্যুক্তার সঙ্গে কুশল ব্যানার্জীর?

পরিহার : হ্যাঁ।

আহুজা : হত্যার যে মোটিভ আপনি খাড়া করেছেন তা তো আর টিকল না। আপনার কথামত কুশল ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা হবার আগেই মার্কিউরিক ক্লোরাইড নিয়ে অভ্যুক্তা এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। সুতরাং ট্র্যান্সুলার প্রেমের যে ফরমূলা আপনি আদালতের সামনে উপস্থিত করেছেন তা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এবার আমার প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ কি না' দিন।

পরিহার ভারী মূগ্ধমণ হয়ে পড়েছেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই মামলার রায় বের হবার সময় বিচারপতি তাঁকে ছেড়ে কথা বলবেন না।

এতক্ষণ পরে রণধীর ভর্মা উঠে দাঁড়ালেন।

ভর্মা : ইণ্ডর অনার, প্রশ্ন এবং উত্তরের পালা তো শেষ হয়েছে। আবার 'হ্যাঁ' এবং 'না' এই নাটকের অবতারণা করার প্রয়োজন কি?

আহুজা : প্রয়োজন আছে। নাটকের অবতারণা নয়, আমি ড্রপসিন ফেলার

আগে পুলিশ পক্ষের খেয়ালখুশি মত তদন্ত করে, একজন অভিজাত মহিলাকে হ্যারাস করার নকারজনক দৃষ্টান্ত আদালতের সামনে উপস্থিত করতে চাইছি।

বিচারপতি : (সরকারী পক্ষের দিকে তাকিয়ে) অবজেকশন ওভারক্লস।
(আলামী পক্ষের দিকে তাকিয়ে) প্রসিড—

আহুজা : এখন আপনার মনে হচ্ছে কি, লোকেশ ট্যাগনের সঙ্গে অভিযুক্তার ভালবাসার সম্পর্ক ছিল ?

পরিহার : বোধহয় ছিল না।

আহুজা : হত্যার মোটিভ তাহলে প্রেম-ভালবাসা নয় ?

পরিহার : বোধহয় নয়।

আহুজা : উত্তর দেবার সময় ‘বোধহয়’ কথাটা যোগ দিচ্ছেন কেন ? বলুন, সে রাতে অভিযুক্তাকে কোন বেয়ারা এ ঘর থেকে অস্ত্র ঘরে যেতে দেখেছিল ?

পরিহার : না।

আহুজা : মারকিউরিক ক্লোরাইড যে অভিযুক্তা সংগ্রহ করেছিলেন, তার কোন প্রমাণ আছে আপনার কাছে ?

পরিহার : না।

আহুজা : মৃত লোকেশ ট্যাগনের হাতে যে রুমাল পাওয়া গেছে তা ঋতু মাথুরের ?

পরিহার : ইয়া।

আহুজা : রুমাল যে ঋতু মাথুরের তা প্রমাণিত হয়েছে ?

পরিহার : না।

আহুজা : তদন্ত করার নামে আপনি ছেলেখেলা করেছেন তা স্বীকার করেন ?

পরিহার কিছু বলার আগেই রণধীর ভর্মা উঠে দাঁড়ালেন।

ভর্মা : আমার বিজ্ঞ সহযোগী প্রস্নের নামে যা আরম্ভ করেছেন তাও তো ছেলেখেলায় পর্যায়ের পড়ে। ইন্ডর অনার, একজন পুলিশ অফিসারকে হেয় প্রতিপন্ন করার এ এক চতুর অপচেষ্টা বলে আমি মনে করি।

বিচারপতি কিছু না বলে মুছ হাসলেন।

আহুজা : সরকারী পক্ষের মনোমত প্রস্ন উপস্থিত করতে না পারায় আমি দুঃখিত। এই মামলার চেহারা এখন সম্পূর্ণ বদলে যাওয়ার বন্ধুবর স্ক্রু তা আমি বুঝি। এবার আমি নিজের শেষ প্রস্ন রাখছি। ইন্সপেক্টর এখন আপনি স্বীকার করেন কি, ঋতু মাথুর নয়, লোকেশ ট্যাগনের হত্যাকারী অস্ত্র কেউ ?

পরিহার নীরব রইলেন।

আহুজা : আপনি আমার প্রাণ শুনেছেন । উত্তর দিন ।

পরিহার : আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না ।

নরেন্দ্র আহুজা মুখে হাসি টেনে বিচারপতির দিকে তাকালেন, তারপর পেছিয়ে এসে আসন গ্রহণ করলেন । এখন তাকে কঠিন যুদ্ধের পর জয়ী সেনাপতির মতই দেখাচ্ছে । এরপরই বিচারপতি জানতে চাইলেন, ডিফেন্সের সাক্ষী কাল থেকে উপস্থিত করা সম্ভব হবে কি না । আহুজা জানালেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন সাক্ষী উপস্থিত করার কোন প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করছেন না ।

আরগুমেন্টের তারিখ পড়ল ।

পরের দিন নয়—২০শে জুন ।

সুপার ফোর্ট নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস ।

দিল্লী ও গুয়াহাটীর মধ্যে চলাচল করে । ঐ টেনেই লুনাকে নিয়ে ঋতু আর কুশল নিউজপাইণ্ডে পৌঁছাচ্ছিল । ওখান থেকে ট্যাক্সিতে চেপে কাশ্মিরাং । লুনার এখনই স্থানে নেই ইচ্ছে ছিল না । অনেক বুঝিয়ে ওকে রাজী করানো হয়েছে । সামনের উইন্ডো' ছুটিতে সর্বশেষে মিলে দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে যাবে দিতে হয়েছে এই নিশ্চয়তাও ।

লুনার গাজেন হিসাবে স্থলে লিখিতভাবে জানিয়েছিল ঋতু এবং লুনার দাদামশাই দিল্লীতে সাহেবের নাম । দিল্লীতে সাহেবের নাম বাদ দিয়ে কুশলের নাম দেওয়া হল । এবং জানিয়ে রাখা হল ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ যেন লুনার সঙ্গে দেখা করতে না পারে ।

এবার ওরা গিরে চলেছে ।

নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেসেরই এয়ারকন্ডিশন করা দু-বার্থ-কুপে কম্পার্টমেন্ট । বেশ কিছুক্ষণ আগে মালদা পার হয়ে গেছে । আপার বার্থে উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমচ্ছে কুশল । এতক্ষণ ঋতু একটা সিনেমা ম্যাগাজিনের পাতা ওন্টাচ্ছিল । রিস্টওয়াচের দিকে একবার তাকাল, চারটে পঁচিশ । বাইরে গা পুড়ে যাওয়া জুন মাসের গরম । এ. সি কামরার মধ্যে থাকার দরুন ভারী সুখকর অনুভব ।

ঋতু ম্যাগাজিন বার্থের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল । কুশল একই ভাবে শুয়ে আছে । মনোরম আবশ্য মনের মধ্যে ছায়া ফেলল । অকল্পনীয় ঘটনা সময় সময় নাটকীয় ভাবেই ঘটে যায় । হতাশার জীবন থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য কুশলই আবার আসবে কে ভেবেছিল ?

ভান হাত দিয়ে ঋতু নাড়া দিল কুশলকে ।

—এই—গ্রেট কুছুকর্ণ উঠে পড় এবার ।

—ঊ—

—ওঠো বলছি । বেলা পড়ে এসেছে ।

কুশল উঠে বসল । তারপর নেমে এল আপার বার্থ থেকে ।

—কি ব্যাপার বল তো ?

মুখে হাসি টেনে ঋতু বলল, আমি জেগে থাকবো, আর তুমি পড়ে পড়ে ঘুমবে । এটা কোথাকার বিচার ?

—উটো চাপ দিচ্ছ ? তুমিই তো আমাকে ঘুমতে পাঠালে ।

—তাই বলে তুমি ঘুমের রেকর্ড করবে ? আর ম্যাগাজিনের পাতা ওন্টাতে, ওন্টাতে শুধু তোমার কথা ভাববো আমি ?

কুশল ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, আমরা দুজনে দুজনকে বড় বেশী ভালবেলে ফেলেছি । সবেরই একটা অন্ত থাকে জান তো ?

ঋতু ওর নুকে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে চাইল ।

—বেঞ্জ—

—বল ?

—তোমার কি মনে হয় না, আমাদের এই সম্পর্কের গভীরতা অনন্তের সীমা-
রেখাকে তচনচ করে এগিয়ে যাবে ।

—তুমি হয়তো ঠিকই বলছো ।

—মাঝে মাঝে তবুও কেমন ভয় ভয় করে ।

—কেন ?

—যদি আমার দীর্ঘমেয়াদী জেল হয়ে যায় ? আমি তো তোমার কাছ
থেকে অনেক দূরে চলে যাবো । তখন—

—তা হবে না ।

কুশল ঋতুকে নিয়ে বার্থের উপর বসলো ।

—তোমার নিজেরই বোঝা উচিত, জেল তোমার হবে না । মিঃ আইজা
কিভাবে সাক্ষীদের ভেঙেছেন আমরা দেখেছি । তারপরও যদি কিছু হয়, হাই-
কোর্ট রয়েছে ।

—আমার জেল হলে তুমি খুব ভেঙে পড়বে তাই না ?

—না, ঋতু । আমি বরং আরেকটা বিয়ে করবো ।

—আরেকটা বিয়ে করবে কেন ?

কুশল ওর মুখে ঠোট বুলিয়ে নিয়ে বলল, আগে বিবাহিত জীবনের তাৎপর্য

বুঝতাম না। তুমি আমাকে রাসের সাগরে চুবিয়ে দিয়েছো। এখন একটা বোঁ না থাকলে আরেকটা বোঁ আমার চাই।

ঋতু ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আমি জেলের গরাদ ভেঙে ঠিক চলে আসবো। তারপর তোমার নতুন বোঁকে বোঁটিয়ে বার করব বাড়ি থেকে। তারপর :তোমাকে—

আমাকে—কি করবে ?

—কি করবো জানি না, তবে একটা কিছু করবো নিশ্চয়।

কথা শেষ করেই ঋতু হেসে ফেলল।

কুশলও হাসিতে যোগ দিল।

দুজনে দুজনকে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বাস্তু রইল। ঝড়ের বেগে নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস এগিয়ে চলেছে। সন্ধ্যা গড়াবার পর কাটিহার পৌঁছবে। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় স্টেশন। কণ্ঠাঙ্কাবে বলা আছে। রাজ্যে খাবার ব্যবস্থা সে কাটিহারে করে দেবে।

অনেকক্ষণ পরে কুশল সিগারেট ধরাল।

—ঋতু কফি খেলে কেমন হয় ?

—মন্দ হয় না।

প্লাস্টিকের কাপে ফ্রাঙ্ক থেকে কফি ঢেলে ঋতু কুশলকে দিল। নিজেও নিল এক কাপ।

—বেঞ্জ, একটা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমাদের পাওয়া উচিত।

—কোন প্রশ্নের ?

—লোকেশ ট্যাগুনকে মারলো কে ?

—আমিও ভেবেছি অনেক। কোন কুলকিনারা পাইনি। তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছি।

—কোন বিষয়ে ?

কুশল কাপ নামিয়ে রেখে বলল, যে ঝামেলায় তুমি জড়িয়ে রয়েছো, তার অজ্ঞ দায়ী তুমি স্বয়ং।

—কি ভাবে ?

—সে রাজ্যে তুমি যদি দরজার চাবি লাগিয়ে আমার কাছে চলে আসতে তবে, লোকেশ ট্যাগুন তোমার ঘরে ঢুকতে পেত না। সে অজ্ঞাত কোথাও মারা পড়তো। দোষটা তোমার ঘাড়ে চাপতো না।

—ঠিক বলেছো। কিন্তু—

—এখন বল তো, সেদিন দরজায় চাবি বন্ধ না করেই কেন চলে এসেছিলে ?

ঝতুর মুখে বিচিত্র হাসি খেলে গেল ।

—এর জন্য দায়ী তুমি ।

কুশল অবাক হয়ে বলল, আমি ! কি ভাবে ?

—আমি যখন নিজেকে চেপে রাখতে পারলাম না, লাজলজ্জার মাথা খেয়ে তোমার কাছে যাওয়াই স্থির করলাম তখন দরজায় চাবি লাগাবার কথা মনে পড়েনি । আমার সমস্ত একাগ্রতা তখন শুধু তোমাকে ঘিরে রেখেছিল ।

—তার ফল এখন তুমি ভুগছো ।

—লোকসান যেমন হয়েছে, লাভও তো আমার কম হল না । কিন্তু লোকটা আমার ঘরে কেন গিয়েছিল বল তো ?

—মনে হয়, একান্তে দেখা করে তোমাম মন ভেজাতে গিয়েছিল ।

—তোমার কথা মেনে নলেও একটা প্রস্ন থেকে যাচ্ছে । যখন দেখলে আমি ঘরে নেই তখন তো সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসা উচিত ছিল ।

—খুব ভাল প্রশ্ন । তবে আমার কি মনে হয় জানো ?

—কি মনে হয় তোমার ?

—লোকেশ ট্যাঙন তোমাকে দেখতে না পেয়ে ভেবেছিল, কাছাকাছি কোথাও গেছো । কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘিরে আসবে । সে অপেক্ষা করছিল ।

—এই সময় হত্যাকারী আমার ঘরে গিয়ে ঢোকে ?

—হতে পারে ।

—হতে পারে বললে হবে না । নিশ্চিত হয়ে বল ?

কুশল হেসে ফেলল ।

—পুরো ঘটনাটাই বিচিত্র ধাঁধায় জড়িয়ে রয়েছে । একটা অনুমান করতে পারি । যে কোন ভাবেই হোক, হত্যাকারী জানতে পেরেছিল তুমি ঘরে নেই—লোকেশ একাই রয়েছে ।

—তারপর সে আমার ঘরে গিয়ে লোকেশকে শেষ করল, এই বলতে চাও তো ?

—হ্যাঁ ।

—তার মানে হত্যাকারী শুধু লোকেশকে খুন করতে চায়নি, আমাকেও বিপদে ফেলার স্বযোগ নিয়েছিল ।

—এক ঢিলে চমৎকার ভাবে দুটো পাখী মেরেছে সে ।

—বেশ, লোকটা কে হতে পারে ?

—লোকেশ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে শত্রুতা ছিল এমন একজন কেউ। পুলিশ ভাল : ভাবে তদন্ত করলেই তাকে চেনা যেতো। কিন্তু সে রকম কোন চেষ্টাই হয়নি। আরো একটা ঘোরাল প্রহ্ন এখানে রয়েছে। লোকেশকে মারা হল কি ভাবে ?

ঋতু বিশ্বয়ের স্বরে বলল, কি ভাবে আবার ? মারকিউরিক ক্লোরাইড খাইয়ে।

—সে তো জানা কথা। প্রহ্ন হল, কি ভাবে মারকিউরিক ক্লোরাইড ওকে খাওয়ানো হল ? অস্ত্রের ঘরে গিয়ে কেউ কাউকে চা বা সরবত খেতে দিতে পারে না।

—এমন তো হয়নি, নিজের ঘরেই মারকিউরিক ক্লোরাইড মেশানো কিছু খেয়েছিল লোকেশ, মারা পড়েছে আমার ঘরে এসে ?

ঋতুর হাত চেপে ধরল কুশল।

—ওয়াগারফুল। দারুণ মাথা খেলিয়েছো। তোমার অনুমানই ঠিক। এবার তাহলে দুজনের ওপর সন্দেহ এসে পড়ছে। বিনোদ মাথুর আর প্রমোদ মাথুর।

—তুমি ঠিক বলছো। কোন স্বার্থের ব্যাপার থাকতে পারে। এতক্ষণে আমরা সামাধানের কুলের কাছাকাছি পৌঁছেছি।

কুশল সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, তা বোধহয় নয়। আমার মন আবার বলছে, এখনও আমরা মাঝ গঙ্গায় রয়েছি।

—তোমার মন কিন্তু বাড়াবাড়ি করছে। এখনও আমরা মাঝ গঙ্গায় কেন রয়েছি ?

—লোকেশ ছাড়া আরো একজন নিশ্চিত ভাবে তোমার ঘরে ঢুকেছিল। তা না হলে, ডেডবডি বাথরুমে গেল কি ভাবে ? লোকেশের মৃতিতে রুমাল এল কোথা থেকে ? কোর্টে প্রমাণ করা না গেলেও রুমালটা তো তোমার ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় ছিল ?

—ড্রেসিং টেবিলের ওপর রুমাল আর ভ্যানিটি ব্যাগ ছিল।

—তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ছে কি ? লোকেশ মারা যাবার পর, যে কোন কারণেই হোক হত্যাকারী তার বডি বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখে। তারপর তোমাকে জড়াবার জন্য ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে রুমাল তুলে নিয়ে তার মৃতিতে গুঁজে দেয়।

হতাশ ভঙ্গীতে ঋতু বলল, আমরা যেখানে ছিলাম আবার সেখানেই ফিরে এলাম। একেই বোধহয় পারফেক্ট ক্রাইম বলে ?

—পারফেক্ট ক্রাইম অবশ্য কোটিতে একটা হয়। এই ব্যাপারে ফাঁক একটা আছেই। আমরা ধরতে পারছি না আলাদা কথা। এছাড়া পুলিশের কারবারটা দেখো। আদালতে ইন্সপেক্টর আমাকেও তোমার সহযোগী হিসাবে চিহ্নিত করলো। অথচ আমাকে গ্রেপ্তার করার গরজ দেখায়নি। এই গাছাড়া ভাবের কারণ কি ?

ঋতু গুর কঁধে মাথা রেখে বলল, কারণ যাই হোক তোমাকে যে গ্রেপ্তার করেনি, এটাই আমার সবচেয়ে বড় লাভ।

ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে এসেছিল।

সামনে কাটিহার না অলু কোন স্টেশন ?

আজ আদালতকক্ষে জনসমাগম একটু বেশী। লোকেশ মার্ডার কেস বিশিষ্ট মামলায় পরিণত হয়েছে। দুই পক্ষের আবগুমেন্ট কেমন হবে, তা জানার আগ্রহ অনেকেই। আজকের ভাউ সেই সংকেতই দিচ্ছে।

কাঁটায় কাঁটায় এগারটার সময় বিচারপতি আসন গ্রহণ করলেন।

বিহার সরকার বনাম ঋতু মাথুরেব মামলার সুনানি প্রথমে আরম্ভ হল। বিচারপতি বোধহয় নিজের একাগ্রতা বজায় রাখবার জন্য এই কেসের আরগুমেন্ট প্রথমে শুনে নিতে চান। ডাক পাবার পরই ঋতু আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে প্রথমতঃ মুখ নিয়ে দাঁড়াল। অজস্র জোড়া চোখ তারই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে ভাললেই খারাপ লাগে।

রণধীর ভর্যা উঠে দাঁড়ালেন।

বিচারপতিকে অভিবাদন জানিয়ে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, ইগুর অনার, কেস নম্বর ৭৬/৯০-এর সাক্ষীর প্রকারণ শেষ হয়েছে। বিপক্ষের আমার বিজ্ঞ বন্ধু জানিয়েছেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন সাক্ষী তিনি উপস্থিত করতে চান না। আদালতের আদেশে কাজেই আজ আরগুমেন্টের দিন ধার্য হয়েছে। ইগুর অনার, আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান অভিজাত ঘরের ঐ স্নন্দরী মহিলা একটি হত্যা-কাণ্ডের জন্য দায়ী, আপাতদৃষ্টিতে তা মনে না হলেও, আমি এবার তথ্য সহযোগে প্রমাণ করে দেব, প্রকৃত অর্থই ঐ জঘন্য অপরাধের জন্য তিনিই একমাত্র দায়ী।

ইগুর অনার, আমার মাননীয় বন্ধু তাঁর প্রাথমিক বক্তানে বলেছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি ততক্ষণ দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন না, যতক্ষণ না তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে সিদ্ধ হচ্ছে। আমি তাঁর যুক্তি অস্বীকার করছি না। এবং এই

কথাও আমি স্বীকার করছি, অভিযোগ সঠিক ভাবে প্রমাণিত না হলে অভিযুক্ত সন্দেহের লাভ পেয়ে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু ইগুর অনার, পুলিশ ডায়রী এবং সাক্ষীদের উক্তিতে এটা প্রমাণিত হয়েছে, “সন্দেহের লাভ” পাবার কোন সুযোগই অভিযুক্তা এই মামলায় পেতে পারে না। লোকেশ ট্যাগনের মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি। ডাক্তারের সাক্ষী এবং পোস্টমর্টমের রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, লোকেশকে মারকিউরিক ক্লোরাইড খাওয়ানো হয়েছিল। যদিও এই হত্যাকাণ্ডের সময় অস্ত্র কেউ উপস্থিত ছিল না। কেউ দেখেনি, কি ভাবে ওই তীব্র ভেষজ ভিক্টিমকে খাইয়েছিল হত্যাকারী। তবে স্বার্থ ও পরিস্থিতিগত বিষয়গুলি বিচার করলেই দেখা যাবে, এর জন্ত একমাত্র দায়ী আসামী কাঠগড়ায় দণ্ডায়মানা অভিযুক্তা ঋতু মাতুর। আমার বিনম্র নিবেদন, বাদী পক্ষের সাক্ষীদের প্রথমেই সন্দেহের চোখে না দেখে সমগ্র বিষয়টিকে বিবেচনার আওতায় আনবেন। লক্ষণীয় বিষয় হল, অভিযুক্তা নিজের বয়ানে বলেছেন, লোকেশ ট্যাগনের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা হচ্ছিল। একজন অভিজ্ঞাত এবং ধনবতী বিধবা মহিলার বিয়ের কথা তখনই বাকুর সঙ্গে হওয়া সম্ভব যখন প্রেম-ভালবাসার একটা ব্যাপার না থাকে। মনে রাখতে হবে, এটা নিগোলিয়েসন ম্যারেজের আওতায় পড়ে না। অভিযুক্তা আরো স্বীকার করেছেন, ১১ই-১২ই জানুয়ারী রাতে তিনি কুশল ব্যানাজীর ঘরে ছিলেন। ইগুর অনার, এটা নিশ্চিত ভাবে স্বীকার করে নিতে হবে, মহিলা শুধু ফিকিল মাইগেড নন বেপরোয়া এবং সাহসীও। বড় ঘরের বিধবা বৌ হয়েও তিনি প্রাক্তন প্রেমিককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়েছেন এবং সেই পুরুষের সঙ্গে রাত কাটিয়ে ব্যভিচারকে প্রাঙ্গণ দিতেও কুণ্ঠিত হননি। এই চরিত্রের মহিলা কি ধরনের মনস্তত্ত্বের অধিকার পেয়ে থাকেন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের তা অজানা নয়। এক্ষেত্রে লোকেশ ট্যাগন তখন অভিযুক্তার বোঝাস্বরূপ হয়ে পড়েছিলেন। সেই বোঝাকে নির্মম ভাবে নামিয়ে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন তিনি। বলা বাহুল্য এই পরিকল্পনার সফল রূপ দিতে তার কোন অসুবিধে হয়নি।

এবার আমি অভিযুক্তার বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ প্রমাণ সংগ্রহ করেছি তা আদালতের সামনে উপস্থিত করছি—

১। অ্যালিবাই তৈরী করার জন্ত ১১ই-১২ই জুলাই অভিযুক্তার কুশল ব্যানাজীর ঘরে রাত অতিবাহিত করা।

২। নিজের ঘরের দরজায় ইচ্ছাকৃত ভাবে চাবি বন্ধ না করা। যাতে পরে প্রমাণ হয়, দরজা খোলা পেয়ে লোকেশ ঘরে ঢুকেছিল, হত্যাকারী এই সুযোগের সদ্যব্যবহার করে অভিযুক্তার ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে।

৩। হোটেলের ম্যানেজার বলেছেন, খারাপ জল-হাওয়ার দকন সেকেন্ড ফ্লোরের কোন বেয়ারাকে সে রাত্রে পাওয়া যায়নি। কিন্তু একথা বলেননি, প্রয়োজনে অন্য ফ্লোরের বেয়ারা সেকেন্ড ফ্লোরে সারভিসিং দেবে না বা দেয়নি।

৪। কাজেই সে রাত্রে কোন হোটেল কর্মচারীর পক্ষে অভিযুক্তাকে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে কুশল ব্যানাজীর ঘরে যেতে দেখা অস্বাভাবিক নয়।

৫। সকাল সাড়ে ছটার সময় অভিযুক্তা কুশল ব্যানাজীর ঘর থেকে বেরিয়ে, করিডরেই বেয়ারাকে চা আনার আদেশ দিয়ে নিজের ঘরে চলে যান। কিন্তু স্বাভাবিক পথ না মাড়িয়ে তারপর তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে থাকেন। বেয়ারা আসার পর উনি বাথরুমে যাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। এর একটাই অর্থ, লোকেশের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হবার সময় উনি একজন সাক্ষী চেয়েছিলেন।

৬। পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলার জন্য মৃতদেহ বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখা হয়। এই কাজ একা অভিযুক্তার পক্ষে সম্ভব নয় তা সহজেই অনুমেয়। একজন সহযোগীর প্রয়োজন হয়েছিল। পুলিশেব অসাবধানতার দকনই কুশল ব্যানাজীকে এই মামলায় অভিযুক্তের তালিকায় এনে ফেলা যায়নি।

৭। কোন প্রমাণ নেই, সাক্ষী নেই—সে রাতের সাড়ে তিনটে পর্যন্ত অভিযুক্তা ও কুশল ব্যানাজী প্রেম প্রকরণে ব্যস্ত ছিলেন না, হত্যাকাণ্ডের পর সন্দেহ থেকে বাঁচার এই উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন।

৮। এত সাবধানতার পরও অভিযুক্তার রুমাল লোকেশ ট্যাঙনের হাতে রয়ে গিয়েছিল। ঐ তল্লাটে আর কোন মহিলা ছিলেন না, কাজেই একাজবিট হাওয়া রুমাল অভিযুক্তা ছাড়া আর কার নয়।

৯। আমরা অনুসন্ধান করে জেনেছি, কলকাতার হাওড়া ব্রীজ অ্যাপ্রোচ রোডে “নিরাময়” নামে বিশাল এক দোকানের কত্রী অভিযুক্তা। কাজেই মারকিউরিক ক্লোরাইড সাধারণ মাতৃষের কাছে সহজলভ্য না হলেও অভিযুক্তার কাছে সহজলভ্যই ছিল।

১০। মোটিভ সম্পর্কে আদালত ইতিপূর্বেই ওয়াকিবহাল। তবু আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। ত্রিকোণ প্রেমের পরিণতি এই মর্মস্তুদ ঘটনা। ঋতু মাথুর ময়লা কাপড়ের মতই লোকেশকে ত্যাগ করে কুশল ব্যানাজীর প্রতি আগ্রহশীল হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভয় ছিল, লোকেশ পরে নিশ্চিত ভাবে ঝামেলা করবে। কাজেই তিনি এই ভাবে রাস্তা পরিষ্কার করে নিয়েছেন।

ইওর অনার, পুলিশ যে সমস্ত ধারা অভিযুক্তার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত করেছে, অপরাধের গুরুত্ব অনুভব করলেই তা সঠিক বলেই চিহ্নিত হবে। ধারা ৩০২-এর সঙ্গে ধারা ১২০ বি অত্যন্ত মানানসই। কারণ এই হত্যাকাণ্ড দৈবাৎ ঘটনা নয়, ষড়যন্ত্র করেই লোকেশ ট্যাঙনকে ছুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইওর অনার, অপরাধ প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন না কোন ব্যক্তির সামনে ঘটবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যে সঙ্গীন অপরাধ করতে চলেছে তার প্রধান লক্ষ্য থাকে সকলের চোখ ঝাঁচিয়ে নিজের কাষ সিঁদ্ধ করা। কাজেই এমন কোন আইনগত নির্দেশ নেই যাতে বলা হয়েছে, চাক্ষুষ সাক্ষী না হলে অভিযুক্তাকে দোষী সাব্যস্ত করা চলবে না। স্থানবিশেষে পবিত্রিতিগত প্রমাণই যথেষ্ট। এই মামলার উপযুক্ত পরিস্থিতিগত প্রমাণ অভিযুক্তার দিকে আঙুল নির্দেশ করে রয়েছে। পুলিশের তদন্ত রিপোর্টে বা সাক্ষীদের মুখ থেকে এমন কোন কথাই জানা যায়নি, যাতে প্রমাণিত হয় অস্ত্র কাকর স্বার্থে লোকেশ ট্যাঙন বাধাস্বকপ ছিল। স্বার্থ বলয় সৃষ্টি করে রেখেছে অভিযুক্তা ঋতু মাথুরের চতুর্দিকে। একজন অভিজাত ঘরের শিক্ষিতা মহিলার বিশ্বাস্যকর জঘন্ত কার্যাবলী আইনের দায়রাকে সম্পূর্ণ তচনচ করে দিয়েছে। আদালতের কাছে আমার বিনয় নিবেদন, অভিযুক্তাকে কঠোরতম শাস্তি দিয়ে গ্রাহ্যহিত রক্ষা করা হোক।

রণধার ভর্মা নিজের আরগুমেন্ট শেষ করে আসন গ্রহণ করলেন।

সম্পূর্ণ আদালতক্ষেপে গম্ভীর নারবতা বিরাজ করছে।

আসামী পক্ষের প্রথাত্ত অভিবক্তা কি ভাবে নিজের গুনানি আরম্ভ করেন, নিজের মন্তব্যের পক্ষে কোন, কোন যুক্তিকে তুলে ধরেন এবং কি ভাবেইবা নিজের বক্তব্যের উপর যবনিকা টানেন, তা শোনার জন্য উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ ভাবে উৎসুক।

নরেন্দ্র আলুজা উঠে দাঁড়ালেন।

বিচারপতির দিকে তাকিয়ে আরম্ভ করলেন নিজের বক্তব্য : ইওর অনার, সরকারী পক্ষের আমার বন্ধু যে সমস্ত সাক্ষী উপস্থিত করেছিলেন, তাদের বয়ানকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে, যে পথ ধরে এগুবার চেষ্টা করলেন সত্যি তা বিশ্বাস্যকর। এখানে মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন, ঐ সমস্ত সাক্ষীকে আসামী পক্ষ নয়, সরকারী পক্ষই আদালতে উপস্থিত করেছিলেন। পরিস্থিতিগত প্রমাণের কথা তুলে বাদী পক্ষের মাননীয় অভিবক্তা যে যুক্তির অবতারণা করেছেন তা প্রকৃত অর্থে কতটা যুক্তিযুক্ত সে সম্পর্কেই আমি প্রথমে নিজের বক্তব্য রাখতে চাই। এরপর সাক্ষীদের বয়ান পর্যালোচনা করা আমার দ্বিতীয় দফার বক্তব্য হবে।

ইওর অনার, এভিডেন্স অ্যাক্টের ধারা ৪ অনুসারে পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যকে তখনই মেনে নেওয়া চলে যখন অভিযুক্ত নিশ্চিত ভাবে সন্দেহের বেড়াজালের মধ্যে বন্দী। ১৯১৯ সালের সুপ্রিম কোর্ট জার্নালের ১৩১২ পাতায় উল্লেখ আছে, সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বেচারপতি মৃত্যুর্জা ফাজাল আলী এক মামলার রায় দেবার সময় বলেছিলেন, পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে অভিযুক্তকে তখনই শাস্তি দেওয়া চলে যখন ঐ সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এবং ঐ পরিস্থিতি অভিযুক্তকে নির্দেশ হবার সুযোগ দিচ্ছে না।

ইওর অনার, এই মামলায় পরিস্থিতিগত সাক্ষ্য তেমন জোরাল নয়! এর চেয়েও সঙ্গীন পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট যে গভীর বিবেচনা বোধের পরিচয় দিয়েছেন তার একটি উদাহরণ এখানে আমি তুলে ধরতে চাই। ১৯৮১ সালেব এ. আই. আর. জার্নালের ৭৬৫ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে। শঙ্করলাল দীক্ষিত বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্যের এই মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কয়েকটি সঙ্গীন পরিস্থিতিগত সাক্ষ্য ছিল। যেমন—১। মৃত্যু মহিলার লাশ অভিযুক্তের ঘরে পাওয়া যায়। ২। অভিযুক্ত ঐ বাড়িতে একাই থাকতো। ৩। অভিযুক্তের দুজন পরিচিত বন্ধু দরজার কড়া বারংবার নাড়তে থাকে কিন্তু দরজা খোলা হয়নি। ৪। একজন পরিচিত পাশের বাড়ির ছাদে উঠে দেখে অভিযুক্ত উঠানে শুয়ে আছে। তাকে বলার পরও সে দরজা খুলতে রাজী হয় না। ৫। এরপর কোন রকমে প্রতিবেশীরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখে, মৃতদেহ বাথরুমে পড়ে রয়েছে এবং উঠানে নির্বিকার ভাবে শুয়ে আছে অভিযুক্ত। ৬। বাড়িতে এত লোক ঢুকে পড়ায় এবং এ-ঘর ও-ঘর তল্লাস চালানোর ব্যাপারে অভিযুক্ত কোন বিস্ময় প্রকাশ করেনি। ৭। মৃত্যু যুবতার পাণ্ডি বালিশের নীচে পাওয়া গেল। ঐ বালিশে মাথা রেখেই অভিযুক্ত শুয়ে ছিল। ৮। অভিযুক্তের গুপ্তাঙ্গে এমন সমস্ত চিহ্ন ছিল, বুঝে নিতে অস্ববিধে হয় না যে, তাজা সহবাস হয়েছে।

এই সমস্ত পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে শঙ্করলাল দীক্ষিতের বিরুদ্ধে বলাৎকার এবং হত্যার অভিযোগ আনা হয়। বোম্বে হাইকোর্ট অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারায় সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০২ ধারায় ফাঁসির আদেশ দেন। যদিও শঙ্করলাল আদালতে বলেছিল, সে নির্দোষ। তার মা, ভাই এবং কয়েকজন প্রতিবেশী তাকে এই মামলায় জড়িয়ে দিয়েছে। হাইকোর্টে রায় হবার পর সুপ্রিম কোর্টে আপিল হল। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়, বিচারপতি এ. পি. সেন এবং বিচারপতি বাহকুল ইসলামকে নিয়ে গঠিত এক বেঞ্চে এই মামলায় শুনানি হয়।

ঐ বেঞ্চ গভীর ভাবে নথিপত্র পর্যালোচনা করার পর অভিযুক্ত দিলেন, ঐ সাক্ষীর পরিস্থিতিতে অভিযুক্ত কখনই নিজের বাড়িতে থাকতে পারে না। এছাড়া কেউ অপরাধ করার পর জোরাল প্রমাণ, যতদূর জাঙ্গিয়া নিজের বালিশের তলায় রেখে সেই বালিশে মাথা রেখে ঘুমবে তা কোন মতেই সম্ভব নয়। সুতরাং ঐ দুর্বল পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না। তারা প্রাকারম্ভের একথাই বলেছেন, পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যের উপর অন্ধের মত নির্ভর না করে এমন বিবেচনাবোধের পরিচয় দিতে হবে যাতে ঐ সম্ভাবনা থাকে, ঐ ঘটনার একটা বিকল্প দিকও আছে।

ইওর অনায়ে, ঐ মামলার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যের উপর। অথচ এর চেয়ে চাপকর আর কিছুই হতে পারে না যে, সাক্ষীদের বয়ান সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সরকারী পক্ষের আমার মাননীয় বন্ধু আদালতকে বিভ্রান্ত করার অক্ষম প্রয়াস করেছেন। ঐ মামলার যে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা-ভাবনা না করে, ত্রায়াহিতকে কালো পর্দায় ঢেকে দেবার চেষ্টায় গলদবর্ম হয়েছেন। এবার আমি সরকারী পক্ষের সাক্ষীদের বয়ানের পর্যালোচনা করে বুঝিয়েছি আমার মক্কেল, অভিজাত মহিলা ঋতু মাথুর ত্রায়াবিচার পাবার উপযুক্ত কিনা। এবার আমি সংখ্যা নির্দেশ করে সাক্ষীদের বয়ান বিশ্লেষণ করতে চাই—

১। এয়ারলাইন্স হোটেলের ম্যানেজার বলেছেন, খারাপ জল-হাওয়া থাকার দরুন, ১১ই-১২ই জানুয়ারী রাতে কোন বৈয়াকাকে সেকেণ্ড ফ্লোরে ডিউটি করার জন্ত পাওয়া যায়নি। এছাড়া উনি বলেছেন, ২১৬ নম্বর ঘরে চাবি অভিযুক্তার কাছ থেকে নয়, পেয়েছিলেন ঐ ঘরের ড্রয়িং টেবিলের উপর থেকে।

২। ম্যানেজার আরো বলেছেন, লোকেশ ট্যাগুন তাঁর কাছে আগ্রহ প্রকাশ করলেও, ঋতু মাথুর ট্যাগুন সম্পর্কে ইণ্টারেস্টেড কিনা, এ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না।

৩। বিনোদ মাথুর স্বীকার করেছেন, অভিযুক্তা একজন বুদ্ধিমতী মহিলা। কোন বুদ্ধিমতী মহিলা খুন করে যতদেহ নিজের ঘরে ফেলে রাখবেন না, এ যুক্তি স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

৪। বিনোদ মাথুর আমার যুক্তি মেনে নিয়ে আরো স্বীকার করেছেন, অভিযুক্তা লোকেশকে খুন করেননি।

৫। রাকেশ দীক্ষিত কুশল ব্যানার্জীর ওপর খুনের দায় চাপাবার চেষ্টা করেছেন। অথচ কোন প্রমাণ দেখাতে পারেননি। এমন কি পুলিশের কাছেও

ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাননি।

৬। যুক্তি মেনে নিয়ে আদালতে রাকেশ দীক্ষিত স্বীকার করেছেন ঋতু মাথুর খুন করেননি। কুশল ব্যানার্জীর সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের কোন সম্পর্ক নেই, একথাও তিনি মেনে নিয়েছেন।

৭। অভিযুক্তকে এই মামলা থেকে বাঁচাবার জন্য রাকেশ দীক্ষিত, তাঁর মা-বাবা, দেওর বিনোদ ও প্রমোদ মাথুর কোন চেষ্টাই করেননি।

৮। ওঁরা থাকে একেবারেই পছন্দ করেন না, সেই কুশল ব্যানার্জী অভিযুক্তকে বাঁচাবার সমস্ত রকম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

৯। প্রমোদ মাথুর স্বীকার করেছেন অভিযুক্তার সঙ্গে লোকেশ ট্যাঙনের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই সম্পর্কে পরে যা বলেছেন তা সবই মিথ্যা।

১০। প্রমোদ মাথুর স্বীকার করেছেন, অভিযুক্তা বুদ্ধিমতী মহিলা। স্বতরাং লোকেশকে খুন করে নিজের বাথকমে যতদেহ ফেলে রাখা সম্ভব নয়।

১১। মাথুর একথাও স্বীকার করেছেন, অভিযুক্তা স্বাধীনচেতা মহিলা। কুশল ব্যানার্জীর সঙ্গে বিয়েতে তিনি কাকুর বাধাই মানতেন না। এক্ষেত্রে লোকেশ অভিযুক্তার পথের কাঁটা হওয়া অর্থহীন। এবং তাঁর কোন মোটিভ ছিল না।

১২। মাথুর একথাও স্বীকার করেছেন, দোহারী গডনের লোকেশকে অভিযুক্তার পক্ষে শোবার ঘর থেকে বাথকমে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখা সম্ভব নয়।

১৩। হোটেলের সেকেন্ড ফ্লোরের বেয়ারা রামনরেশ পুলিশ এবং সরকারী পক্ষের একজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী। অথচ সে জেরার মুখে স্বীকার করেছে, সে রাতে সে ডিউটিতে ছিল না। ২১০ নম্বর ঘর থেকে বেরিয়ে ২১৬ নম্বর ঘরে গভীর রাতে অভিযুক্তাকে সে যেতে দেখেনি।

১৪। প্রত্যক্ষদর্শী রেস্টুরেন্টের বেয়ারা ওসমান ইলাহির কথায় জানা গেছে, অভিযুক্তা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতেন লোকেশকে।

১৫। মাথুর পরিবারের পুরনো কর্মচারী ব্রজমোহন বর্মনের কথায় জানা গেছে, অভিযুক্তার সঙ্গে লোকেশের কোন সম্পর্ক ছিল না।

১৬। কুশল ব্যানার্জী স্বীকার করেছেন সে রাতে অভিযুক্তার তাঁর সঙ্গে ২১০ নম্বর ঘরে ছিলেন। ক্রম সাতিসের লোক রাত সাড়ে এগারটার সময় একই ঘরে দেখেছে দুজনকে। অভিযুক্তার ঘরে কোন দামী জিনিসপত্র ছিল না। উনি একথাও বলেছেন, অভিযুক্তার টাকাপয়সা ইত্যাদি ব্রজমোহন বর্মনের কাছে ছিল।

১৭। ইন্সপেক্টর পরিহার স্বীকার করেছেন, এই কেস গভীরভাবে তদন্ত করার

প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেননি।

১৮। অভিযুক্তার সঙ্গে লোকেশ ট্যাঙনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল, এর কোন প্রমাণ ইন্সপেক্টরের হাতে নেই। অভিযুক্তা যে রাত সাড়ে দশটার পর ভিক্ট্রিমকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তার কোন প্রমাণ বা সাক্ষী উনি উপস্থিত করতে পারেননি।

১৯। ইন্সপেক্টরের নির্ভরযোগ্য সাক্ষী আদালতে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছে। হোটেলের অ্যাটেণ্ডেন্স রেজিস্ট্রারও সেই কথাই বলছে।

২০। ইন্সপেক্টার বলেছেন, পানীয়ের সঙ্গে মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল। অথচ উনি একজিবিট হিসাবে সেই গেলাস বা পেয়লা আদালতে উপস্থিত করতে পারেননি।

২১। একজিবিট হওয়া কমাল যে অভিযুক্তার তাও তিনি প্রমাণ করতে পারেননি। এমন কি ঐ কমাল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কাকর কাছ থেকে খোঁজ-খবর নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেননি।

২২। এই হত্যাকাণ্ডে কুশল ব্যানার্জী একজন অংশীদার - একথা ইন্সপেক্টার আদালতে বলেছেন। কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করেননি, তাঁর বিকল্পে কোন চার্জ গঠন করেন নি।

২৩। মারকিউরিক ক্লোরাইড অভিযুক্তা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, ইন্সপেক্টার তা বলতে পারেননি। তাঁর ট্র্যান্সুলার প্রেমের ফর্মুলাটা যে ঠিক নয় তিনি জেরার মুখে তা স্বাকার করেছেন। প্রেম যে এই হত্যার মোটিভ নয় তাও তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে।

২৪। প্রমাণিত হচ্ছে, এই মামলায় ইন্সপেক্টার পরিহানের পুরো তদন্তই অসুস্থমাননির্ভর।

নরেন্দ্র আহুজা এতক্ষণ পরে থামলেন। রুমাল দিয়ে চশমা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন, ঠেঙর অনার, সরকারী পক্ষের বিজ্ঞ অভিযুক্তা যে সমস্ত পয়েন্ট উপস্থিত করেছিলেন তার অসারতা, আমি সাক্ষীদের জেরা পর্যালোচনা করে যে কাউন্টারপয়েন্ট উপস্থিত করেছি তাতে প্রমাণিত হয়েছে। আমি আরগুমেন্ট অকারনে দীর্ঘ করে আদালতের সময় নষ্ট করতে চাই না। প্রয়োজনও নেই। সরকারী পক্ষের সাক্ষীরা জেরার মুখে পড়ে নিজেদের মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে, প্রমাণিত করে দিয়েছে, প্রকৃত অপরাধী আর যেই হোক, অভিযুক্তা স্বত্ব মাথুর নয়। পরিস্থিতিগত যে প্রমাণের কথা সরকারীপক্ষ বলেছিলেন, তার ছিটেকোটা অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন কি কোন সুল প্রমাণও

অভিযুক্তার বিরুদ্ধে উপস্থিত করা গেল না। আমার বিজ্ঞ বন্ধু বলেছেন, অভিযুক্তার কলকাতায় গুপ্তধর দোকান আছে। তাঁর পক্ষে মারকিউরিক ক্লোরাইড সংগ্রহ করা কঠিন ছিল না। ঠিক কথা। তাহলে ত্রিকোণ প্রেমের ফরমূলাটা টিকছে না। কলকাতা থেকে মারকিউরিক ক্লোরাইড নিয়ে আসবার সময় অভিযুক্তার মোটেই জ্ঞান ছিল না, ফেরার পথে দৈবাৎ এয়ারপোর্টে কুশল ব্যানার্জীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যাবে। ইগুর অনার, ছেলেমানুষী কাণ্ডকাণ্ডখানা গুপ্ত নির্ভর করে এই নড়বড়ে মামলাকে খাড়া করে বাখার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। এ পর আছে পুলিশ পক্ষের ব্যর্থতা। এই মামলার আই. ও. যেরকম গাছাড়াভাবে তদন্ত করেছেন তার নজীর পাওয়া দুর্লব। এই ধরনের পুলিশ অধিকারী যে কোন দেশের পক্ষে বোঝাস্বরূপ। উনি জনকয়েক মিথ্যাবাদীকে আদালতে পাঠিয়ে দিয়ে শুধু নতুন অপদার্থটাই প্রমাণ করেননি, এই সঙ্গে একজন অভিজ্ঞ মহিলাকে অপমানিত করার গগননৈহী স্পর্ধার পরিচয় দিয়েছেন। আমার আদালতের কাছে প্রশ্ন, এই দুঃসাহসের অধিকার ইম্পেট্টার পরিহার কোথা থেকে পেলেন? এই মামলার যে একটা বিকল্প দিকও থাকতে পারে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন বোধ করেননি। থাকি উদ্দিপরা ঐ ব্যক্তি যেদিকে দৃষ্টি দিলে আজ মাননীয় ঋতু মাথুরকে অভিযুক্তার কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হত না।

ইগুর অনার, আমার জেরার মুখে একের পর এক সাক্ষী যেভাবে ভেঙে পড়েছে, যেভাবে নিজেদের মিথ্যাচারকে প্রকাশ করে ফেলেছে, তাতে বেনিফিট অফ ডাউটের সমস্ত রকম সুবিধা পাবার একমাত্র অধিকারী অভিযুক্তা ঋতু মাথুর। সুতরাং আদালতের কাছে আমার বিনম্র নিবেদন, অভিযুক্তাকে সম্মানে মুক্তি দিয়ে স্মারিতকে রক্ষা করা হোক।

নরেন্দ্র আহজা আসন গ্রহণ করলেন।

রুদ্ধবাক আদালতগৃহ এতক্ষণ পরে যেন সহজ হবার অবকাশ পেল। অনেকে প্রশংসার দৃষ্টিতে আহজার দিকে তাকাতে লাগলেন। বিচারপতি অবশু বিশেষ সময় নিলেন না। পর্যায়ক্রমে এই মামলার দুই অভিযুক্তার দিকে তাকিয়ে নিয়ে জানিয়ে দিলেন আগামী ৫ই জুলাই তিনি নিজের রায় জানিয়ে দেবেন।

আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য। ঋতুর মন বা মুখের অবস্থা ভাল নয়। অনেক আশার কথা শুনে শোনানো হয়েছে, তবু ভয়ের বেড়া জাল তাকে ঘিরে রয়েছে। কুশল জানে কিছুই হবার নয়। সাক্ষীদের মিথ্যা ধরা পড়ে যাওয়ার পর

এই মামলার দফারদা হয়ে গেছে। তবু অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না।

এগারটার সময় বিচারপতি আসন গ্রহণ করলেন।

লাঞ্ছন পর রাগ হবে এই রকম ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু বিচারপতি এই চমকপ্রদ এবং বহুল প্রচারিত মামলার পরিসমাপ্তি প্রথমেই ঘটাতে চাইলেন। ডাক পাবার পব, হয়তো শেষ বারের মত ঋতু কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। নিস্তরক আদালত গৃহের ঔৎসুক্য তখন চরমে।

অভ্যাসনিক উপচারের পর বিচারপতি তেষটি পাতায় ছড়িয়ে থাকা রাগ গম্ভীর গলায় পড়তে আরম্ভ করলেন। এই কেস যে ঠিক মত সাজানো যায়নি সাক্ষীরা যে কেউ নির্ভরযোগ্য নয়, অভিযুক্তার বিরুদ্ধে মোটিল প্রতিপন্ন নয় ইত্যাদি বিশ্লেষণ করার পর—পুলিসের অকর্মণ্যতা, আদালতে কেস সাজিয়ে পাঠাবার নামে ছেলে-খেলা করা বিন্দু উনি গভীর ক্ষোভ এবং উদ্ভ্রা প্রকাশ করলেন এই পুলিশ কর্মচারী কেন শাস্তিযোগ্য নয় সে প্রশ্ন তুললেন। এবং বললেন, আদালতের মযাদা এবং গ্যারহিতের দিকে দৃষ্টি রেখে, পুলিশ পক্ষকে আরো কর্মতৎপর ও কর্তব্যপরায়ণ হতে হবে। পরিশেষে ঋতু মাথুরের মুক্তির আদেশ দেওয়া হল। এবং বিচাপতি উল্লেখ করতে তুললেন না, অভিজ্ঞাত ঘরের এই মহিলাকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে অস্বস্তি ও আতঙ্কের শেষ সীমায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

রাগ শেষ করেই বিচারপতি উঠে গেলেন।

খুশীর স্রোত বয়ে গেল। মনে হল, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অধিকাংশই এই মহিলার মুক্তি চাইছিলেন। ভীড ঠেলে কুশল এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। নরেন্দ্র আহজা ঋতুর কাছে প্রথমে পৌঁছলেন। তাঁর দিকে একবার তাকিয়েই ঋতু কান্নায় ভেঙে পড়ল। আবরুদ্ধ আবেগ এখন সমস্ত কিছুকে তচনচ করে লাভার স্রোতের মত বেরিয়ে আসছে।

তদন্ত

পাম অ্যাভিনিউ-এর ফ্ল্যাট ছোট বলতে, খুব ছোট নয়। তিনটে ঘর ছাড়া অগ্ন্যস্ত্র সমস্ত সুযোগ-সুবিধে আছে। তবে ঋতুর প্রাক্তন স্বামীর স্বত্রে পাওয়া বাড়ির কাছে কিছুই নয়। ঋতু জানে হাজার বার অহরোধ করলেও কুশল সে বাড়িতে যাবে না। বিয়ের পর তাই সে পাম অ্যাভিনিউ-এর ফ্ল্যাটেই চলে এসেছিল।

রাগ বেরবার পর পাটনাতে ওরা একদিনও অপেক্ষা করেনি। ব্রজবাবুকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা চলে এসেছে। দুজনেই উচ্ছ্বসিত। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার আর কোন বাধা রইল না। ইচ্ছে ছিল কোন হিল স্টেশনে গিয়ে

দিন পনেরো কাটিয়ে আসে। কিন্তু লুনার কথা ভেবে সে ইচ্ছাকে ওরা বাস্তবায়িত করেনি। লুনাকে কথা দেওয়া আছে উইন্টারভেকেশনে শাউথ ইন্ডিয়া বেড়াতে যাবে সকলে।

কুশলের নেওয়া ছুটির কয়েকটা দিন হাতে ছিল। কলকাতায় ফিরে ছুটি নাকচ করে দিয়ে কাজে যোগ দিয়েছে। ঋতু অবশ্য অগ্র কথা বলেছিল। বলেছিল বেশ সঙ্কোচের সঙ্গেই। কুশল নিজের মর্মান্বোধ ছোট করতে চায় না, তাই রাজি হয়নি।

ঋতু বলেছিল, তুমি অফিসে চলে গেলে আমি একলা হয়ে পড়বো। লক্ষ্য দুপুর আমার কাছে বিরাট বোঝার মত হয়ে পড়বে।

কুশল হেসে উত্তর দিয়েছিল, পাঁচদিন ছুটি আমার হাতে আছে। শেখ হলে তো অফিস যেতেই হত। বোঝার মত দুপুরকে ঘাড়ে চাপাতে না দিয়ে, বরং ঐ সময় নিজের কাজকর্ম দেখো।

—তার চেয়ে তুমিই আমার কাজ কর্ম দেখো। দশটা-পাঁচটার অফিস তো নয়। আমরা সব সময় কাছাকাছিই থাকবো।

—আর আমার অফিস—

ঋতু দু হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, তুমি অফিস যাবে না। তোমার চাকরির দরকার নেই।

—তা হয় না মাইডিনার।

—আমি বলছি বেঞ্জ—

—তুমি তো আমার চেনো। এমন কথা কেন বলছো? আমি তোমায় গভীর ভাবে ভালবাসি তোমার অজানা নয়, তবু ভালবাসার বিনিময়ে আমি নিজের মর্মান্বোধ বিকিয়ে দিতে পারি না।

—আমি তোমার স্ত্রী। আমিও তোমায় গভীর ভাবে ভালবাসি বেঞ্জ। আমার যা কিছু সবই তো তোমার।

—ঠিকই বলছো। তবু একটা খোঁচ রয়ে যাচ্ছে।

ঋতু ওর কাছ থেকে সরে এসে বলেছিল, আমি তোমাকে কোন উপহার দিতে পারি?

—নিশ্চয় পারো।

—আমার যা কিছু আছে সবই তোমাকে আমি দিলাম। আর আপত্তি করা চলবে না। তুমি বলেছো, তোমাকে উপহার দেবার অধিকার আমার আছে।

কুশল হেসে ফেলেছিল।

—আসামীর কাঠগড়ায় দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে তোমার একটা উপকার হয়েছে। কথার মারপ্যাচ ভালই আয়ত্ত্ব করেছে। এখন আমার চাকরি করতে দাঁও মাইডিম্বার। জীবন পড়ে আছে। পরে দেখা যাবে।

ও প্রসঙ্গে আর কথা হয়নি।

‘কুশল অফিস যাতায়াত করছে।

সেদিন রবিবার।

চায়ের কাপ সামনে রেখে দুজনের মধ্যে নানা প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল। হঠাৎ ঋতু বলল, লুনাকে পৌঁছে ফেরার পথে, নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেসে আমরা একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ছিলাম তোমার মনে আছে ?

—কোন বিষয় ?

—ভীষণ ভুলো মন তোমার। লোকেশ ট্যাগুনকে কে খুন করলো তাই নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়নি ?

—মনে পড়েছে। হয়েছিল।

—হত্যাকারীকে না জানা পর্যন্ত আমি দোষমুক্ত হতে পারছি না।

বিশ্বস্তের স্বরে কুশল বলল, আদালত থেকে তুমি মুক্তি পেয়েছো। আবার কেউ তোমাকে দোষী ভাববে কেন ?

—আমার ও-তরফের আত্মীয়স্বজনেরা নিশ্চয় ভেবে বসে আছে, নামকরা উকিলের বাহাদুরীতে আমি ছাড়া পেয়ে গেছি। আসলে খুন আমি আর তুমি মিলে করেছি।

—স্বাভাবে আমাদের কোন ক্ষতি নেই।

—তা নেই। তবে এর একটা নৈতিক দিক আছে। তাছাড়া কাজটা করলে কে তা জানার একটা আগ্রহ রয়েছে। বেজ—

—বলো ?

—এমন কোন ব্যবস্থা করা যায় না, যাতে হত্যাকারীকে সকলে চিনতে পারে ?

—ব্যক্তিগত ভাবে আমি বা তুমি হাজার চেষ্টা করলেও লোকেশের হত্যাকারীকে পয়েন্ট করতে পারবো না। পুলিশের গা ঘামাবার যে চেষ্টা ছিল না তা আমরা দেখেছি।

—কোন উপায় নেই বলছো ?

—একটা কাজ অবশ্য আমরা করতে পারি। ভদ্রলোকের ভারী নামডাক। শুনেছি কোন তদন্তে উনি অসফল হননি।

—কায় কথা বলছো ?

—বাসব ব্যানার্জী। প্রয়োজন হলে, ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও ঠর সহযোগিতা চাওয়া হয়।

—তুমি চেনো তাঁকে ?

—চিনি না। পরিচয় না থাকলেও চলবে। আমবা তো ক্লায়েন্ট হিসাবে ঠর কাছে যাবো। তোমার মত কি ?

—কে খুন করেছে জানা বিশেষ দরকার। ঠর সঙ্গেই কথা বলা যাক।

—বেশ। টেলিফোন ডাইরেক্টরিটা নিয়ে এসো। মিঃ ব্যানার্জীর ঠিকানা ওতেই পাওয়া যাবে।

ঝুতু উঠে গেল।

দুশো একচল্লিশের কে হান্সারনোর্ড স্ট্রাটের ডুইংকমে তখন আলস্তের আমেজ। বাসব দিন দুয়েক আগে ইন্দোর থেকে ফিরেছে। শিল্প ত মগনলাল চৌহানের বাড়িতে পাটি চলাকালীন একজন খুন হয়ে গিয়েছিল। সকলের চোখ বাঁচিয়ে খুন কি ভাবে হল। এবং কে করল—এই দুই বড় প্রশ্নের উত্তর পুলিশ খুঁজে পায়নি। শেষ পর্যন্ত চৌহানসাহাব বাসবের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

তদন্তের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ফিরেছে। বাসব এখন সোফায় আধশোয়া অবস্থায় বসে একটা পত্রিকার পাতা ওটোচ্ছে। শৈবাল সেন্টার টপের উপর-তাস পেতে পেসেন্স খেলছে। কাজ থাকায় ইন্দোরের তদন্তে সে যেতে পারেনি। শুনেছে বাসবের নুখ থেকে ঘটানাটা।

পত্রিকা একপাশে রেখে বাসব বলল, আর কত ধৈর্ঘ্যের পরীক্ষা দেবে ?

শৈবাল একবার ওর দিকে তাকাল, তারপর তাস গুটোতে গুটোতে বলল, তুমি চূপচাপ রয়েছে। আর তো কিছু করার নেই। এই ফাঁকে নিজের ধৈর্ঘ্যের পরীক্ষা নেবার চেষ্টা করছিলাম।

—সাধে কি আর চূপ করে ছিলাম। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে।

—শরীরেব দোষ কি বল না ? খকলকে সঙ্গী করেই তো রয়েছে। আমার সাজেসান হল, বিয়ে করে ফেল।

বাসব পাইপ ধরাবার উপক্রম করছিল।

অসন্ত দেশলাইয়ের কাঠি অ্যাগট্রেতে ফেলে দিয়ে, বিশ্বয়ের স্বরে বললো, বলছো.কি ? বিয়ে করে ফেলবো ?

—একজন অভিজ্ঞ স্বামী হিসাবেই বলছি। যতই খকল যাক না কেন—পত্নীর সেবা সে এক আলাদা বস্তু। আমাদের যেডিক্যাল সার্কেলেও এত জোরাল

টনিক নেই।

—বুঝলাম। আমার মত পোড খাওয়া বয়সকে কে বিয়ে করবে? তুমিই বল না, কোন বাপ এগিয়ে আসবে মেয়ে দিতে?

মুখ হাসি টেনে শৈবাল বলল, ‘দিনহুনি’ হালচাল সম্পর্কে যদি কেউ অজ্ঞতা প্রকাশ করে তবে আর কি বলার থাকতে পারে? কবরের মধ্যে যে এক পা দিয়ে রেখেছে তার জন্তুও পাত্রীর অভাব হয় না এদেশে!

—তুমি বলতে চাইছো, সে তুলনায় এখনও আমার বাজার দর ভালই?

—নিশ্চয়। মেয়ে দেখবো, বলো—?

বাসব মুহু হেসে বলল, নিগোশিয়েশন ম্যারেজের চেয়ে, কাউকে ঘোগাড় করে নিয়ে বিয়ে করাটা বোধহয় বেশী ভাল হবে।

—এ তো মাছ ধরা নয়। ছিপ ফেলে বসে থাকবে, আব একজন মহিলা টোপ গিলবেন? তার চেয়ে বর্তমান ধকলের অবসাদ কাটাবার জন্তু কোন হিল স্টেশনে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নাও। তারপর—

—বিশ্রামের অবকাশ কোথায়? একটা কেস বোধহয় হাতে এসে পড়লো।

—কি রকম?

—ঘটনাটা পাটনার। ফোনে কথা হয়েছে। সাড়ে সাতটার সময় ক্লায়েন্টের আসার কথা।

—সাড়ে সাতট তো প্রায় বাজে। কেসটা কি?

—বিস্তারিত ভাবে কিছু জানি না। ব্যাপারটা খুনের।

এই সময় বাহাদুরের দেখা পাওয়া গেল।

এক জোড়া মহিলা ও পুরুষ দেখা করতে এসেছেন শুনেই বাসব তাঁদের এখানে নিয়ে আসতে বলল। মিনিট দুয়েক পরেই ঋতু আর কুশল ওদের সামনে এসে বসল। প্রাথমিক পরিচয় ও শিষ্টাচার বিনিময় হল।

কুশল বলল, আমার স্ত্রী একটা খুনের মামলার জড়িয়ে পড়েছিলেন। আদালতে বড় মাপের মামলা হল। ভাগ্যক্রমে উনি মুক্তি পেয়েছেন। তবে—

—আপনারা এই ব্যাপারের শেষটা দেখতে চান?

—ঠিক তাই। কে খুন করে আমার স্ত্রীকে বিপাকে ফেলতে চেয়েছিল, তার স্বরূপ আমরা দেখতে চাই মিঃ ব্যানার্জী।

—আমাকে সব কথা খুলে বলুন। খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দেবেন না। তারপর আমি স্থির করবো, এই কেস আমি নেব কি নেব না।

পালা করে ঋতু আর কুশল সমস্ত কিছু বলে গেল।

পাইপের ধোঁয়া ছাড়াতে ছাড়াতে একাগ্র মনে সমস্ত কিছু ভুললো। শৈবালভ
 শুনে গেল তালের প্যাকেট নাড়াচাড়া করতে করতে। ওরা এলাহাবাদের প্রসঙ্গ
 থেকে আরম্ভ করে, আদালত থেকে মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত কথাই বলে গেছে।
 বলা শেষ হবার পরও বাসব মিনিট দুয়েক কিছুই বলল না। অন্তরমনস্ক ভাবে
 তাকিয়ে রইল ম্যাণ্টেলপিস-এর উপর রাখা ক্লাপওয়ার তালের দিকে।

শেষে—

—ব্যাপারটার মধ্যে নতুনত্ব আছে। মিঃ ব্যানার্জী, আপনারা বিয়ে করার
 ব্যাপারে এত ব্যস্ততা দেখিয়েছিলেন কেন?

কুশল বলল, ভয় হচ্ছিল আবার না আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এছাড়া
 স্বত্ব নিরাপত্তার কথাটাও ভাবতে হচ্ছিল।

বাসব বলল, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। কেসটা আমি নিলাম।
 এবার আপনাদের কিছু করণীয় রয়েছে।

স্বত্ব বলল, ধন্যবাদ। বলুন, কি করতে হবে?

—তার আগে লালবাজারের সঙ্গে একবার কথা বলে নিচ্ছি। ডাক্তার, বাহাদুর
 কোথায় গেল দেখে তো। কফির ব্যবস্থা হোক।

কথা শেষ করেই বাসব টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের দিকে এগুলো। ব্রিসিভার তুলে
 নিয়ে, ডায়াল করতে আরম্ভ করল। ভাগ্য ভাল বলতে হবে, লাইন পেতে কোন
 অসুবিধা হল না। হোমিসাইন্ডের বড় কর্তা পুরন্দর সামন্তের সঙ্গে যোগাযোগ
 হল।

সামন্ত : কবে ফিরলেন মশাই ইন্দোর থেকে?

বাসব : দিন কয়েক হল। আবার একটা কেস হাতে এসে পড়ছে। মনে হচ্ছে
 ব্যাপারটা বেশ জটিল।

সামন্ত : আপনি ভাগ্যবান লোক। মক্কেলরা কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু।
 গুরুতর একটা কিছু ঘটছে, অথচ এখনও আমরা জানতে পারিনি—এর
 মানেটা কি?

বাসব : ঘটনাটা বিহারের। মক্কেলরা কলকাতার। আপনাকে বলবো সব
 কথা পরে। এখন বলুন তো, পাটনার সিটি এস. পি. কে?

সামন্ত : খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। তবে কাজের সুবিধার জন্য যদি এই
 এককন্সার্নি হয় তবে বলবো, এর চেয়েও বড় মাপের কর্তা তো আপনার মুর্তার
 মধ্যে।

বাসব : কার কথা বলছেন?

সামন্ত—কুশদীপ মেহরা । উনি তো এখন ওখানকার ডি. আই. জি. ক্রাইম ।
বাসব—তাই নাকি ! ধন্তবাহ । কাল কোন সময় আসছি । তখন সব কথা
হবে ।

লাইন কেটে দিয়ে বাসব আবার সোকার ফিরে এস । কফিও এসে পড়েছে ।
সকলে পেয়াদা ভুলে নিল ।

শৈবাল বলল, মিঃ সামন্ত কোন ভাল কথা শুনিয়েছেন মনে হচ্ছে ?

বাসব বলল, আমাদের মেহরা সাহাব এখন ওখানকার ডি. আই. জি. ক্রাইম ।
কাজের অনেক সুবিধা হবে ।

কুশলের দিকে তাকিয়ে এবার বলল, কোর্টে সাক্ষীদের জেরা করা হয়েছিল ।
তার কপি আনার দরকার হবে ।

কুশল বলল, সার্টিফিকেট কপি নেওয়া হয়েছিল । আমাদের কাছে নেই । ফাইল
মিঃ আহজার কাছে রয়ে গেছে ।

—ঠিক আছে । মিঃ আহজার কাছ থেকে ফাইল নিয়ে নেওয়া যাবে । আজ
সোমবার, আমরা বুধবারে পাটনা রওয়ানা হচ্ছি । রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা রাখবেন ।

—আপনাদের কোন অসুবিধা হতে দেব না । আপনার সম্মান মূল্য কত জানা
নেই । আগাম হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাইছিলাম ।

—কাজটাই হল আদত কথা । পেয়েন্টের ব্যাপারটা আপনাদের উপরই ছেড়ে
ছিলাম । নিজেদের সুবিধামত যা স্থির করবেন তাই মেনে নেবো ।

পাঁচ হাজার টাকার চেক বৈধে ঋতু ও কুশল বিদায় নিল । এতদূর পরে পাইপ
ধরাল বাসব । প্রাক লন্ডার মোলারয়েম অফিসের তখন ক্রমেই কলকাতার উপর ঘন
হয়ে আসছে । প্রতিবারের মতো শৈবাল সেই বিশেষ প্রদর্শন করল ।

—কি বুঝলে ?

বাসব পাইপ মুখ থেকে খসিয়ে এনে বলল, হত্যাকারী কে তা এখন আমার
চিন্তার বিষয় নয় ডাক্তার । খুন করার পদ্ধতিই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে ।

—কেন ? মারকিউরিক ক্লোরাইড ডিউটিকে খাওয়ানো হয়েছিল, তা তো
পোস্টমর্টমের রিপোর্টেই বলা হয়েছিল ।

—কখন খাওয়ানো হয়েছিল ? কিতাবে খাওয়ানো হয়েছিল ? এই দুটো প্রশ্নের
উত্তরের উপর এই কেসের অনেক কিছু নির্ভর করছে । তুমি বল তো মারকিউরিক
ক্লোরাইডের অ্যাকশন কিতাবে হয় ?

শৈবাল বলল, অল্প মাত্রায় যদি পেটে বার তরুণ তার প্রভাব ফেরিয়ে পড়বে ।
আর কত কাল ডাইনে রাজা বেশি হওয়া দরকার ।

—তাহলে কি দাঁড়াল ?

—সম্ভাবনা দুটুকু থেকেই আছে। হত্যাকাণ্ডে অনেক আগেই অল্প মাত্রায় মারকিউরিক ক্লোরাইড ভিক্টিমকে খাইয়েছিল কোন পানীয়ের সাহায্যে। মৃত্যু যখন হোক, যেখানে হোক আহুক। কিংবা সে বেশী মাত্রায় ব্যবহার করেছিল যাতে দুশো দশ নম্বর ঘরেই ওর মৃত্যু হয়। অর্থাৎ ঋতু মাথুকে বিপদে ফেলার ষড়যন্ত্র।

—তোমার বিশ্লেষণ খারাপ নয় ডাক্তার। তবে প্রথমতঃ যে ঘর জায়গায় অনড হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেমন, রাত সাড়ে দশটার সময় লোকেশ ট্যাগুন ঋতু মাথুর ঘরে কেন গিয়েছিল ? সেক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে উপচাটিক আলাপ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কোন মহিলার ঘরে অসময় কোন পুরুষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলে যেত পারে না। দ্বিতীয় কথা, যে কোন কারণেই হোক লোকেশ ঋতু মাথুর ঘরে গিয়েছিল। সে যখন দেখলো ঋতু মাথুর ঘরে নেই তখন সে অপেক্ষা করছিল কেন ?

—এমন হতে পারে, সে অপেক্ষা করেনি। ঘরে ঢোকার পরই মারা পড়েছিল।

—তুমি বলতে চাইছো, তাকে যে অল্প মাত্রায় মারকিউরিক ক্লোরাইড খাওয়ানো হয়েছিল তার অন্তিম লগ্ন তখন ছিল ?

—আমার তো তাই ধারণা।

—মৃতদেহ তবে বাধকমে গেল কিভাবে ! ভুলে গেলে চলবে না, পুলিশ বলেছে, বডি বেডকম থেকে বাধকমে নিয়ে যাওয়া হয়। অর্থাৎ ওরা বডি টেনে নিয়ে যাবার চিহ্ন পেয়েছিল। এর একটাই অর্থ হয় ডাক্তার, লোকেশ যখন মারা যায় তখন ঘরে আর একজন লোক ছিল।

—কে হতে পারে সেই লোক ?

—বাইরের কেউ নিশ্চয় নয়। ঋতু মাথুরকে বিপদে ফেললে যাদের সুবিধা হয়, তাদেরই মধ্যে কেউ একজন এ কাজ করেছে।

—তার মানে ত্রিকোণ প্রেমট্রেন পুলিশের ধারণা, আসল ব্যাপারটা স্বার্থ-লব্ধিষ্ট।

—একজ্যাক্ট লি। সেই স্বার্থভাড়াড়িদের কথা আমরা পরে ভাববো। বর্তমানে আমার আগ্রহ অগ্নাজ—

—কিরকম ?

—আমি রামনরেশের কথা ভাবছি।

—সে আবার কে ?

পাইপ নিভে গিয়েছিল অনেক আগেই।

বাসব ধরিয়ে নিয়ে বলল, হোটেলের সেকেন্ড ফ্লোরের বেয়ারার কথা বলছি।

সে সেদিন নাইট ডিউটিতে ছিল না। হোটেলেরই ছিল না স্বামী। অথচ আদালতে গেল বলেছে, গভীর রাতে ঋতু মাথুরকে এঘর থেকে ওঘরে যেতে দেখেছে।

—পরে জেরার মুখে বলেছে, গেল কিছুই দেখেনি। সে আদালতের ডিউটিতে ছিল না।

—কথাটা আমার মনে আছে। কিন্তু পুলিশকে আগে এবং আদালতে সরকারী পক্ষের প্রশ্নের উত্তরে সে কেন মিথ্যা কথা বলেছিল?

—সাক্ষীর এই ধরনের মিথ্যা কথা বলেই থাকে।

—যদি সাক্ষী দিতে এসে মিথ্যা কথা বলে, কোন একটা স্বার্থের দিকে তাকিয়েই বলে। এমনজন হোটেল বেয়ারার এই হত্যাপ্রকারণে কি স্বার্থ থাকতে পারে?

শৈবাল চুপ করে রইল।

বাসব আবার বলল, ঋতু মাথুরকে বিপদে ফেলে তার কি লাভ? তবু সে মিথ্যা কথা বলেছে। এর একটা কারণ নিশ্চয় আছে ডাক্তার। অকারণে এরকম গুরু-গভীর পরিবেশে কেউ মিথ্যা কথা বলে না। বিশেষে রামনরেশের মত একজন সাধারণ বেয়ারা।

—তার মানে ওর অল্প ধরনের কোন স্বার্থ ছিল।

—ঠিক ধরেছো। এখন আমাদের দেখতে হবে কি ধরনের স্বার্থ তার থাকতে পারে।

—স্বার্থ অর্থবাক্যে হতে পারে। কেউ হয়তো মোটা টাকা দিয়ে তাকে ঐ ধরনের কথা বলতে বলেছিল।

—চমৎকার। আজকাল লক্ষ্য করছি তোমার মাথা বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। নিশ্চিতভাবে কেউ টাকা দিয়েছিল। রামনরেশের মত সাধারণ লোক লোভ সামলাতে পারেনি।

—রহস্যের উপর থেকে পর্দা তো উঠে গেল বলতে গেলে।

—কিন্তু?

—মেহরা সাহেব আমাদের সঙ্গে থাকবেন। রামনরেশের পেট থেকে আসল কথা বার করতে অসুবিধা হবে না। কালগিটের নাম আমরা এইভাবে স্মেনে যেতে পারবো।

—একদিক থেকে তুমি ঠিকই বলেছো। আমরা কিন্তু অন্য কথা ভাবছি। ব্যাপারটা কি এতই জলবৎ তরল? রামনরেশের মত সাধারণ লোকের উপর নির্ভর

করে এমন কাঁচা কাজ কি কালপ্রিট করতে পারে ?

—তুমি বলতে চাইছো, নিজে আড়ালে থেকে অন্য কোন কায়দায় রামনরেশকে ঘুষ দেওয়া হয়েছিল ?

—এটাই সঠিক দিচ্ছো ।

—দেই কায়দাটা কি ?

—মাঠে নামার পর আঁচ পাওয়া যেতে পারে । আচ্ছা ডাক্তার, পুলিশের কার্যকলাপে কোন অসঙ্গতি তুমি দেখতে পাচ্ছ ?

—ঋতু মাথুরকে ওরা যখন দোষী সাব্যস্ত করেছিল, তখন কুশল ব্যানার্জীকেও উচিত ছিল গ্রেপ্তার করা । একা কোন মহিলার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয় । অথচ ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হল না ।

—নিশ্চিতভাবে আনা উচিত ছিল । আরো এফটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মত, হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে স্বচ্ছন্দে জেনে নেওয়া যেত, রামনরেশের সেদিন রায়ে ডিউটি ছিল কিনা । তাহলে তার মিথ্যা কথা ধর' পড়ে যেত । রামনরেশ গুরুত্বহীন সাক্ষী হয়ে পড়তো । পুলিশের এই গাছাড়া ভাবের কারণ কি ? অথচ অভিযুক্তা পক্ষের উকিল রামনরেশকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন সে মিথ্যা কথা বলেছে ।

• শৈবাল বলল, আপল কথা হল, পুলিশ প্রথমেই ঋতু মাথুর সম্পর্কে মাইণ্ড যেকাপ করে নিয়েছিল । তাই গভীর ভাবে তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তাবোধ করেনি ।

—হতে পারে আবার নাও হতে পারে ।

—অর্থাৎ—

—কাগজপত্র আগে দেখেনি, তারপর আমিও মাইণ্ড যেকাপ করবো । ডাক্তার, আরেকবার কফি হলে কেমন হয় ? দেখ তো, বাহাহুর কি করছে ?

কথা শেষ করেই বাসব ক্লান্ত ভাবে হাই তুলল ।

ঘণ্টা কয়েক হল বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে পাটনায় এসেছে । প্লেনে কলকাতা থেকে এখানে আসতে কতক্ষণই বা সময় লাগে । ঋতু, কুশল এবং ব্রজবাবুও আছেন সঙ্গে । বাসবের ইচ্ছামুসারে এয়ারলাইন্স হোটেলেই ঘর নেওয়া হয়েছে । টেলিফোনে ঋতুর সঙ্গে কথা হয়েছে নরেন্দ্র আহজার । ব্রজবাবু গেছেন গুঁর কাছ থেকে কাইলটা নিয়ে আসতে । দুপুরের খাওয়া শেষ হবার পর বিন্দুমাত্র বিশ্রাম না নিয়ে বাসব হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল ।

সঙ্গে শৈবাল আছে । গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে । কয়েকবার এলেও পাটনা

শহরের ভূগোল ওদের তেমন সড়গড় নয়। গম্ভ্যাবস্থার কথা ড্রাইভারকে জানাতে সে বেচারাও চিন্তিত হয়ে পড়ল। তবে বিবেচনার পরিচয় দিয়ে ঐ অঞ্চলের খানার গিয়ে উপস্থিত হল।

ওখান থেকেই জানা গেল ডি. অ.ই. জি. অফিসের ঠিকানা। কলকাতার মত বিশাল ট্র্যাফিক নেই—মারাত্মক জ্যাম নেই, কাজেই মিনিট কুড়িকের মধ্যেই গম্ভ্যাবস্থায় পৌঁছানো গেল। ভাগ্যক্রমে মেহরা সাহাব অফিসেই ছিলেন। বাসবের কার্ড হাতে পেতেই নিজে বেরিয়ে এলেন। শোরগোল তুলে অভ্যর্থনা জানিয়ে ওদের নিয়ে গিয়ে বসালেন নিজের অফিস রুমে।

—কবে এসেছেন? খবর করতেন আমাকে, আমি গিয়ে দেখা করতাম।

বাসব মুহূ হেসে বলল, ঘণ্টা কয়েক হল এসেছি। পদমরগাদা বেড়ে ঘাওয়া আপনার ব্যস্ততাও বেড়েছে। আপনাকে তাই আরো ব্যস্ত করে তুলতে চাইনি। নিজেরাই চলে এলাম।

মেহরা বললেন, পুলিশের চাকরিতে যেমন ব্যস্ততা আছে, তেমনই ফাঁকিবাঁজীও আছে। কেসটা কি বলুন তো? সম্প্রতি রহস্যময় কিছু পাটনার ঘটেছে বলে তো আমার জানা নেই।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, ঘটনাটা কিংং পূর্ণনো। কোর্ট পর্বত গড়িয়ে ছিল। অভিযুক্তা খালাস পেয়েছেন। তিনিই আমাকে নিষ্পত্ত করেছেন।

—অভিযুক্তা—

—ঋতু মাংসুর।

মেহরা গম্ভীর হয়ে গেলেন।

—বুঝলাম, পুলিশের আরেক অকর্মণ্যতার দায় আপনার উপর পড়েছে। ব্যাপারটা খুলে বলুন তো!

বাসবের সাজানো ছিল। বলল।

শোনার পর মেহরা বললেন, মহিলার উপর দিয়ে ভাল রকম ধকল গেছে। খানার ঐ-ইডিয়েটগুলো ইনভেস্টিগেশন কোন পাখীর নাম একেবারেই জানে না।

—আপনার সহযোগিতা কিন্তু আমার চাই।

—ও কথা বলে আমাকে লাজ্জিত করবেন না মিঃ ব্যানার্জী। যে কোন সাহায্য এবং সহযোগিতার জন্ত আমি প্রস্তুত আছি জানবেন। এবার উঠুন আপনারা।

—কোথাও যেতে হবে?

—বাংলোর চলুন। মিসেস মেহরা আপনারদের দেখে ভারী খুশী হবেন। কাজ-

টাজ যা আছে, কিছু পরে আদত করলেও চলবে।

বাসব মুখে হাসি টেনে বলল, লাখ কথার এক কথা। মিসেস মেহরার শালীন চেহারা অনেকদিন দেখা হয়নি। চলুন, যাওয়া যাক।

বেলা পড়ে এসেছে।

ব্রজবাবু কিছুক্ষণ আগে ফাইল পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

বাসব মন দিয়ে পড়ে যাচ্ছে পাতার পর পাতা। ভাগ্যক্রমে ইংরাজীতেই ফাইল তৈরী করা হয়েছিল। যদিও সাক্ষীদের বয়ান সমস্ত হিন্দীতেই হয়েছিল। তার সার্টিফিকেট কপিও রয়েছে। তবে ইংরাজী অনুবাদও রাখা হয়েছে। এর কারণ নবেন্দ্র আত্মজা হিন্দীভাষী নন। কাজের সুবিধার জন্তই এরকম করতে হয়েছে।

পৌনে ছটার সময় বাসবের পড়া শেষ হল। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ও জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। তুচ্ছ কুঁচকে তাকিয়ে বইল গাছপালা ঘেঁরা একটা জায়গার দিকে। মনের মধ্যে চিন্তা ভূজঙ্গায়ত গতিতে ঘোরা ঘেঁরা করছে।

একটা প্রশ্নের উত্তর প্রথমেই পেল ভাল হয়। লোকেশ ট্যাগুনকে কি ভাবে খাওয়ানো হয়েছিল মারকিউরিক ক্লোরাইড মেশানো পানীয়? বাসব চিন্তার বোঝা ঝাড়ে নিয়েই ফিরে এল আবার নিজের জায়গায়। পাইপ ধরাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল এতক্ষণ পরে।

শৈবাল স্থানীয় ইংরাজী দৈনিক 'ইণ্ডিয়ান নেশান' পড়ছিল।

মুখ তুলে বলল, ফাইল ঘেঁটে কিছু পেলো?

—অনেক অসঙ্গতি চোখে পড়ল।

—কি ভাবে এগুবে স্থির করেছো?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, এই বেসের তদন্তকারী ইন্সপেক্টরের সঙ্গে প্রথমে দেখা করতে চাই। তদন্তের ব্যাপারে এমন গাছাড়া ভাব কেন তা জানা বিশেষভাবে দরকার। মিঃ মেহরা এসে পড়লেই আমরা বেরিয়ে পড়বো। কিন্তু তাকাত, একটা প্রশ্নের উত্তর তো একেবারেই খুঁজে পাচ্ছি না।

—কোন প্রশ্নের?

—তোমার সঙ্গে আগের ও-বিষয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। মারকিউরিক ক্লোরাইড লোকেশ ট্যাগুনের পেটে গেল কি ভাবে?

—সরবতের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয়েছিল।

—তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ছিল। সরবত খাবার সিঁজিন নয়। তাছাড়া অসম্ভব

অর্থাৎ রাত সাড়ে দশটার পর কেউ সরবত খেতে চাইবে না।

—চা খেতে পারে নিশ্চয়ই ?

—তা পারে। তবে গরম কিছুই সঙ্গে মারকিউরিক ক্লোরাইড মেশালে কি কার্ণকর হবে—আমার জ্ঞান নেই। তুমি কি বল ?

—এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। আমারও কোন জ্ঞান নেই। বিয়ার হাইন্ডি বা ঐ জাতীয় কিছুই সঙ্গে কি খাওয়ানো যেতে পারে না ?

বাসব ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, একজ্যাকুটি। এটাই বোধ হয় সঠিক সম্ভাবনা। নেশার ব্যাপারটা যে কোন দিভিনে, যে কোন সময় চলতে পারে। তবে মদের বোতল নিয়ে ঋতু মাথুরের ঘরে লোকেশের যাওয়া কি সম্ভব, এবার এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে আমাদের।

মদের বোতল নিয়ে সে কখনই ঐ অসময়ে মহিলার ঘরে যেতে পারে না।

ঠিক বলেছ। তাহলে দাঁড়াল কি ? ২১৬ নং ঘরে যাবার বেশ কিছুক্ষণ আগেই লোকেশ মদ খেয়েছিল। তাতে মেশানো ছিল মারকিউরিক ক্লোরাইড। ঋতু মাথুরের দুর্ভাগ্য লোকেশের অস্তিমক্ষণ এসে উপস্থিত হয় তারই ঘরে।

শৈবাল বলল, তাহলে ব্যাপারটা তো মিটেই গেল। এখন দেখতে হবে কাজটা করেছে কে ?

অপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছে। তবে এখনও আমার মন খুঁতখুঁত করছে। গভীর কোন প্যাচ থাকা বিচিত্র নয়।

বাসব আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল—এই সময় বেল বেজে উঠল। শৈবাল উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই মেহরা সাহার দেখা দিলেন। পুরো ইউনিফর্ম ভারী স্মার্ট দেখাচ্ছে তাঁকে এখন।

মুখে হাসি টেনে বললেন, নিশ্চয় দেরি করে ফেলিনি। আমাদের এখন প্রথম কাজটা কি ? ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলা ?

বাসব বলল, থানা-ইনচার্জের সঙ্গে প্রথমে কথা বলে নিলে ভাল হয়।

—বেশ তো অহুস্থি না থাকলে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি।

মেহরা সাহাবের গাড়িতেই আধ ঘণ্টার মধ্যে তিনজন সংগঠিত থানায় গিয়ে পৌঁছল এখানকার যা রেওয়াজ। পরিহার নিজের অফিসে ছিলেন না। কোয়ার্টারে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ডি. আই. জি. এসেছেন সংবাদ পেয়ে পড়ি কি মতি করে ছুটে এলেন। দুজন নবগতর সঙ্গে এই উচ্চ পদাধিকারীকে তিনি আশা করেননি।

গ্যালুট মেয়ে উৎকণ্ঠিত ভাবে দাঁড়ালেন।

মেহরা সাহাব বললেন, গত জাহ্নসাবী মাসে এয়ারলাইন হোটলে যে মার্ভার

হয়েছিল, তার তদন্ত আপনি করেছিলেন ?

বিনীত ভাবে পরিহার বললেন, হ্যাঁ, স্যার ।

—বর্তমানে কেসের অবস্থা কি ?

—রায় হয়ে গেছে স্যার । আসামী খালাস পেয়েছে । অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে আদালতের উপর আত্মকাল নির্ভর করা কঠিন হয়ে পড়েছে ।

মেহরা সাহাব গলা তুললেন, বাজে কথা ব-বেন না । আমি বেসটার সম্পর্কে খোজখবর নিয়েই এসেছি । তদন্তের নামে আপনি ছেলেখেলা করেছেন । আপনাদের মত লোকই পুলিশ ডিপার্টমেন্টের বদনাম করে রেখেছে । রায়ের নকল আপনি পেয়েছেন ?

—পেয়েছি স্যার ।

—আপনার অকর্মণ্যতার সার্টিফিকেট আপনি দেখেছেন । আসল খুনী কে তার তদন্ত আরম্ভ করেছেন কি ? না, আবার ফাইল খোলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি ?

—এখনও স্যার—মানে—

—আপনাকে কেন সাসপেন্ড করা হবে না বলুন তো ?

পরিহার ঘামতে লাগলেন ।

মেহরা সাহাব আবার বললেন, ঐ কেস বেসরকারী ভাবে তদন্ত আরম্ভ হয়েছে । আমরা সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছি । এঁরা কলকাতা থেকে ঐ ব্যাপারেই এসেছেন । ইনভেস্টিগেশন জগতের স্তম্ভস্বরূপ । সমস্ত রকম সহযোগিতা দিতে আপনি বাধ্য থাকবেন জানিয়ে রাখলাম ।

—হ্যাঁ স্যার । নিশ্চয়—

—মিঃ ব্যানার্জী আমি তাহলে এখন যাই । পরে দেখা হচ্ছে ।

মেহরা সাহাব বিদায় নিলেন ।

আগেই এই রকম স্থির হয়েছিল । মেহরা সাহাবের সামনে পরিহার কখনই সহজ হতে পারবেন না । জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির খঁ পাওয়া যাবে না । তাই এই ব্যবস্থা । বাসব পাইপ ধরিয়ে নিল । পরিহার কিছুটা সহজ হয়েছেন । তার সাসপেন্ড হয়ে যাওয়ার কাঁটা গলায় বিধে রইল ।

উনি যতদূর সম্ভব সহজ গলায় বললেন, আপনাদের জন্ত কি করতে পারি ?

—আহাম্মি কিছু নয়—বাসব বলল, ঐ কেসে আপনি যে ডায়রী দাখিল করেছিলেন, তা আমি পড়েছি । সাক্ষী হিসাবে আপনি আদালতে বা কিছু বলেছেন তা আমার জানা আছে । ঐ সম্পর্কেই কিছু জানতে চাইবো ।

—কি জানতে চান বলুন ?

—এয়ারলাইন্স হোটেলের সেকেন্ড ফ্লোরের বেয়ারা মিথ্যে কথা বলছে তা আপনি সহজেই ধরে ফেলতে পারতেন—হোটেলের অ্যাটেণ্ডেন্স রেজিস্টারই যথেষ্ট ছিল, অথচ—

বিরক্তির স্বরে পরিহার বললেন, আমার কাজের সমালোচনা শুনতে চাই না। আপনি কি জানতে চান তাই বলুন ?

বাসব তীক্ষ্ণ গলায় বলল, এই কেম-রি-ওপেন হয়েছে, এখনও বুঝতে পারেননি ? আপনার অক্ষমতার দায় অল্প কেউ নেবে না। মিঃ মেহরা কি বলে গেলেন আপনি শুনেছেন। নিজের বিপদ আর ডেকে না এনে আমার প্রাণের উত্তর দিন।

পরিহার বুঝলেন বেশ বেকায়দায় পড়ছেন।

উত্তর দেওয়াই শ্রেয় মনে করলেন।

—রামনরেশকে যখন প্রশ্ন করছিলাম তখনই সে কথাটা বলে। পুলিশের সামনে বড় একটা কেউ এই ধরনের মিথ্যা বলে না।

—কাজেই আপনি অ্যাটেণ্ডেন্স রেজিস্টার দেখলেন না। এমন কি রামনরেশ সত্যি কথা বলেছে কিনা তা ম্যানেজারের কাছ থেকে যাচাই পর্বস্ব করে নেবার চেষ্টা করলেন না। যাহোক, এখন আপনার কি মনে হচ্ছে ?

—কি ব্যাপারে ?

—রামনরেশ অকারণে ভাষা মিথ্যা কথাটা নিশ্চয় বলেনি ?

—আপনি বলতে চাইছেন, যে কারুর কাছ থেকে টাকা খেয়ে ঋতু মাথুরের বিরুদ্ধে ঐ সমস্ত কথা বলেছিল ?

—শুধু আমি নয়, আপনারও মত ঐ হওয়া উচিত। টাকা—রামনরেশকে কে দিতে পারে ?

—মিসেস মাথুরের স্বত্ত্বব্যাড়ির যে কেউ।

—কেন ?

—এখন মনে হচ্ছে, মিসেস মাথুর বিশদে জড়িয়ে পড়লে ঐদের আর্থিক লাভ হবার সম্ভাবনা ছিল।

—রামনরেশকে চেপে ধরলে কে তাকে টাকা দিয়েছিল জানা যেতে পারে। কি বলেন ?

পরিহার এবার কিছুটা উৎসাহিত বোধ করলেন।

—ওর পেট থেকে আমি কথাটা বার করে নিতে পারবো।

মিস্টার ছাই হয়ে গিয়েছিল।

পাইপ নামিয়ে রেখে বাসব বলল, এদিকটা যাহোক হল। এবার কুশল ব্যানার্জির ব্যাপারটা আপনি আদালতে ঠুঁর সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অথচ ঠুঁকে গ্রেপ্তার করেননি। কেন ?

—তদন্তের সময় উনি আমার চোখে সন্দেহভাজন ছিলেন না। পরে—মানে...

—ব্যাখ্যা অবশ্য সমর্থনযোগ্য নয়। এখন আর কথা নয়। আমাকে একটু সাহায্য করুন। এয়ারলাইন্স হোটলে চলুন আমাদের সঙ্গে। ম্যানেজার আর রাম-নরেশের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি সঙ্গে থাকলে সুবিধা হবে।

দশ মিনিটের মধ্যেই ওরা হোটলে পৌঁছল।

বাসব নিজেদের ঘরেই রামনরেশকে ডেকে পাঠালো। মিনিট কয়েকের মধ্যেই এসে উপস্থিত হল। ইন্সপেক্টার পরিহারকে আশা করেনি। সারা মুখ ভরে উঠল ছান্নায়। আবার কোন গোলমাল হল নাকি ?

পরিহার বললেন বাসবের দিকে ইঙ্গিত করে, লোকেশ ট্যাগুনের ব্যাপারে ইনি এসেছেন কলকাতা থেকে। এঁর প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দেবে।

কাঁপা গলায় রামনরেশ বলল, আমার যা জানা ছিল আপনাকে বলেছি হজুর। আদালতেও বলেছি। আর তো কিছু জানা নেই।

—তুমি মিথ্যা কথা বলেছো—বাসব বলল, তোমার মুখ থেকে আমার আসল কথা শুনতে চাই।

—আসল কথা—বিশ্বাস করুন, আমি আর কিছুই জানি না।

—তুমি বলেছিলে, সেদিন গভীর রাত্রে ঋতু মাথুরকে ২১০ নম্বর ঘর থেকে ২১৬ নম্বর অর্থাৎ নিজের ঘরে যেতে দেখেছিলে। আবার সেই তুমি আদালতে স্বীকার করেছো বখাটা মিথ্যা। ঋতু মাথুরের উপর কোন কারণে তোমার রাগ ছিল ?

—না।

—শত্রুতা ছিল ?

—না।

—তবে কেন তাঁকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছিলে ? কেন মিথ্যা এজাহার দিয়েছিলে ? কেন মিথ্যা সাক্ষী দেবার চেষ্টা করেছিলে ?

রামনরেশ ঘামতে আরম্ভ করল।

পরিহার বললেন, তোমার মিথ্যা বলার দরুন আমাকেও আদালতে ছোট হতে হয়েছে। বলো, কেন তুমি মিথ্যা কথা বলেছিলে ?

—আমি অস্থায়ী করেছি। আমার ক্ষমা করুন হজুর।

—ক্ষমার কথা পরে আসছে। আগে বলে, কেন তুমি মিথ্যার জাল

কুনেছিলে ? চুপ করে থাকলে পার পাবে না। খানায় টেনে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড খোলাই দেব। আরো সব হাড়কাঁপানো ব্যবস্থা আছে তুমি বোধহয় জানো ?

রামনরেশের মুখ একেবারে চুপসে গেছে।

কয়েকবার ঠোট চেটে নিয়ে বলল, আমি গরীব মানুষ। লোভে পড়ে মিথ্যা কথা বলেছিলাম। কাজটা আমি ভাল করিনি হজুর। লোভই আমার সর্বনাশ করে ছাড়ল।

বাসব বলল, কি রকম লোভ ? কে তোমায় লোভ দেখিয়েছিল ?

—আমায় টাকা দেওয়া হয়েছিল।

—কত ?

—দু হাজার।

—কে দিয়েছিল ?

—আমি জানি না সাব।

বাসব বিস্ময়ের সুরে বলল, তা বিভাবে সম্ভব ? তুমি টাকা পেলে অথচ তোমাকে কে টাকা দিল জান না !

—আমি সত্যি কথা বলছি। কে আমাকে টাকা দিয়েছে আমি জানি না।

—বিশ্বাস না হলেও তোমার কথাই মেনে নিলাম। এখন বলো, কি ভাবে তুমি টাকাটা পেলে ?

—আমি ২৩০ নম্বর ঘরে গিয়েছিলাম সাফাইয়ের কাজে। সোম সাহাব তখন বাধকমে ছিলেন। এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল—

—দাঁড়াও। সোম সাহাব কে ?

—আদিত্য সোম। ২৩০ নম্বর ঘর ন্তর নামেই বুক ছিল।

—কবেকার কথা বলছো ?

—১২ই জাহ্নবী সাহাব। এর ঘণ্টাখানেক আগেই আমি আর ঋতু মেম সাহাব লোকেশবাবুর মড়া দেখতে পেয়েছিলাম।

পরিস্কার প্রশ্ন করলেন, আমি তখন ওখানে ছিলাম ?

—হ্যাঁ, হজুর। আপনি ঋতু মেম সাহাবের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

—তারপর কি হল ?

—সোম সাহাব বাধকমে থাকায় আমাবেই ফোন তুলতে হল। ওখানের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ফোনটা আমারই—

—তারপর কি হল ?

বাসব বলল, ঠিক যে ভাবে কোনে তোমার সঙ্গে কথা হয়েছিল, সেই ভাবে বল ?

রায়নরেশ একটু চূপ করে থাকার পর বলল, ওখার থেকে একজন বলছিল, বেয়ারা রায়নরেশ ওখানে আছে। ওকে ডেকে দিন।

—রায়নরেশ কথা বলছি। আপনি কে?

—তোমার উপকার করতে চাই। দু হাজার টাকা তোমায় দেব। আমার ছোট একটা কাজ করে দিতে হবে।

—আপনি কে কথা বলছেন সাব?

—তা জেনে তোমার কোন লাভ নেই। টাকাটা চাও কিনা বলো?

—টাকাটা পেলে আমার খুবই উপকার হয়। আপনার কাজটা কি জানি না তো। আমার পক্ষে সম্ভব হলে—

—সম্ভব হবে। করিডরের কোণে যে কাবার্ড আছে, তার মধ্যে খামে ভরা টাকাটা রয়েছে। তুমি নিতে প'রো।

—কাজটা কি বললেন না—

—কাল গভীর রাতে তুমি ঋতু মাথুরকে ২১০ নম্বর ঘর থেকে ২১৬ নম্বর ঘরে যেতে দেখেছো এই কথাই তুমি বলবে পুলিশকে।

—কাল রাতে তো আমার ভিউটি ছিল না।

—তাতে কিছু আসবে যাবে না। তুমি ঐ কথাটা বললেই পুলিশ লুকে নেবে। আরেকটা কথা, আমার সঙ্গে চানাকি করতে গেলে ভীষণ বিপদে পড়বে। লাইন কেটে গেল। কাবার্ডের মধ্যে টাকাটাও পেনাম। আমি ভেবেছিলাম ঐ কথাগুলো পুলিশকে বললে কি আর হবে। তাই—

—তুমি আর কিছু জানো যা পুলিশকে বা স্নাডালতে বলনি?

—না, সাব। আমি আর কিছু জানি না।

রায়নরেশকে বিদায় করা হল।

এবং ব্লে দেওয়া হল হোটেলের ম্যানেজারকে এখানে পাঠিয়ে দিতে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ম্যানেজার দেখা দিলেন। তাঁকে চিন্তিত মনে হচ্ছিল। বুকে উঠতে পারছিলেন না বোধহয়, আবার কি হল?

তাঁকে বঙ্গার ইঙ্গিত করে পরিহার বললেন, ঋতু মাথুর আদালত থেকে ছাড়া পেয়ে গেছেন শুনে থাকবেন। ঐ কেস নিয়ে আবার নাড়াচাড়া করতে হচ্ছে। ইনি আপনাকে কিছু প্রস্তাব করবেন। যা সত্যি তাই বলবেন উত্তরে।

—বলুন স্যার।

বাসব বলল, ২১৬ নম্বর ঘর ঋতু মাথুরের নামে বুক ছিল। দুর্ঘটনা ঘটায় কত পর থেকে ঐ ঘরে বোর্ডার আসতে আরম্ভ করে?

—২১৬ নম্বর ঘরে বোর্ডার নেওয়া হয় না।

—কেন ?

—ঐ ঘরে খুন হয়ে যাওয়ার দরুন অন্তত হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল।
দেখেনে ম্যানেজমেন্ট বোর্ডার নিতে এখন মানা করেছেন।

—ঘরটা বন্ধ করে রাখা হয় ?

—হ্যাঁ স্যার।

—১২ই জানুয়ারী যে ভাবে ঘর সাজানো ছিল, এখনও ঠিক তাই আছে ?

—তাই আছে। প্রতিদিন পরিষ্কার করা হয়।

—সেদিন ঘরে যা যা ছিল আজও তাই আছে ?

—হ্যাঁ, স্যার।

—মি: ম্যানেজার, এই হোটেলের প্রতিটা ঘরেই তো টেলিফোন আছে। কোন বোর্ডার অন্য ঘরে ফোন করতে চাইলে ডায়রেক্ট করতে পারবে ?

ম্যানেজারের চিন্তিত ভাব কেটে গিয়েছিল। বললেন, ডায়রেক্ট করা যাবে না। আমাদের এক্সচেঞ্জ বোর্ড আছে। ওখানে বলতে হবে, অমুক ঘরে লাইন দিন—এক্সচেঞ্জ দেবে।

—বাইরে কাউকে ফোন করতে গেলেও নিশ্চয় এই ব্যবস্থা ?

—হ্যাঁ, স্যার।

—এর কোন রেকর্ড রাখা হয় ?

—রেকর্ড তো রাখতেই হয়।

—এর মানে এই দাঁড়াল, এ ঘর থেকে ও ঘর এবং এখান থেকে বাইরে ও বাইরে থেকে এখানে কে কাকে ফোন করছে তার একটা হিসাব আপনারা রেখে থাকেন ?

—রেজিস্টার মেন্টেন করা হয়। অপারেটর প্রতিটা ক্ষেত্রে নোট রাখে।

বাসব পাউচ আর পাইপ সেন্টার টপের উপর থেকে তুলে নিয়ে বলে, ভাল ব্যবস্থা। ঐ রেজিস্টারটা একবার দেখতে চাই।

—গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—পরে হলেও চলবে। এখন ২১৬ নম্বর খোলাবার ব্যবস্থা করুন। ঘুরেফিরে ঘরখানা দেখতে চাই।

—এখনই ব্যবস্থা করছি।

ম্যানেজার ব্যস্ত ভাব নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাসব পাইপ ধরাল। ঘনঘন করেকবার টান দেবার পর তাকাল পরিষ্কারের দিকে। মুখে প্রগলভ্য ছাপ।

পরিহার বললেন, রায়নরেশকে কে কোন করেছিল জানতে আর অস্থবিধা হবে না।

—ঐ লোকটা মাথা মোটা হলে আলাদা কথা।

—তার মানে ?

যে এত আটঘাট বেঁধে কাজ করেছে তার পক্ষে এমন একটা স্থূল স্থর ছেড়ে রাখা সম্ভব নয়। তবে ভূগ তো মানুষেই করে। দেখা যাক।

ম্যানেজার চাবি নিয়ে উপস্থিত হলেন।

সময় নষ্ট না করেই সকলে পৌঁছে গেল ২১৬ নম্বর ঘরে। প্রতিদিন বাড়ী পৌঁছা হলেও একটা সৈঁদ্য গন্ধ ঘরে ছেয়ে রয়েছে। নিয়মিত ব্যবহার না করার দরুনই বোধহয় এরকম হচ্ছে। জানলা দুটো খুলে দেওয়া হল। বাসব তীক্ষ্ণ চোখে ঘরের চারধার দেখে নিল কিছুটা সময় নিয়ে। উঁকি মারল বাথরুমেও একবার।

শৈবাল শোফায় বসে পড়েছিল। পরিহার একধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে বাসবের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলেন। ইতিমধ্যেই তাঁর বুঝতে অস্থবিধা হয়নি, কলকাতা থেকে আগত এই গোয়েন্দার মাথা বেশ পরিষ্কার। ম্যানেজার একধারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিব্রত ভঙ্গী নিয়ে। কবর খুঁড়ে মড়া আবার তুলে আনার এই চেষ্টা কেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

বাসব ম্যানেজারের সামনে এসে দাঁড়াল।

—১২ই জাহ্নবীরী এই ঘরের য' যা ছিল, এখনও তাই আছে ? ভাল করে দেখে নিয়ে বলুন।

ম্যানেজার ঘরের চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন।

—সব ঠিক আছে।

—বোর্ডারদের জল খাবার কোন ব্যবস্থা ঘরে থাকে না ?

—থাকে।

—জগ, সোরাই বা জল রাখার অস্ত্র কোন পাত্র তো দেখছি না। এমন কি একটা গেলাসও নেই।

—জগ আর গেলাস ছিল। দুর্বটনা ঘটার পর ও দুটোর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। খোঁজাখুঁজি করেও কোন ফল পাওয়া যায়নি।

বাসব পরিহারের দিকে ফিরলো।

—জগ আর গেলাস অদৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ?

পরিহার বললেন, আমিও খুঁজেছিলাম, পাইনি। তাইতো একজিবিট হিসাবে গেলাদ আকালতে উপস্থিত করা যায়নি। ঐ গেলানেই কিছুই সঙ্গে বার্ককিউরিক

ক্লেয়াইট মিশিয়ে লোকেশকে খাওয়ানো হয়েছিল। হত্যাকারী ধাঁধা সৃষ্টি করার জন্য এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় গেলাস সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে—কিন্তু জগ—

—জগ-মানে ?

—জগটা সে সঙ্গে করে নিয়ে গেল কেন ?

—ঐ যে বললাম, ধাঁধা বা জটিলতা সৃষ্টি করার জন্য গেলাসটার সঙ্গে জগও নিয়ে গেছে। জল বোধহয় বাথরুমে ফেলে দিয়েছিল।

—হতে পারে আবার নাও পারে। মিঃ ম্যানেজার, অন্য কোন ঘরে ছুটো জগের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল ?

—না, স্যার।

—আপনাদের জঞ্জাল ফেলার জায়গা কোথায় ?

—ফায়ারস্কেপ একতলায় যেখানে শেষ হয়েছে তার পাশে। ওখানে কোন বোর্ডারের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

—হঁ। আমাদের কাজ শেষ হয়েছে। ঘর বন্ধ করুন এবার।

২১৬ নম্বর থেকে গেরিয়ে আসার পর পরিহার বিদায় নিলেন। একটা এনকোয়ারিতে যেতে হবে। ঐ ফ্লোরের বেয়ারা কবিত্তরেই ছিল। তাকে দু কাপ কফি আনতে বলে বাসব ও শৈবাল নিজেদের ঘরে চলে গেল। এয়ারকুলার চালিয়ে দিয়ে দুজনে বসল সোফায়।

—কি বুঝলে ডাক্তার ?

শৈবাল বলল, আমি ভাই এইটুকু বুঝেছি, হারিয়ে যাওয়া জগটার ব্যাপারে তুমি ভারী চিন্তিত হয়ে পড়েছো।

—একজ্যাঙ্কিলি। হত্যাকারী জগটা নিয়ে গেল কেন ? আর নিয়ে গেলই বা কিভাবে ? গেলাস পকেটে নিয়ে যাওয়া যায়। জগ তো পকেটে ঢুকবে না। হাতে করে নিয়ে যেতে হবে। যে কোন লোকের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সে কি ভাবে কাজ গুছিয়েছিল আমার জানতেই হবে।

—কেন নিয়ে গিয়েছিল বলতে পারবো না। তবে কিভাবে নিয়ে গিয়েছিল তা আন্দাজ করতে পারি।

—কিভাবে ?

—হাতে করেই নিয়ে গিয়েছিল। রাত তখন গভীর, কবিত্তরে কাকর থাকার সম্ভাবনা নেই। কাজেই অহুবিধা কোথায় ?

—মাটখাট বেঁধে যে কাজ করেছে, তার পক্ষে সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে এত

বড় রিক্স নেওয়া কি সম্ভব ? না, ডাক্তার এত সরল পথ ধরে ব্যাপারটা এগোয়নি ।
নৃস্ব একটা চাল আছেই । আমরা ধরতে পারছি না আলাদা কথা ।

কফি এসে পড়ল ।

পেরালা তুলে নিল হুজনে ।

চিন্তার বেডাজালের মধ্যে হুজনেই এখন বন্দী । মিনিট কয়েক কেটেছে সব—
কফিও শেষ হয়নি, ম্যানেজার দেখা দিলেন । এক্সচেঞ্জের রেজিস্টার সঙ্গে করে
এনেছেন । তাঁকে ইঙ্গিতে বসতে বলে বাসব রেজিস্টারটা হাতে নিল । পাভা
ওলটাতে ওলটাতে পৌঁছল ১২ই জাচয়ারীতে । প্রতি লাইনে সারিবদ্ধভাবে লেখা
রয়েছে, কোন্ নম্বর বা কোন্ রুম থেকে কে কাকে ফোন করেছে । কাজেই
প্রয়োজনীয় লাইনে পৌঁছতে বাসবের অহুবিধা হল না । লেখা রয়েছে—জেনারেল
বুথ থেকে সকাল সাতটা পয়ত্রিশ মিনিটে ২৩০ নম্বর ঘরে কানেকশন দেওয়া হয়েছে ।

বাসব মুখ তুলল ।

—জেনারেল বুথ মানে—

—নীচে অফিস রুমের পাশে—ম্যানেজার বললেন, প্রাইউড আর কাচে ঘেঁষা
ঘরে ফোনের ব্যবস্থা আছে । অনেক সময় বোর্ডাররা ঐ-জেনারেল বুথ থেকে কারুর
সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করেন ।

—বুথলাম । আর এও বুঝতে অহুবিধা হচ্ছে না, সকাল সাতটা পয়ত্রিশ
মিনিটে কেউ কাউকে জেনারেল বুথ থেকে ফোন করতে দেখেনি । কারণ আপনারা
তখন মৃত লোকেশ ট্যাগুনকে নিয়ে ব্যস্ত । ধন্যবাদ ।

বাসব রেজিস্টার ফিরিয়ে দিল ।

ম্যানেজার আর কিছু না বলে বিদায় নিলেন ।

বাসব শৈবালের দিকে তাকিয়ে মুহূ হাসল ।

—আমার আন্দাজ মিথ্যা নয় দেখলে তো ? এত কাঁচা কাজ সে করবে না ।
দেখা যাচ্ছে, আমাদের হত্যাকারীর মগজ খুবই পরিষ্কার ।

—লোকটাকে ধরা কঠিন হবে কি বল ?

—কঠিন শব্দটা আমার অভিধানে নেই তা তুমি জানো ডাক্তার । ভোগাবে ।
তা আর কি করা যাচ্ছে । প্রাথমিক কাজগুলো কালই শেষ হয়ে যাবে । তার পর
এগুবার প্ল্যান ছকে নেবো ।

আলোচনা বেশী দূর গড়াল না । ঋতু আর কুশল এসে উপস্থিত হল । প্রাথমিক
কথাবার্তার পর কুশল জানতে চাইল, ওদের এখানে কোনরকম অহুবিধা হচ্ছে
কিনা । বাসব জানিয়ে দিল চমৎকার আছে হুজনে ।

ঋতু বলল, আপনার কথা মত কাজ করেছি।

—কোন কাজ বলুন তো ?

—দাদা ও মাধুরদের এখানে আসতে লিখেছি। একথাও লিখেছি, না এলে আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্রজবাবু নিজের হাতে ঠুঁদের চিঠি দিয়েছেন।

—চমৎকার ! ঠুঁরা আসছেন ?

—আজই আসবার কথা।

—কুশলবাবু—

বাসবের ডাকে কুশল মুখ তুলল।

—আদিত্য নোমকে আমার দরকার হবে।

—উনি কিন্তু এ ব্যাপারের কিছুই জানেন না। সেদিন আমাদের মত আটকে পড়ে হোটেলের উপস্থিত ছিলেন এই পর্যন্ত।

—আমি জানি। তবু একবার কথা বলতে চাই। কিভাবে ঠুঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে ?

—মিঃ সোম প্রত্যেক মাসেই পাটনা আসেন। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি, উনি এখন এখানে আছেন কিনা কিংবা কবে আসছেন।

—বেশ। মিসেস ব্যানার্জী এবার আপনাকে গোটা কয়েক প্রদ্ব কববো ?

—বলুন ?

ঋতু নড়েচড়ে বসলো।

বাসব মিস্ত্রিসারভরা পাইপ হাতে তুলে নিয়ে বলল, এই হোটেলের ২১৬ নম্বর ধরের ভূগোল আপনার মনে আছে ?

—ভূগোল ! ও, হ্যাঁ—মনে আছে।

—ঘরে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা ছিল ?

—ছিল। খাটের বা ধারে একটা স্টিলের ব্যাকের উপর জগ আর গেলাস রাখা ছিল।

—জগের সাইজ কেমন ?

—বেশ বড় সাইজের ঢাকনা দেওয়া স্টেনলেস স্টিলের।

—আপনি একবারও জল খেয়েছিলেন ?

—না।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, এদিকটা একরকম হল। এবার অন্য ধরনের একটা প্রদ্ব করছি। মাধুর সাহাব মারা যাবার পর প্রার্থী নিয়ে দেওরদেব সঙ্গে

কোনরকম গোলমাল হয়েছিল ?

—না। গোলমালের কোন সূযোগও ছিল না।

—কি রকম ?

—মাথুর সাহাব আমার নামে উইল করেছিলেন। উইলে এমন চমৎকার ব্যবস্থা ছিল যার দরুন কোন ঝামেলায় পড়তে হয়নি।

—উইল ! একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি উইল করে বসলেন কি ভাবে ?

—অস্থখে পড়ার কয়েকদিন পরেই উনি বুঝে নিয়েছিলেন বাঁচবেন না। পরে যাতে আমি অস্থবিধায় না পড়ি তাই বাড়িতে রেজিস্ট্রার ডাকিয়ে উইল রেজিস্ট্রি করিয়ে নিয়েছিলেন। উইলের এক এক কপি বিনোদবাবু আর প্রমোদবাবুকে দেওয়া হয়েছিল।

—আপনার বাপের বাড়ির লোকরা উইল দেখেছিল ?

—হ্যাঁ।

—আমিও দেখতে চাই।

ঋতু কিন্তু কিন্তু ভঙ্গীতে বলল, এখানে তো নেই। কলকাতায় ব্যাকের লকারে রাখা আছে। আপনি বললে নিয়ে আসতে পারি গিয়ে।

—কাজটা বিরক্তিকর বুঝি। কাল বলবো।

—উইলের বয়ান যদি জানতে চান, বলতে পারি।

—প্রয়োজন দেখা দিলে আমি উইল খুঁটিয়ে পড়াটাই পছন্দ করবো। আপনাদের দুজনের মধ্যে নিশ্চয় এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে ? কাউকে পরেন্ট করতে পেরেছেন ?

—না। আমরা একেবারেই বুঝতে পারিনি কাজটা কে করেছে।

—আমি অবশ্য ও নিয়ে চিন্তা এখন করছি না। আমার ভাবনার বিষয় হল, খুন আপনার ঘরে হল কেন ?

ঋতু কি বলবে ভেবে পেল না।

বাসব আবার বলল, ঐ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেই আর সমস্ত কিছু জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। কুশলবাবু আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই, আপনি লোকেশ ট্যাগুন খুন হবার আগে ২১৬ নম্বর ঘরে একবারও গিয়েছিলেন ?

—না। ঋতুর সঙ্গে দেখা হবার পর বিপন্ন মানসিক অবস্থা নিয়ে নিজের ঘরেই ছিলাম।

—বললেন ভাল। ধরুন, সকলের চোখ বাঁচিয়ে পরের ঘর থেকে একটা বড় সাইজের জগ আপনাকে আনতে হবে। কিভাবে আনবেন ?

কুশল বিস্মিত গলায় বলল, জগ চুরি করবো ? কেন ?

—যদির কথা বলছি। জগটা আনবেন কিভাবে ?

—খুব সতর্ক ভাবে আনবো।

—পরের চোখে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে কিম্বা।

—তা অবশ্য থাকছে।

—মিসেস ব্যানাজী, আপনি কি করবেন ?

মুখে হাসি টেনে ঋতু বলল, জানি না এই প্রশ্ন কেন করছেন। আমি হলে জগটাকে শাড়ির মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যাবো।

বাসব নড়েচড়ে বসলো। কয়েক সেকেন্ড এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ঋতুর মুখের দিকে। ওর দৃষ্টিতে যেন কিসের আলো। শৈবাল বুঝলো, কোন একটা ব্যাপারে ও ভারী স্বস্তিবোধ করছে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে এবার বাসব বলল, আপনার উদ্ভ্র আমার খুব কাছে লাগবে।

ঋতুর অবাক হওয়া স্বাভাবিক।

—কি এমন বললাম যাতে—

—যা বললেন তা আমার আগেই মনে পড়া উচিত ছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার ই সম্ভাবনার কথা আমার মনেই পড়েনি! যা হোক, আপনাদের সময় আর নষ্ট করবো না। কাল দেখা হচ্ছে—

শুভরাত্রি জানিয়ে, অবাক ভাব নিয়েই ঋতু ও কুশল বিদায় নিল।

ভাগ্যক্রমে আদিত্য সোম অফিসের কাছে পাটনাতেই ছিলেন। কুশল খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো উনি “আনন্দলোক” হোটেলে যথানিয়মে উঠেছেন। সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে বাসবকে সংবাদ দেওয়া হল। বেলা দশটা আন্দাজ সময় বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছল ‘আনন্দলোক’-এ। কুশল ওখানেই ছিল।

মহাসমাদরে ওদের বদালেন আদিত্য সোম।

বললেন হাসি মুখে, আমাকে আপনার মত বিখ্যাত ব্যক্তির যে কোনদিন প্রয়োজন হবে আমি ভাবতে পারিনি। তবে এই ব্যাপারে আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারবো বলে মনে হয় না।

—আমারও তাই মনে হয়—বাসব বলল, তবে সংশ্লিষ্ট সকলকে বাজিয়ে দেখা তো দরকার। গোটা কয়েক প্রশ্ন করবো, এই আর কি।

—বেশ তো। বলুন ?

—১২ই জানুয়ারী আপনি কখন লোকেশ ট্যাঙ্কের মৃত্যুংবাধ পেলে ?

—সকাল আটটা আন্দাজ সময় ।

—কে সংবাদ দিল আপনাকে ?

—বেয়্যার! রামনরেশ । আমি বাথরুম থেকে বেরিয়েই ওকে দেখতে পেলাম ।
তখনই—

—আপনি বাথরুম থেকে বেরিয়ে রামনরেশকে কি অবস্থায় দেখলেন ?

—কি অবস্থায়—একটু ভেবে নিয়ে আদিত্য সোম বললেন, যতদূর মনে পড়ছে
সে কারুর সঙ্গে কোনো কথা বলছিল । আমাকে দেখেই ব্রিসিভার নামিয়ে রাখল ।

—তারপর ?

—আমাকে বলল দুর্ঘটনার কথা ।

—কার সঙ্গে ফোনে কথা বলছিল আপনি জানতে চেয়েছিলেন ?

—না । খুনের ব্যাপারটা জানার পর আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম । সমझ
নষ্ট না করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম ।

বাসব বলল, এহ তো গেল ১২ই জানুয়ারীর কথা । এবার কয়েক ঘণ্টা পিছিয়ে
পড়া যাক । ১১ই জানুয়ারী রাত্রে কটায় আপনি নিজের ঘরে যান ?

—আমি আর কুশলবাবু একই সঙ্গে ডিনার করে যে যার নিজের ঘরে চলে
যাই । তখন সাড়ে নটা বেজে গেছে ।

—রাত্রে বোধ হয় ঘর থেকে আর বাইরে আসেননি ?

—একবার আসতে হয়েছিল ।

—কত রাত্রে ?

—সাড়ে এগারটা আন্দাজ ।

বাসব নড়েচড়ে বসলো ।

—ঐ অসময়ে ঘরের বাইরে এলেন কেন ?

—আমার সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল । বেল বাজালাম কয়েকবার । বেয়্যার!
এল না । অগত্যা তখন নিজেই বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে । নীচে নেমে গিয়ে
কাউন্টার থেকে সিগারেট নিয়ে এলাম ।

—যাবার সময় বা আসবার সময় করিডরে কাউকে দেখেছিলেন ?

—কাউকে ?

আদিত্য সোম জ্র কুঁচকে কয়েক সেকেন্ডে ভাবলেন ।

—একজনকে দেখেছিলাম ঘর ঢুকে যেতে ।

—কত নম্বর ঘরে ?

—নম্বর বলতে পারবো না । আমি লক্ষ্য করিনি ।

বাবল বলল, এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করছি। ফ্লোর চার্ট আমি দেখেছি। কবিত্বের একধারে আছে, ২০১ থেকে ২১৫ নম্বর ঘর—অন্ত ধারে ২১৬ নম্বর থেকে ২৩০ নম্বর ঘর। কুশলবাবুর ঘর কত নম্বর আপনি জানতেন?

—জানতাম।

—আপনি যখন নিজের ঘর থেকে বেরলেন তখন কুশলবাবুর ঘর আপনার বাঁ দিকে পদ্ম না, ডান দিকে পড়ল?

—ডান দিকে।

—এবার বলুন সেই লোকটা বাঁ ধারে গোন ঘরে ঢুকে ছিল, না ডান ধারের কোন ঘরে?

আদিত্য সোম চিন্তিত গলায় বললেন, বাঁ ধারের কোন ঘরে।

—অর্থাৎ আপনি যে ধারে ছলেন, লোকটা সেই ধারের কোন ঘরে ঢুকেছিল। এবার বলুন, আপনার ঘরের কটা ঘরের পর সেই ঘর?

—কটা ঘরের পর—

—হ্যাঁ। ভাল করে ভেবে বলুন।

—যতদূর মনে হচ্ছে, তিনটে বা চারটে ঘরের পরের ঘরে সেই লোকটা ঢুকেছিল।

—তার মানে ২১৬ বা ২২৫ নম্বর ঘর। কুশলবাবু—

কুশল একমনে প্রশ্ন-উত্তর শুনাচ্ছিল। ডাকে চটকা ভাঙল।

—বলুন?

—ঐ দুই ঘরের বোর্ডার কে কে ছিল বলতে পারেন?

—আমি বলতে পারবো না। ঋতু কোন ঘরে ছিল আমি শুধু তাই জানতাম।

—অন্য জেনে নেওয়া খুব কঠিন হবে না। এয়ারলাইন্স হোটেলের ম্যানেজার রেজিস্টার দেখে বলে দিতে পারবেন। মিঃ সোম, এবার বলুন, যে লোকটা ঘরে ঢুকে গিয়েছিল সে কি আপনার চেনা লোক?

সোম বললেন, কুশলবাবু ছাড়া ওখানে আমার আর কোন চেনা লোক ছিল না। তাছাড়া লোকটার মুখ আমি দেখতে পাইনি। তার পিছন দিকটাই আমার নজরে পড়েছিল।

—সাম্রপোশাকের আন্দাজ নিশ্চয় দিতে পারবেন?

—একই রংয়ের পাজামা এবং শার্ট পরে ছিল লোকটা যতদূর মনে পড়ছে আমার।

—অর্থাৎ স্লিপিং সুট। এবার মনের উপর একটু জোর দিয়ে বলুন, স্লিপিং

হুটের রং কি ছিল ?

আদিত্য সোম ভাবতে লাগলেন ।

বললেন শেষে, আমি খুব নিশ্চিত নই । পোশাক ছাই বা প্লেট রংয়ের ছিল বোধ হয় ।

—ধন্যবাদ । আপনার সঙ্গে কথা বলে আমার কিছুটা উপকারই হল বলা চলে । এবার উঠবো ।

—উঠবেন কি রকম ? ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা আছে । হুইস্কি বা জিন কিছু একট, পছন্দ করুন ।

মুখে হাসি টেনে বাসব বলল, কমির ব্যবস্থা করুন । বেশ মানানসই হবে । ভাতার, তুমি কি বল ?

পরের দিন সকালে, রাবেশ, বিনোদ এবং প্রমোদকে সঙ্গে নিয়ে ব্রজবাবু দেখা দিলেন । আগের দিন রাত্রে তিনজন পার্টিনায় এসেছেন । ঋতুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেও সফল হলেন না । তখন অনিচ্ছুক ব্রজবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বাসবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ।

বাসব ব্রজবাবুকে যেতে বলে তিনজনকে বসালো ।

বিনোদ বললেন, এ কি ধরনের জুলুম মশাই ? আমাদের এই ভাবে এখানে আনা হল ! বৌদি কোর্ট থেকে ছাড়া পেয়ে গেছেন, ব্যাপারটা মিটে গেছে । আবার কি ?

বাসব নিলিগ্ন গলায় বলল, ব্যাপারটা মিটলো কোথায় ? হত্যাকারী কে জানা যায়নি ।

—তাতে মহাভারত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়নি । আদালতে রায় হয়ে গেছে, আর খোঁচাখুঁচি করে লাভ কি ?

—আপনার কথা শুনে সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি । আমার মজেল যে ইনিসিয়েটিভ নিয়েছেন তা আপনার জেনে নেওয়া উচিত ছিল । উপরন্তু আপনি অসহযোগিতার ভাব দেখাচ্ছেন ? লোকেশ ট্যাঙন আপনার স্ত্রীর ভাই ছিলেন । তাঁর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করবার নৈতিক দায়িত্ব তো আপনারই দ্বিচক্ষে বৈশী ।

বিনোদ কিছু বলতে গিয়েও বললেন না ।

বাসব আবার বলল, আপনারা আমার সম্পর্কে বড়টুকু কি জানেন তা নিজে আমার কোন মাথাব্যথা নেই । বেসরকারী তদন্তের উপর আপনাদের আস্থা আছে কি নেই তাও আমার কাছে গোপন প্রশ্ন । তবে, আমি যে সমস্ত প্রশ্ন করবো:

তার সঠিক উত্তর তিনজনই দেবেন। কোন রকম অসহযোগিতার চেষ্টা করলে, ডি. আই. জি. সি. আই. ডি.'র সামনে উপস্থিত হতে হবে।

রাকেশ বলল, খেঁটন করার দরকার নেই। একবার পুলিশকে, দ্বিতীয়বার আদালতে যা বলবার বলেছি। এই তৃতীয় বারেও আমি তৈরী আছি। কি জানতে চান বলুন?

—ধন্যবাদ। আপনাদের তিনজনের সামনেই তিনজনকে প্রেরণ করবো। রাকেশ-বনু, এয়ারলাইন্স হোটেলের কত নম্বর ঘরে আপনি ছিলেন?

—২১০ নম্বর ঘরে।

—পরে এসেও এত কম নম্বরের ঘর পেলেন কি ভাবে?

—বলতে পারবো না। ম্যানেজার ঐ ঘরই আমার জন্য অ্যালাট করেছিলেন। ১০ নম্বর অন্তত। হয়তো এই কারণেই ঘরটা খালি ছিল।

—হতে পারে। বোনের সঙ্গে দেখা করার পর আপনি কি করলেন? নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন?

—না। বিনোদবাবুর ঘরে গিয়েছিলাম। মিনিট পনেরো ছিলাম ওখানে। তারপর নিজের ঘরে শুতে চলে যাই।

—ঘরে আর কে কে ছিল?

—বিনোদবাবু ছাড়া প্রমোদবাবু ছিলেন। লোকেশও ছিল।

—কি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল আপনাদের মধ্যে?

—ঋতুর বিষয়ে নিয়ে। শুকে সহজে রাজী কানো যাবে না সে সম্পর্কে আমরা এফমত হয়ে ছলাম।

—একজন স্বাধীন, ম্যাচিওর্ড লেডিকে নিয়ে—বিয়ে—বিয়ে করে অস্থির করে তোলায় অর্থ কি? বিশেষ নিজের ছোট বোনকে এই ধরনের প্রস্তাব দেওয়াটা কি শোভনীয়?

গম্ভীর মুখে রাকেশ বলল, ব্যক্তিগত ব্যাপার টেনে আনছেন কেন? ঋতুর ভালর দিক চেয়েই আমরা পরিকল্পনাটা কবেছিলাম।

—উনি কিন্তু বৃশল ব্যানার্জীকে বিয়ে করে বুঝিয়ে দিয়েছেন ওঁর ভাল কিসে হবে। থাক ওকথা। আপনার তো কারবার আছে। কিসের কারবার বলুন তো?

—এলাহাবাদের জর্জটাউন অঞ্চলে আমার বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে। এছাড়া পার্টনার পার্টনারশিপে প্লাইউডের ব্যবসা করি।

—সেদিন বিনোদবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তোমার হবার আগে একবারও বেরিয়েছিলেন ঘর থেকে ?

—না।

—আপনি কি পরে শুয়েছিলেন সে রাতে ?

বিস্মিত গলায় রাকেশ বলল, অদ্ভুত প্রশ্ন আপনার। কোট খুলে রেখে, প্যান্ট আর শার্ট পরে শুয়েছিলাম। সঙ্গে তো আমার কিছু ছিল না।

—ঠিকই তো। আপনি খালি হাতে হোটেলের পৌছেছিলেন। এবারের প্রশ্নটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্রয়ভীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে আপনার বোন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। লোকেশ ট্যাঙনকে অস্ত্র কেউ খুন করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেওয়া যায় এ-সম্পর্কে আপনি চিন্তা ভাবনা করেছেন। আপনার ধারণায় হত্যাকারী কে হতে পারে ?

—আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করেও বুঝতে পারিনি কে এই কাজ করেছে। তবে—

—বলুন ?

—লোকেশ ড্রিং করতো। তার গেলাসে নিশ্চয় কেউ মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশিয়ে দিয়েছিল। ঋতুর দুর্ভাগ্য যে, লোকটা তার ঘরে গিয়ে মারা গেল।

তীক্ষ্ণ গলায় বিনোদ বলল, কি য-তা বলছেন ? আমি ঐ সাংঘাতিক জিনিসটা লোকেশের গেলাসে মিশিয়ে দিয়েছি ?

—আমি সে কথা বলিনি।

—প্রকারান্তরে তাই বলেছেন। লোকেশকে খুন করার আমার কি স্বার্থ থাকতে পারে ? রাকেশবাবু, আপনার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার আশা করিনি।

রাকেশ কিছু বলতে যাবার আগেই বাসব বলল, অহেতুক তর্কবিতর্কে গিয়ে লাভ নেই। আমরা যাতে সমস্তার কুলে ঠাণ্ডা মাথায় পৌছতে পারি সেই চেষ্টাই দেখবো। বলুন তো, ড্রিংয়ের ব্যাপারটা কি ?

বিনোদ বললেন, লোকেশ হইকির ভারী ভক্ত ছিল। সেদিনকার জল-হাওয়া ড্রিং করার পক্ষে বেশ অল্পকূল মনে হয়েছিল। আমরা ড্রিং করতে করতে গল্পগুজব করছিলাম। ঐ সময় রাকেশবাবু আমার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হন। উনি নিজেও ড্রিং করেছিলেন। অথচ এখন তার অস্ত্র অর্থ করছেন !

—লোকেশ কি খুব বেশী ড্রিং করে ফেলেছিল ?

—কম করেও পাঁচ পেগ খেয়েছিল।

—কোর্ট-কাছারি তো মিটে গেছে। এবার সত্যি কথা বলুন, আপনারা কি বিষয়ের ব্যাপারে লোকেশকে উত্তেজিত করেছিলেন তখন ?

বিনোদ ইতস্ততঃ করে বলল, আমি কিছুটা বিরক্ত হয়েই বলেছিলাম, আমরা তো চেষ্টা করছি, তোমার এত সাহসের অভাব কেন? তুমি কেন সরাসরি বৌদির সঙ্গে কথা বলছো না। লোকেশ আমার কথায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।

—তারপর?

—তারপর...মানে...

এতক্ষণ পরে প্রমোদ কথা বলল।

—এখন আর হে জিটেড করে গাভ কি? যা হয়েছিল বলে দাও। এই ধরনের ছেলেমানুষ্যেতে আমার একেবারেই সাহস ছিল না।

বিনোদ বলল, পুলিশকে ইচ্ছে করেই আমরা কথাটা বলিনি। ভেবেছিলাম, হয়তো আমরাই বিপদে পড়ে যাবো। ব্যাপারটা হল, নিজেকে সাহসী প্রতিপন্ন করার জন্য লোকেশ আমার ঘর থেকে বেরিয়ে বৌদির ঘরে গিয়েছিল পরিকার ভাবে কথা বলে নিতে।

—তখন কটা?

বাসবের প্রাঙ্গণ উত্তরে রাকেশ বলল, আন্দাজ সাড়ে দশটা।

—এই ব্যাপারটা চেপে যাওয়ার দরুন আদালতে কত মিথ্যার আশ্রয় আপনারা নেন নিতে হয়েছে এটার ভেবে দেখুন। যাহোক, ২০ নম্বর ঘরে যে ভদ্রলোক সেদিন ছিলেন তাঁকে আপনারা বেউ চেনেন?

প্রমোদ প্রশ্ন করল, কি নাম ভদ্রলোকের?

—আদিত্য শোম।

—আমি চিনি না।

বাকী দুজনও অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

—প্রমোদবাবু, আপনি সেদিন কত নম্বর ঘরে ছিলেন?

—২২১ নম্বর।

—সেদিন রাতে শোবার সময় আপনি কি পোশাক বদলে ছিলেন?

—হ্যাঁ। লুঙ্গি আর পুরোহাতা পশমের গেঞ্জি পরেছিলাম।

—বিনোদবাবু, আপনিও কি পোশাক পাল্টেছিলেন?

বিনোদ বলল, স্টুট পরে তো শোওয়া যায় না।

—বটেই তো। কি পরেছিলেন?

—লুঙ্গি আর ক্রানেলের সার্ট।

বিস্মিত গলায় প্রমোদ বলল, তুমি তো লুঙ্গি পছন্দ করো না। হঠাৎ সেদিন কি ভাবে—

—পরেছিলাম। রাত কাটাবার পক্ষে লুজি ভারি কমফোর্টেবল ব্যবহার করেই বুঝেছি। তুমি ঠিকই বলতে।

বাসব বলল, মার কথাটা এই, সে রাতে আপনাতা কেউই স্লিপিং হুট পড়েননি। আমার হিসাবে ভুল ছিল দেখা যাচ্ছে।

প্রমোদ বলল, সে রাতে আমরা কেউ হুট ব্যবহার করেছিলাম কি না তা জানবার জন্ত এত আগ্রহ প্রকাশ করছেন কেন?

—কারণ একটা আছে।

—আমাদের বোধ হয় বলা যাবে না?

—যাবে না কেন? ঐ যে, ভদ্রলোকের নাম করলাম, আদিত্য সোম। উনি সে রাতে একজন স্লিপিং হুট পরা লোককে একটা ঘরে ঢুকতে দেখেছিলেন। আজ এই পর্বন্ত। আপনাদের আর অপেক্ষা করাবো না। সহযোগিতার জন্ত ধন্যবাদ। তবে একটা কথা, আজই চলে যাবেন না। কয়েকদিন আপনারা পাটনায় থেকে গেলে ভাল হয়। আচ্ছা—

আর কথা না বাড়িয়ে তিনজনে বিদায় নিলেন।

বাসব সোফায় হেলে বসে পাইপ ধরাল। চিন্তামুক্ত মুখে ধোঁয়া ছেড়ে চলল একমনে। শৈবাল এতক্ষণ খাটের উপর আধশোওয়া অবস্থায় ছিল। এবার উঠে গিয়ে কমসার্ভিসকে ফোন করল। পাঠিয়ে দিতে বলল দু কাপ কফি।

বাসব দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরিয়ে নিয়ে বলল, কেমন শুনলে ডাক্তার?

—মন্দ নয়। তবে তোমার হিসাবের ভুলটা ধরতে পাবলাম না।

—কথাটা ভদের সামনে ইচ্ছে করেই বলেছিলাম। আমার হিসাবে কোন ভুল নেই। প্রমোদ মাথুরের বেকাম কথাতেই বুঝতে পারা গেছে, লুজি নয়, বিনোদ মাথুর স্লিপিং হুট পরেই ছিল।

—আদিত্য সোমের আন্ডাজ তাহলে স্ট্রিক লক্ষ্যে পৌঁছেছে। বিনোদ মাথুরের ঘরের নম্বর ছিল ২১৬। কিন্তু ঐ অসময়ে উনি ফিরছিলেন কোথা থেকে?

—আমার হিসাবকে যদি আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাই, তাহলে বলতে হবে, উনি ঋতু মাথুরের ঘর থেকে ফিরছিলেন?

—তুমি বলতে চাইছো—

—এখন আমি আর কিছু বলতে চাই না। তোমাকে একটা প্রস্তাব করবো তাবছি।

—জটিল না হলে আমি নিশ্চয় উত্তর দেব।

—তুমি অবশ্য মদ খাও না। লিকারের প্রভাব সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা না থাকায়ই কথা। তবু প্রস্তাব করছি, ডাক্তার হিসাবে যদি কিছু জানা থাকে। বেশি

ড্রিক করতে যারা অভ্যস্ত তারা মাতাল হয় না ঠিকই, তবে কোন অস্বস্তিবোধ নিশ্চয়
বেশা দেয়। সেটা কি? অল্প কিছুই প্রয়োজন সে কি তখন অনুভব করে?

চিন্তিত গলায় শৈবাল বলল, আরো মদ খাবার তাগিদ তার মনে তখন থাকে।
তবে তোমার মনে পড়ে বেশ কয়েক বছর আগে তুমি যখন পাইপ ধরলে তখন
আমাকে হাইকি বা জিন কিছু একটা ধরতে বলেছিলে?

—বলেছিলাম। তোমাকে তো মদ ধরানো গেল না।

—তখন আমরা দুটা বই কিনে এনেছিলাম পার্ক স্ট্রিটের এক দোকান থেকে
“হাউট-ইউজ পাইপ” আর “লিকার হ্যাবিট”। দুটোই বিশ্ববিখ্যাত বই।
“লিকার হ্যাবিট” পড়ে জানা গেছে একই ধরনের ওয়াচট প্রত্যেক ডেড ড্রক
লোকের হবে তার কোন মানে নেই। কারুর ঘুম পেয়ে যায়। কেউ আবোলতাবোল
বকতে থাকে। যাদের নার্ভ স্ট্রিং তাদের মধ্যে অনেকে পায়চারী করতে থাকে,
অনুশোচনা আসে, কারুর আবার তেষ্ঠা পায়—

—কি বললে? তেষ্ঠা পায়?

—জল খাবার ইচ্ছে হয় আর কি।

—ব্রেভো ডাক্তার। তোমার এই কথাতে যে আমার কি উপকার হল তোমাকে
বলে বোঝাতে পারবো না। মোটামুটি ছবিটা এখন আমি দেখতে পাচ্ছি।

বিস্মিত গলায় শৈবাল বলল, অবাক কাণ্ড। কোন কোন ডাক্তারের তেষ্ঠা পায়,
এতে তোমার এত উচ্ছ্বাসিত হবার কারণ কি?

—যথেষ্ট কারণ আছে ডাক্তার। খুনের মোটিভ আমি ধরে ফেলেছি। আমার
মকেলের ঘর থেকে জগটা কেন সারিয়ে নেওয়া হল এখন বুঝতে আর অসুবিধা
হচ্ছে না।

এই সময় বেরারা এসে দু কাপ কফি দ্বিগ্নে গেল।

বাসব কাপ তুলে নিয়ে আবার বলল, গেলানোর অসুপাশ্চাত্য মনে নেওয়া যাক।
পুলিসকে বিভ্রান্ত করার জগা এরকম করা হয়ে থাকে। কিন্তু জগ—? মন ভারি
খুঁতখুঁত করছিল। জগ লোপাট করার কারণ কি? ভাগ্যক্রমে তুমি অজান্তেই
গমস্তার সমাধান করে দিলে।

—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—তুমি বললে না কারুর কারুর বেশি ড্রিক করার পর তেষ্ঠা পায়। লেবেল
এই ক্যাটাগরির। তার তেষ্ঠা পেয়েছিল।

—মেনে নিলাম তেষ্ঠা পেয়েছিল। তার সঙ্গে জগ লোপাটের কি সম্পর্ক?

—অত্যন্ত নিবিড়। এখনও বুঝতে পারছি না, জগের জলেই মারকিউরিক

ক্লোরাইড মেশানো ছিল। তার থেকে জল চেলে খেতে দেওয়া হয়েছিল লোকেশকে। কাজেই জগ আর গেলাস দুটোই সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

—কিন্তু লোকেশ যে ওখানে আসবে, এলেও যে জল থাকে তার তো কোন স্থিরতা ছিল না।

—তোমার অনেক উন্নতি হয়েছে ডাক্তার। সঠিক জায়গায় যা ঘেরেছো। লোকেশকে মারতে গেলে তার ঘরের জগের জলেই মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশিয়ে রাখা উচিত ছিল। আমার মস্তেলের ঘরে ঐ ব্যবস্থা কেন করে রাখ হয়েছিল?

শৈবাল উত্তেজিত ভাবে বলল, তুমি কি বলতে চাইছো, ঋতু মাথুরকে খুন করার পরিকল্পনা ছিল, ঘটনাচক্রে লোকেশ বেঘোরে মারা পড়েছে?

মুখে হাসি টেনে বাসব বলল, আমি ঐ কথাই বলতে চাইছি। উনি কখনও না কখনও জল খেতেন আর মারা পড়তেন। ভালবাসার আকর্ষণে উনি কুশলবাবুর ঘরে চলে যাওয়ায় বৈচে গেলেন। তবে এখানে এবটা বড় প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে।

—কোন প্রশ্ন?

—যদি ধরে নেওয়া যায়, লোকেশ ২১৬ নম্বর ঘরে গিয়ে দেখল, ঋতু নেই। সে অপেক্ষায় রইল। এই সময় ড্রিস্কর জের টেনে তার তেষ্ঠা পেয়ে গেল। জগ থেকে গেলাসে জল চেলে সে খেল এবং মারা পড়তে তার এরপর কয়েক মিনিট মাত্র সময় লাগলো। বড় ধরনের একটা প্রশ্ন এর পরই দেখা দিচ্ছে। জগ আর গেলাস ওখান থেকে অদৃশ্য হল কিভাবে? ঐ দুটো জড় বস্তুর নিশ্চয় পা ছিল না?

—আরো একজন লোক ওখানে উপস্থিত ছিল।

—নিশ্চয় উপস্থিত ছিল। নইলে হিসাব মিলবেই না। হিসাবকে সঠিক ভাবে মেলাতে গেলে কিন্তু আরো কয়েকটা প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের হতে হচ্ছে। দ্বিতীয় লোকটা ওখানে গেল কেন? সে কি জানতো ঋতু ঘরে নেই? ঐ লোকটাই কি আসল কালগ্রিট? তাই যদি হবে, তবে লোকেশকে জল খাওয়ানো কেন বা তাকে জল খেতে বাধা দিল না কেন?

—পরিস্থিতি সহজ হয়ে আস্তে, আস্তে আবার জটিল হয়ে উঠল।

—আরো চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। এফটা পয়েন্ট মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে। দেখি, ঐ পথ ধরে এগুনো যান কিনা।

—পয়েন্টটা কি?

বাসব হাই ভোলায় পর বলল, পরে বলব। বেশ বিকে পেয়ে গেছে ডাক্তার। সুভের এক মেহু ভৈরী করে রুম শার্ভিসকে জানাও।

কুশল রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল—এগারটা চল্লিশ।

কিছুক্ষণ আগে মোকামাকে পিছনে ফেলে এসেছে কোচিন এক্সপ্রেস। ভারী ভাল ট্রেন। কোন কারণে আজই লেট-রান করেছে। আর কোন স্টপেজ নেই।

প্রাস্তীয় স্টেশন হল পাটনা।

কুশল সিগারেট ধরাল।

ঋতু বাথরুমে গিয়েছিল। ফিরে এল এই সময়। বাসবের কথায় ওরা কলকাতা গিয়েছিল। মাথুর সাহাবের উইল লকার থেকে বার করে বিকেনের ট্রেনেই রওয়ানা হয়ে পড়েছে। আর তো কোন কাজ ছিল না কলকাতায়। ভাগ্যক্রমে কোচিন এক্সপ্রেসে রিজার্ভেশন পাওয়া গিয়েছিল।

ঋতু কুশলের গা বেঁধে বসে বলল, আজ সকাল থেকেই দেখছি তুমি একটু গম্ভীর মুডে রয়েছো?

—তুমি কাছে রয়েছো, আর আমি গম্ভীর থাকবো?

—আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না বেশ। বল না, কি হয়েছে?

কুশল ঋতুকে নিজের কাছে টেনে নিল।

—সত্যি কথা বলতে কি কিছুই হয়নি। আমি একটা কথা ভাবছি।

—যা ভাবছো, তা কি আমাকে বলা যায় না?

—তোমাকে বলা যাবে না, এমন কোন কথা আমার থাকতে পারে না। ভেবেছিলাম, তোমার মনোবল হাই বোধহয় এবার পূর্ণ হল। যে রকম ফাঁকিবাজি চলেছে—চাকরি থাকলে হয়।

—সত্যি যদি চাকরি চলে যায় আমি একটা ভাল প্রস্তাব দেবো। তোমার স্বধাদাবোধে যাতে যা না লাগে সেদিকে আমার দৃষ্টি থাকবে মনে রেখো।

—প্রস্তাবটা কি শুনি?

—এখন বলা যাবে না।

—কেন?

ঋতু দু হাত দিয়ে কুশলের গলা জড়িয়ে ধরল, তারপর চাপা গলায় বলল, আগে তোমার চাকরিটা থাক।

কুশল হেসে ফেলল।

—তোমাকে নিয়ে যে কি করবো সময় সময় ভেবে পাইনা। চাকরি না যাওয়া পৰ্ব্বস্ত ঐ-আলোচনা মূলতুবি থাক, কি বল?

ঋতু ওর গালে ঠোঁট ঠেকিয়ে সরে এল।

—তাই থাক। এবার এবটা কাজের কথা বলি। উইলের জেরক্স করিয়ে নিলে

ভাল হত। জেরক্স কপি দিয়ে দিতাম মিঃ ব্যানার্জীকে। আসলটা আমাদের কাছেই থাকতো।

—কাল পাটনায় করিয়ে নেবো। উইল উনি কেন দেখতে চাইছেন বল তো?

—বুঝতে পারছি না। বেঞ্জ, উনি আমাকে বা তোমাকে সন্দেহ করছেন না তো?

—আমাদের সন্দেহ করবেন কেন? আমরাই তো শুঁকে এই কেসে নিমুক্ত করেছি। আমরা হত্যাকারী হলে নিজেদের কবর খুঁড়তে যাব কেন?

—তা ঠিক। তবে—

—খামলে কেন?

দু-বার্খ এন্সি কম্পার্টমেন্ট। ঘাম হবার সম্ভাবনা নেই। তবু ঋতু ঝাঁচল দিয়ে নিজের মুখ মুছে নিল। বিষের পর ওর চেহারার জোলুস অনেকগুণ বেড়ে গেছে। সময় সময় কুশলের মুগ্ধ দৃষ্টি তার মত সপ্রতিভ প্রগাঢ় যৌবনাকেও রাঙিয়ে তোলে।

—জগের ব্যাপারটা বলছিলাম। আমি হলে জগটা শাড়ির মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যেতাম বলতেই মিঃ ব্যানার্জী কি রকম উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল তোমার মনে আছে।

—মনে হচ্ছিল। উনি যেন একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন।

—ব্যাপারটা কি বল তো? এই তদন্তর সঙ্গে একটা জগের কি সম্পর্ক?

—সম্পর্ক আছে নিশ্চয়। তবে একটা কথা তোমায় বলতে পারি, বাসববাবুর হাতে যখন ওদন্তের ভার রয়েছে তখন অপরাধী ধরা পড়বেই।

ঋতু কিছু বলার আগেই দরজায় ঢোকা পড়ল।

দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

কুশল উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই যাদের দেখলো তা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের মত। দরজার ওধারে দাঁড়িয়ে আছে বিনোদ আর প্রমোদ। ঋতুও এগিয়ে এসেছিল। বিরক্তিতে ওর জ্র কুঁচকে উঠেছে।

কঠিন গলায় প্রশ্ন করল, কি চাই আপনাদের?

বিধাজ্ঞানো গলায় বিনোদ বলল, এসময় বিরক্ত করাটা ঠিক হয়নি। আসল কথাটা হল, কাজটা খুব জরুরী।

—পরে কলকাতা বা পাটনায় বললে চলতো না? এই চলন্ত ট্রেনে বিরক্ত করতে এসেছেন। বেঞ্জ, এঁরা কি ভেঁকি জানেন? এই ট্রেনে আমরা যাচ্ছি আর কাকুর তো জানার কথা নয়।

প্রমোদ বলল, আমরাও জানতাম না। গোয়েন্দা ভদ্রলোকের অহুমতি নিয়ে একদিনের জন্য কলকাতা গিয়েছিলাম। হাওড়া স্টেশনেই আপনাকে দেখেছিলাম।

কোনু কামরার আছেন জানি না তো। খোঁজ করতে করতে করিছর দ্বিগ্নে কণ্ঠস্বরকে অনেক বলেবয়ে এখানে এসাম।

ওদের কামরার মধ্যে আহ্বান না করেই ঋতু বলল, আপনাদের বেঁধে আমি মোটেই খুশী হচ্ছি না। যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন।

—কিছু সময় লাগবে। তাছাড়া একান্তে বলতে চাই।

—না। য' বলবার বেগের সামনেই বলতে হবে।

—বৌদি—মানে—

—আমাকে মিসেস ব্যানার্জী বলুন।

বিনোদ বলল, প্রমোদ, কথা বাড়িও না। ব্রজবাবুর মুখে শুনলাম, আপনি নিজের অংশের ব্যবসা বেচে ফেলতে চান?

—ঠিকই শুনেছেন।

—এটা আমাদের পৈতৃক ব্যবসা...মানে...পারিবারিক প্রতিষ্ঠান...

জ্ঞ সোজা না করে ঋতু বলল, আপনাদের পৈতৃক ব্যবসা হতে পারে, আমার নয়। আমি পেয়েছি। এখন স্থির করেছি বেচে দেবো। এতে তো কান্না কিছু বলার থাকতে পারে না।

—আপনি ঠিকই বলছেন। আমরা বলতে এসেছিলাম, আপনার অংশটা কিনে নিতে চাই। ঘরের জিনিস তাহলে ঘরেই থেকে যাবে।

—আপনাদের নিজের অংশ বেচবো কে বলল?

—কেউ বলেনি। আমরা অস্বার্থে নিয়ে এসেছি।

ভীকু গলায় ঋতু বলল, আমি দুঃখিত। বাজারে যে দর উঠবে তার চেয়ে দশ, গুণ বেশী দিতে চাইলেও আমি আপনাদের বেচবো না। আপনারা তো স্বার্থপর। স্বার্থের মুখ চেয়ে সব কিছু করতে পারেন। পারিবারিক প্রতিষ্ঠান কথা তখন তো ভাবেননি—আমাকে ঠেলে দিয়েছিলেন ফাঁসির মঞ্চের দিকে।

বিনোদ কিছু বলতে যাবার আগেই ঋতু ওদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল। ফিরে দাঁড়াল কুশলের দিকে। ওর মুখে উজ্জ্বলের স্বীকৃতি ছেয়ে রয়েছে।

—কি বুঝলে?

কুশল হালকা গলায় বলল, বুঝলাম এইটুকুই, এই রকম একটা স্বেচ্ছা তুমি খুঁজছিলে। ভাগ্যক্রমে ওরাই তোমাকে স্বেচ্ছা করে দিল।

—ঠিক বলেছে। এখন নিজেকে ভারি হালকা লাগছে।

ট্রেনের গতি কমে এসে এই সময়।

কুশল রিস্টওরাচের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, মালপত্র ঠিক করে নেওয়া

যাক। আমরা এসে পড়েছি।

বাসব সকালেই বেরিয়েছিল। মিঃ মেহরার সহযোগিতায় কি একটা কাজ রয়েছে। শৈবাল একাই সোফার আড় হয়ে বসে দৈনিক পত্রের উপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল। নটা আন্দাজ সময় ব্রজবাবু এলেন। হাতে তাঁর স্বর্গীয় মাতৃর সাহেবের উইলের জেরক্স কপি। ঋতু পাঠিয়ে দিয়েছে। এই সঙ্গে বলে পাঠিয়েছে, পরে বাসবের সঙ্গে দেখা করবে।

শৈবাল ব্রজবাবুকে বসালো।

পাটনা সম্পর্কেই দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলতে লাগল। বাসব ফিরে এল আধ ঘণ্টাটাক পরে। গুরু মুখের ভাব বলে দিচ্ছে, উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

ব্রজবাবুকে দেখে খুশী হল।

বসতে বসতে বলল, আমি ভাবছিলাম, আপনাকে ডেকে পাঠাবো। উইল নিয়ে এসেছেন বোধহয়। আপনার ম্যাডাম কোথায়?

ব্রজবাবু উইলের কপি এগিয়ে বললেন, আজ কোন সময় আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলেছেন। অনেক রাতে কাল ফিরেছিলেন। ক্লান্তির জগুই...মানে—

—ঠিক আছে।

বাসব এবার শৈবালের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার বোধহয় এবার রিটায়ার করা উচিত।

শৈবাল অবাক।

—কেন?

—ধারাবাহিক ভাবে কোন কাজ করতে পারছি না। তোমার মনে আছে বোধ হয়, আদিত্য সোমের ঘরে রামনরেশকে কে ফোন করেছিল জানবার জগু হোটেলের এক্সচেঞ্জ রেজিস্টার আনিয়েছিলাম?

—আনিয়েছিলে। কিন্তু জানা যায়নি, রামনরেশকে কে ফোন করেছিল। এতে হয়েছেটা কি?

—হয়েছে ডাক্তার। আমি যে কাজের ধারাবাহিকতা নষ্ট করে ফেলছি এটাই তার উদ্দেশ্য। তুমি বল, আমার কি উচিত ছিল না, সেদিন বা তার আগের দিন কে কাকে ফোন করেছে তাও দেখে নেওয়া।

—বেশ তো। এখন দেখে নাও।

—ঘরে আসবার আগে দেখে নিয়েছি। তবে এই ভাবে চলতে থাকলে কত দিন লাইনে টিকে থাকতে পারবো বল?

ব্রজবাবু অবাক হয়ে ওদের কথা শুনছিলেন।

বাসব এবার ঊঁর দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের আলোচনার মধ্যে পড়ে হিমসিম খাচ্ছেন বোধ হয়? আর সময় নষ্ট করবো না। আচ্ছা ব্রজবাবু, আপনি ফুলপ্যাণ্ট পরেন না?

এই ধরনের প্রশ্নে যে কেউ অবাক হবে।

বিশ্বর মাখানো গলায় ব্রজবাবু বললেন, না স্যার। আমি কখনও ফুলপ্যাণ্ট ব্যবহার করিনি। ধূতি-সার্ট পরেই এতদিন কাটিয়ে দিলাম।

—এগারই জাহ্নয়ারী তো এখানে খুব ঠাণ্ডা ছিল। ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য সেদিন বোধ হয় কোর্ট ব্যবহার করেছিলেন?

—ফুলহাতা সোয়েটার পরেছিলাম। শাল জড়িয়ে নিয়েছিলাম তার উপর।

এই ধরনের প্রশ্ন শুনে শৈবালও অবাক হয়ে গিয়েছিল।

বাসব বলল, একটা সমস্তা মিটল। এবার আসল কথায় আসছি। আপনি পুলিশকে বলেছেন, সেদিন রাত দশটার সময় ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। বিস্ময় না কি খেয়ে ফেলার দরুন সময় ঠিক রাখতে পারেননি। পরে গিয়ে দেখেন ম্যাডাম ঘরে নেই। আপনি তখন নিজের ঘরে ফিরে এসেছিলেন—এই তো?

—হ্যাঁ। ম্যাডাম সময় মেপে কাজ করেন। ভেবেছিলাম পরের দিন আমাকে বকুনি খেতে হবে।

—জগটা কি করলেন?

আকাশ থেকে পড়লেন ব্রজবাবু।

—জগ? কোন্ জগ?

—শুধু জগ নয়, গেলাসও। আপনার ম্যাডামের ঘরে ও ছুটো ছিল। পরে পাওয়া যায়নি।

—আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

বাসব নির্লিপ্ত গলায় বলল, আপনি মিথ্যা কথা বলেছেন। আপনি সবই জানেন। শুধু এই নয়, আরো মিথ্যা কথা বলেছেন।

ব্রজবাবু ককিয়ে উঠলেন, আমি সত্য...মানে...আমি তো...

—গঠিক ভাবে উত্তর দিন। যদি বিপদে পড়তে চান স্বতন্ত্র কথা। সেদিন বিস্ময়ের ঝাঁক কেটে যাবার পরই ম্যাডামের ঘরে যাননি। ফোন করেছিলেন। এই কিছুক্ষণ আগে আমি হোটেলের এক্সচেঞ্জ রেজিস্টার দেখেছি। রেকর্ড বলেছে সেদিন রাত দশটা পয়ত্রিশ মিনিটে আপনি ২১৬ নম্বর ঘরের নম্বর চেয়েছিলেন। এর অর্থ হল, সাড়ে দশটার আগে আপনি ম্যাডামের ঘরে যাননি। এবার সত্যি

কথাটা বলুন ?

ব্রজবাবু কিছু বসতে গিয়ে থামলেন। ঘামে সারা মুখ ভিজ়ে উঠেছে। ভারী নার্ভাস দেখাচ্ছে ওঁকে। পকেট থেকে ক্রমাল বার করে মুখ মুছলেন। হেঁচকি তোলার মত মুদ্রা তাঁর শরীরে দেখা গেল।

বাসব আবার বলল, আপনার ভালর জগ্গই বনছি, অকপটে সব কথা আমার বলুন। নইলে আমাকে পুলিশে খবর পাঠাতে হবে। তখন কিন্তু ঝামেলা আপনাকে জড়িয়ে ফেলবে।

হাত জোড় করে কাঁপা গলায় ব্রজবাবু বললেন, আমি কোন অপরাধ করিনি স্ত্রার। এমন অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলাম—আমার মনে হয়েছিল ম্যাডামকে কেউ মেরে ফেলতে চায়। তাঁর ভালর জগ্গই...মানে...ওঁর অনেক ছুন খেয়েছি স্ত্রার...

—সব কথা খুলে বলুন। সত্যি যদি কোন অপরাধ না করে থাকেন, কথা দ্বিচ্ছি কোন আঁচ আপনার উপর আসতে দেব না।

—ম্যাডাম জানতে পারলে আমাকে ভুল বুঝবেন। বিশ্বাস করুন আমি খুনের ব্যাপারের মধ্যে নেই।

—আমি যখন আছি তখন ম্যাডাম সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারেন। আপনি নির্ভয়ে সমস্ত কিছু বলুন।

—ঘটনাটা আমার চোখের উপর ঘটল স্ত্রার। অথচ লোকেশ ট্যাঙনের জন্ত কিছুই করতে পারলাম না।

—ওভাবে নয়, ঠিক যেভাবে যা যা ঘটেছিল সেইভাবে বলুন। ২১৬ নম্বর ঘরে টেলিফোন করার আগে থেকে আরম্ভ করুন। সঠিকভাবে ব্যাপারটা বুঝতে আমার সুবিধা হবে।

এরপর ব্রজবাবু যা বললেন তার প্রকৃত চিত্র নিম্নরূপ।

খাওয়াদাওয়া সেবে ব্রজবাবু রাত নটার মুখে নিজের ঘরে চলে এলেন। উনি শীতকাতুরে লোক। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বেশ অস্বস্তিবোধ করছেন। জোড়া কবলের তলায় ঢুকে যে ঘুমের রাজ্যে চলে যাবেন তার উপায় নেই। ম্যাডাম দশটার সময় দেখা করতে বলেছেন। আগামীকাল কি সমস্ত করণীর আছে তাই বলবেন।

ব্রজবাবু শুনেছিলেন, অ্যালকহল পেটে গেলে ঠাণ্ডার অহুভব কমে যায়। হুইকি খাবার সাহস হল না। অনভ্যাসের ফোঁটার মাতাল হয়ে পড়তে পারেন। স্থির করলেন, বিয়ার খেতে খেতেই ঘটনাখনেক কাটিয়ে দেবেন। তারপর দেখা করবেন ম্যাডামের সঙ্গে গিয়ে।

নীচে নেমে গিয়ে ব্রজবাবু এক বোতল নর্থপোল সংগ্রহ করে ঘরে ফিরে এলেন।

হু গেলানের সামান্য কিছু বেশী পানীয় থাকে যেতলে। অভ্যাস না থাকায় দরুন যা হয়, চুমুকের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে রাখতে আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়লেন। যখন আচ্ছন্নের ভাব ভাঙল তখন প্রায় সাড়ে দশটা। ভারী নার্ভাস হয়ে পড়লেন ব্রজবাবু।

ম্যাডাম অস্থশাসনহীনতা একেবারে পছন্দ করেন না। কি করা যায়। উনি কি এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন! ভেবেচিন্তে কোন কিছু করারই মনস্থ করলেন। জেগে থাকলে ক্ষমাটমা চেয়ে নেবেন। তারপর যাবেন দেখা করতে। রিসিভার তুলে নিয়ে ২১৬ নম্বর ঘর চাইলেন। যোগাযোগ হল সঙ্গে সঙ্গে। একবার রিং হবার পরই ওধার থেকে গলা পাওয়া গেল।

—হ্যালো—কে কথা বলছেন?

অবাক হয়ে গেলেন ব্রজবাবু। ওধার থেকে ম্যাডামের গলা পাওয়া যায়নি। লাড়া দিয়েছেন একজন পুরুষ। এরকম তো হবার কথা নয়। তবে কি ম্যাডামের পুরনো বন্ধু কুশল ব্যানার্জী ওখানে রয়েছেন? উনি সময় নষ্ট না করে উত্তর দিলেন।

—আমি ব্রজ বর্মন কথা বলছি। দয়া করে ম্যাডামকে লাইনটা দিন —

—আপনার ম্যাডাম ঘরে নেই।

—কোথায় গেছেন বলুন তো?

—আমি তো বলতে পারবো না—আপনি কে কথা বলছেন স্যার—

—লোকেশ—ব্রজবাবু আপনি এখানে আসুন একবার—

—আজ্ঞে আসছি—

ব্রজবাবু হস্তদস্ত হয়ে ২১৬ নম্বর ঘরে এলেন। উনিও চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এত রাতে ম্যাডাম গেলেন কোথায়? আর্কুটকে লোকেশ দোফায় বসেছিল। আঙুলের ফাঁকে জলস্ত নিগারেট।

—স্যার, আপনি এখানে রয়েছেন?

লোকেশ বলল, ঋতু ভাবার সঙ্গে আমার জরুরী কথা ছিল। এসে দেখি ঘরে নেই। কোথায় যেতে পারেন উনি?

—বলতে পারবো না স্যার। উনি আমাকে দশটার সময় ডেকেছিলেন। আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, তাই কোন করেছিলাম।

—একটা সন্দেহ আমার হচ্ছে ব্রজবাবু। আপনার ম্যাডাম তাঁর এলাহাবাদের বন্ধুর কাছে যাননি তো?

ব্রজবাবু বললেন, কি করে বলবো স্যার। আমি তো আবার ব্যাপারী—

—ভারী অজ্ঞায়। একজন উটকো লোকের সঙ্গে তাঁর মত সম্ভ্রান্ত মহিলার এইভাবে মেলামেলনা করা কি ঠিক হচ্ছে?

ব্রজবাবু কি উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না।

লোকেশ আবার বলল, আপনি খোঁজখবর নিয়ে দেখুন কোথায় উনি গেছেন জানা স্বকর।

ব্রজবাবুর লোকেশের সর্দারী ভাল লাগছিল না। উনি বিনোদবাবুর আত্মীয় হতে পারেন, তাতে হয়েছোটা কি? উনি মাংস পদ্রিবারের ঘোঁষ কর্মচারী নন। উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

লোকেশ সোফা থেকে উঠে গিয়ে টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জগ থেকে জল চেলে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে গেলাস শেষ করল। আবার ফিরে এল সোফার কাছে।

—আপনাকে কি বললাম, শুনেছেন?

ব্রজবাবু বললেন, আমি কোথায় খুঁজবো ঠেকে?

—এলাহাবাদের লোকটা কোন্ ঘরে আছে খোঁজ নিন। আপনার ম্যাডাম নিশ্চয় ওখানে আছেন।

—থাকতে পারেন। আমি ওখানে যেতে পারবো না। উপরপাড়া হয়ে কোন কাজ করা ম্যাডাম পছন্দ করেন না।

উত্তেজিতভাবে লোকেশ কিছু বলতে যাচ্ছিল—বলা হল না। হু হাত দিয়ে নিজের বুক চেপে ধরল। শরীরের ঢাল সামলানো সম্ভব হল না। হৃড়মুড়িয়ে পড়ল মাটিতে। গলা চিরে চাপা একটা কাতরানি বেরিয়ে আসছে। শরীর মোচড় খেতে লাগল। তারপর স্থির হয়ে গেল এক সময়।

পুরো ব্যাপারটা ঘটতে মিনিট দুয়েক সময় লেগেছে কিনা সন্দেহ। বিস্ফারিত গোঁথে ব্রজবাবু সমস্ত কিছু দেখলেন। একটা সন্দেহ মনের মধ্যে ঘনিয়ে উঠল। উনি তাড়াতাড়ি বুকে পড়ে লোকেশের দেহ পরীক্ষা করলেন। সন্দেহ মিথ্যা নয়। মারা গেছে লোকেশ ট্যাঙন।

ব্রজবাবুর তখন দিশেহারা অবস্থা। গুঁর বুঝতে অস্ববিধা হয়নি, এটা খুনের ব্যাপার। জগের জলে বিব মেশানো ছিল। হুনিয়া দেবা মাহুয় উনি। এও বুঝলেন, ম্যাডামকে খুন করার জন্ত কেউ এই ব্যবস্থা করে রেখেছিল। দৈবাৎ লোকেশ মারা গেছে।

ভয় আর চিন্তা ব্রজবাবুকে ঘিরে ধরেছে। জগের জলে বিব দেওয়া আছে কেউ জানে না। ম্যাডাম পরে ঐ জল খেতে পারেন। উনি দ্রুত জগটা তুলে নিজে বাথরুমে চলে গেলেন। বেসিনে সমস্ত জল ফেলে দিয়ে ফিরে এলেন আবার।

ঐ জল আর ম্যাডামের পক্ষে পরে খাওয়া সম্ভব হবে না। একটা বিপদ রয়েছে। মৃতদেহ এই ঘরে থাকলে পুলিশ ঠেকেই সন্দেহ করবে। ব্রজবাবু চিন্তা করে দেখলেন,

মৃতদেহ যদি ঘরের বাইরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তবে ভয়ের কিছু থাকে না। অনেক চেষ্টা করেও সুবিধা করতে পারলেন না। দীর্ঘকাল শাস্ত্রবান একটা দেহ তাঁর মত বয়স্ক কিনকিনে লোকের পক্ষে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না।

উনি ভারী ভয় পাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি এ ঘর থেকে চলে যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হল। ম্যাডাম হয়তো রাত্রে আর এ ঘরে আসবে না। কাজেই বিপদে পড়ার সম্ভাবনা কম। তবে জগ আর গেলাস সরিয়ে দিতে হবে। পুলিশ যদি এ দুই পাত্রে বিষের সন্ধান পায় তাহলেই ঝামেলা।

ব্রজবাবু আর সময় নষ্ট করলেন না। জগ আর গেলাস শালের তলায় ঢেকে বেরিয়ে পড়লেন। নিজের ঘরে পৌঁছে যাওয়ার পরও অস্থিস্থি ও আশঙ্কা তাঁকে ঘিরে রইল। অবশ্য করণীয় কাজটা সেরে ফেলতে উনি বিলম্ব করলেন না। জগ আর গেলাস চালান করে দিলেন স্ট্রেকেসের মধ্যে।

ব্রজবাবু বলা শেষ হলে বাসব বলল, আপনি যা কিছু বললেন আশা করি তার মধ্যে ছিটেফোঁটাও বানানো নয় ?

—না স্ত্রার। যা ঘটেছিল তাই বলেছি।

—পরে আপনার ম্যাডামকে ব্যাপারটা কি বলা উচিত হয়নি ? কেন বলেননি বলুন তো ?

—সাহস হয়নি।

—এত বড় ব্যাপার ! তবু সাহস সংগ্রহ করতে পারলেন না ?

—আমার ধারণা হয়েছিল, ম্যাডাম এর অজ্ঞ মানে করে বসবেন। আমি বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারবো না। বিশ্বাস করুন স্ত্রার ঘটনাটা লুকিয়ে যাওয়া ছাড়া আমি আর কোন অপরাধ করিনি।

—ঠিক আছে। আপনি এখন যেতে পারেন।

—এই কথাগুলো পুলিশের কানে গেলে কিন্তু—

—আমি অহুসন্ধান করে নিশ্চিত হয়ে গেলে পুলিশ কিছুই জানতে পারবে না। তবে উল্টো দিকে যদি সামনে এসে পড়ে আমি তাহলে নিরুপায়। আচ্ছা, আহুন তাহলে।

ব্রজবাবু বিদায় নিলেন।

বাসব শৈবালের দিকে তাকিয়ে হাসল।

—ব্যাপারটা মোটামুটি পরিষ্কার হল।

বাসব পাইপে সিগারেট ঠানতে ঠানতে বলল, আমার প্রবোধ উদ্ভব সেদিন মিসেস ব্যানার্জী যেই বললেন, তিনি হলে জগ আর গেলাস শাড়ির আড়ালে নিয়ে

লরে পড়তেন, সেই মুহূর্তে ব্রজবাবু আমার চোখের উপর ভেসে উঠলেন। কারণ একমাত্র তিনিই এঁদের মধ্যে ধৃতিশীল লোক। ঠাণ্ডা থাকার দরুন গায়ে চাদর থাকাই স্বাভাবিক।

—এতে কিন্তু মূল ব্যাপারের সুরাহা হল না। আসল ব্যক্তি এখনও অন্ধকারে।

—আবার আলোর দিকে এগিয়ে আসছে তাও বলা যায়। আমি তাকে প্রায় চিনে ফেলেছি তবে পরিতাপের কথা কি জানো ডাক্তার লোকটাকে অভিস্কৃত করা যাচ্ছে না।

—কেন ?

—প্রমাণ কই ? একজনকে অভিস্কৃত করতে গেলে স্ত্রল প্রমাণের দরকার হয়। টার্গেট মিস করলেও লোকটা আটঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছিল। আমি তাকে অস্ত্র প্যাচে ফেলবো স্থির করেছি।

শৈবাল বলল, ক্রমেই বেশ প্যাচালো হয়ে উঠছে। তা সেই প্যাচটা কি ?

—নতুন কিছু নয়। আমার অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যাপার। এসব হত্যাকাণ্ডীরা পেশাদার হয় না। স্বার্থের খাতিরে অপরাধ করার আগে হাজার সতর্কতা অবলম্বন করলেও পেশাদারদের মত নার্ভ এঁদের হয় না। মনের মধ্যে অপরাধী বোধ, ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় সব সময় ঠেঠানামা করতে থাকে। এর সুযোগ আগেও আমি অনেক স্তম্ভে নিয়েছি ডাক্তার। এবারও চেষ্টা করে দেখবো।

—সুযোগটা কি ?

—টোপ। আজ সন্ধ্যায় টোপ ফেলার ব্যবস্থা করছি। উইলট। এখন পড় দরকার। তোমাকে সব বলছি। তুমি বরং কফির ব্যবস্থা দেখো।

বাসব সেক্টর পিস থেকে উইলের খামটা তুলে নিল।

বিকেল পাঁচটার পরে কুশাল এল ঋতুকে সঙ্গে নিয়ে।

বাসব অলস ভঙ্গীতে শৈবালকে কিছু বলছিল। ওঁদের মধ্যে মুহূ হাসল।

বসতে ইচ্ছিত করল। বসার পর ঋতু ট্রেনের ঘটনাটা বিস্তারিত ভাবে বলে গেল।

বাসব কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক এই সময় বিনোদ ও প্রমোদ ঘরে এল। ওঁদের পিছু পিছু রাফেশ। তিনজনের মধ্যে কারুর মুখের অবস্থা ভাল নয়। আজ দুপুরে কোন করে এই সময় এখানে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল।

বিনোদ বললেন, এ কি ধরনের জুলুম। আমাদের আটকে রেখেছেন ? যখন-তখন বিরক্ত করছেন ?

বাসব বলল, উপায়হীন অবস্থায় আপনাদের আটকাতে হয়েছে।

—আমাদের কাজকর্মের কত ক্ষতি হচ্ছে বোঝেন ?

—অবশ্যই বুঝি । কিন্তু উপায় কি বলুন না ?

—ছেলেখেলা পেয়েছেন ? এই কেসের সঙ্গে আমাদের আর সম্পর্ক কি ? আমি আজই রাত্রে ট্রেনে কলকাতা রওয়ানা হবো জানিয়ে রাখলাম । আমার ধৈর্ষের একটা সীমা আছে ।

বাসব ভারী গলায় বলল, ধৈর্ষের একটা সীমা সত্যি থাকা উচিত । আপনি আজ রাত্রে পাটনা ছাড়তে পারেন । তবে যাবার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতে হবে ।

—কোন প্রশ্নের উত্তর ?

—উত্তর সঠিক হওয়া চাই ।

—বলুন ?

ব্রজবাবু ঘরে ঢুকলেন ।

খতু ও কুশল যে সোফায় বসেছিল, উনি তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন । বাসব প্রশ্নের জের না টেনে পাইপ ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল । সবে এক টান দিয়েছে, মহাশ্বে ঘরে ঢুকলেন কুলদীপ মেহরা । বাসব বসতে অহরোধ জানিয়ে ওঁর সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিল ।

মেহরা বললেন, এই অঞ্চলে এসেছিলাম । ভাবলাম, একবার হোটেলে ঘুরে যাই । আপনি বোধহয় এঁদের নিয়ে ব্যস্ত আছেন । আমি বয়ঃ—

—আপনি এসে পড়ায় ভালই হয়েছে—বাসব বলল, বহুন । লোকেশ মার্ভার-কেস সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই । আপনি শুনুন । তবে তার আগে প্রশ্ন-উত্তরের একটা ঝামেলা রয়েছে বিনোদবাবু—

—বলুন ?

—আপনি তো লুজি পছন্দ করেন না । তবে কেন ১১ই জানুয়ারী রাতে আপনি শোবার সময় লুজি ব্যবহার করেছিলেন ?

—লুজি—মানে—

—কথাটা আপনার কাছ থেকেই শোনা । প্রমোদবাবু বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন । তাও আপনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, লুজি পরেই শুয়েছিলেন ।

—বলেছিলাম । তাতে কি হয়েছে ?

বাসব হালকা গলায় বলল, আপনার পক্ষে একটু অস্বস্তিরই কারণ হয়েছে । আপনি মিথ্যা কথা বলেছেন । লুজি নয়, সেদিনও আপনি নিজের অভ্যাস মত স্লিপিং স্টিট ব্যবহার করেছিলেন ।

কাঁপা গলায় বিনোদ বললেন, না। আপনি বললেই মেনে নেবো? সেদিন আমি লুঙ্গি পরেছিলাম।

—বেশী শার্ট হবার চেষ্টা করবেন না। সেদিন ২৩০ নম্বর ঘরে আদিত্য সোম নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি দেখেছেন, রাত সাড়ে এগারটার কাছাকাছি আপনি স্লিপিং হুট পরা অবস্থায় নিজের ঘরে ঢুকছেন।

—আমি আদিত্য সোমকে চিনি না।

—তিনিও আপনাকে চেনেন না। ঘরের নম্বরই আপনাকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। বলুন, কেন মিথ্যা কথা বলেছিলেন?

—আমি বলছি—আমি তো—

—আপনি নিজের বিপদ বুঝতে পারছেন না। যা হোক—মিঃ মেহরা—

—বলুন মিঃ ব্যানার্জী—

—আপনি কি একাই এসেছেন?

—গাড়িতে দুজন লোক রয়েছে।

—আমি এই ভদ্রলোকের ঠিকানা দিচ্ছি। আপনার নোকেরা ওখানে গিয়ে তল্লাশ করে দেখুক, এঁর কাপড়চোপড়ের মধ্যে লুঙ্গি আছে কিনা।

—বেশ তো। আমি ব্যবস্থা করছি। ভাল কথা, লুঙ্গি না পাওয়া গেলে এঁকে অ্যারেস্ট করতে হবে বোধহয়?

বিনোদ আর স্থির থাকতে পারলেন না।

বিচলিত ভঙ্গীতে বললেন, আমি বুঝতে পারছি না, স্লিপিং হুট পরায় আমি এমন কি অজ্ঞায় করেছি? সেদিন নার্তাস হয়ে পড়ায় লুঙ্গির কথা বলেছিলাম।

বাসব বলল, আজ? আজও বলেছেন। এখন সঠিকভাবে বলুন, সেদিন রাত এগারটার পর নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

—আমি—ঠিক মনে—

—মনে পড়েছে না? নাটক করার চেষ্টা করবেন না। আসল কথাটা কি না বললে আমি আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হব।

বিনোদ এবার ভেঙে পড়ার মুখে।

কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আমি একান্তে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—বেশ তো, আহ্ন।

বাসব বিনোদকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উপস্থিত বাকী সকলে অবাক নিশ্চয় হলেন, তবে মুখে কিছু বললেন না।

মিনিট সাতেক পরে ফিরে এসে দুজনে। বিনোদের মুখ ভয়ে শুকিয়ে উঠেছে।
বাসব নির্লিপ্ত মুখে বসলো নিজের আসনে।

সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, আপনারা অনেকেই মনে মনে আমার উপর
বিরক্ত হচ্ছেন। খুবই স্বাভাবিক। তবে কোন তদন্ত হাতে নেওয়ার পরই হেলায়
সম্পন্ন হয়ে যাবে তার কিন্তু কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যা হোক, এবার আমি
কাজের কথাই আসি। লোকেশ ট্যাগুন ঐ অসময়, পরের ঘরে গিয়ে কেন খুন
হলেন সে রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা পুলিশ বা আদালত কোন পক্ষই করেননি।
এই দুই পক্ষই স্থল সন্দেহের আধারে একজনকে নিয়ে নাড়াচাড়া করার চেষ্টা
করেছেন। অথচ বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে লোকেশ ট্যাগুন। হত্যাকারী তাঁকে
মারতে চায়নি।

কুলদীপ মেহরা প্রশ্ন করলেন, হত্যাকারীর টার্গেট কে ছিল ?

—আমার মকেল ঋতু ব্যানার্জী বা তৎকালীন মিসেস মাথুর।

ঋতু চমকে উঠল।

আর সকলেও কম অবাক হল না।

বাসব আবার বলল, মিঃ মেহরা, এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, এই চক্রান্তের
মূলে আছে বিপুল অর্থসম্পত্তি গ্রাস করার ব্যগ্রতা। জগের জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়ে-
ছিল মার্কিউরিক ক্লোরাইড। অর্থাৎ কোন একসময় আমার মকেল জল খেয়ে মারা
পড়বেন। বিষির বিড়খনা বলুন বা হত্যাকারীর দুর্ভাগ্য—ঐ জগ থেকে জল খেলেন
লোকেশ। উনি সেদিন বেশী মাত্রায় ড্রিঙ্ক করে ফেলেছিলেন। কেউ কেউ ড্রিঙ্কের
কিছু পর থেকে তেষ্ঠা অল্পভব করেন। ঐ তেষ্ঠাই লোকেশকে যত্নর দিকে ঠেলে
দিয়েছে। এখন দেখতে হবে এই নির্মম কাজ করেছে কে ?

মেহরা বললেন, আমার মনে হয় হত্যাকারীর স্বরূপ প্রকাশ করার একটা নতুনই
রয়েছে—মার্কিউরিক ক্লোরাইড।

—আপনি ঠিকই বলছেন। আশার কথা কাল সকালেই মার্কিউরিক
ক্লোরাইড কে সংগ্রহ করেছিল তার সন্ধান পেয়ে যাচ্ছি। ইনফরমার আমাকে সংবাদ
দিয়েছে, একজন স্থানীয় ব্যবসাদার কিছু কবোরের পরিবর্তে আমাকে অনেক গুপ্ত
কথা জানাবে। কাজেই কালই আমি হত্যাকারীকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করে
দেব। আপনাদের আর ধৈর্যের পরীক্ষা নেব না। আজ এই পর্যন্ত। কুশলবাবু—

—বলুন ?

—কাল সন্ধ্যার স্লাইটে ফিরতে চাই। দুটো টিকিটের ব্যবস্থা দেখবেন।

কুশল বলল, ব্যবস্থা করে রাখবো। কিন্তু কালই চলে যাবেন—

—হত্যাকারী আরেস্ট হয়ে যাবার পর আমার এখানে আর কি কাজ থাকতে পারে ? ঐ কথাই রইল তাহলে ।

সকলে উঠে পড়েছিলেন ।

কুলদীপ মেহরা ছাড়া আর সকলে বিদায় নিলেন ।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে ।

রাত তখন সাড়ে নটা । ফ্রেজার রোডের একটা ড্রাগ-হাউসে বণ্ডামত একজন চুকলো । সে এখার ওখার একবার তাকিয়ে নিল । দোকানে তখন ক্রেতার তেমন ভীড় ছিল না । কাউন্টারে বসা একজনের দিকে এগিয়ে গেল লোকটা ।

—আমি ফোন করতে চাই ।

—এক টাকা লাগবে ।

ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা টাকা বার করে কাউন্টারে রাখল, তারপর বণ্ডা লোকটা টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়ে পৌঁছল । রিসিভার তুলে নিয়ে আরম্ভ করল ডায়াল করতে । কয়েকবার রিং হবার পরে ওখারে কেউ রিসিভার তুলে নিল ।

—রণধীর কথা বলছি—

—শেঠজীর নির্দেশে ফোন করছি—দু লাখ টাকা দ্বিগুণে ব্যাপারটার রফায় আসুন—নইলে—

—আমি কি করবো বলুন—শেঠজী যা বলেছেন আপনাকে জানালাম—ইচ্ছে করলে কথা বলে দেখতে পারেন । বাড়িতেই আছেন উনি—ছাড়ছি এখন—

রণধীর রিসিভার নামিয়ে রাখল ।

সাড়ে দশটা বেজে গেছে কয়েক মিনিট আগে ।

নির্জন বেলি রোড শূণ্যতার কোলে ঢলে রয়েছে । মাঝে-মাঝে দু-একটা গাড়ি দ্রুতবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে । রাস্তার দুধারের গাছের ফাঁক দিয়ে এখানে-ওখানে টাঙ্কের টুকরো আলো এসে পড়েছে ।

একটা রিকশা ২২নং চালে এগিয়ে আসতে দেখা গেল । সময়ের হিসাবে এই ত্রিচক্র যান ভারী বেমানান এখানে । যাত্রী একজনই । আলোর তেজ না থাকায় যাত্রীর মুখ দেখা যাচ্ছে না । হাইকোর্টকে বেশ কিছুটা পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবার পর যাত্রী রিকশা থেকে নামল । ভাড়া মিটিয়ে দেবার পর সে একটা সড়ক রাস্তার মধ্যে চুকলো ।

এই সময় লোভসেভিং আরম্ভ হল ।

অন্ধকার আরো ঘেন চাপ বেঁধে এল। যখন-তখন পাণ্ডার চলে যাওয়া পাটনার এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাত্রীর কিন্তু কোন অহুবিধা হল না। স্বচ্ছন্দ গতিতেই এগিয়ে চলেছে। মনে হয় এই পথে সে বহুবার যাতায়াত করেছে।

আরো শতানেক গজ এগুবার পর যাত্রী থামল। সামনেই একতলা একটা বাড়ি। মরা চাঁদের আলোয় আবছা দেখাচ্ছে। যাত্রী স্বচ্ছন্দগতিতে এগিয়ে গেল। দরজার পাশে পুসার। ডান হাতের মাঝের আঙুল দিয়ে পুসারে চাপ দিল।

একবার—দুবার—

ভেতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল, কে—

—খোল। আমি—

দরজা খুলে গেল।

গৃহকর্তা মাঝারি সাইজের মোটামোটা লোক। টেবিলের উপর কেরোসিন তেলের ল্যাম্প জ্বলছিল। স্নান আলোর দরুন, ঘরের চারধারে কেমন চাপা চাপা ভাব। যাত্রী গৃহকর্তাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে এল।

বিস্ময়ের স্বরে গৃহকর্তা বললেন, এতরাতে এলে, কি ব্যাপার ?

—অজ্ঞতার ভান করো না। তুমি ভালই জানতে আমি আসবো।

—কি ভাবে জানবো ? কোন সূচনা পাঠিয়েছিলে কি ?

তীক্ষ্ণ গলায় যাত্রী বলল, সূচনা তুমিই পাঠিয়েছিলে। আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাও—দু লাখ টাকা চাই তোমার ? আবার পুলিশ ইনফরমারকে ভেতরের কথা জানাবে বলে আশস্ত করেছে। ইউ স্বাউগেল—

—গালাগাল দেবেন না।

—নিশ্চয় দেবো। মনে করেছে আমার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে তুমি দূরে বসে মজা দেখবে ? সে সূযোগ তোমায় দেব না। আমি এখনই হিসাব চুকিয়ে ফেলতে চাই।

—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ? আজোবাজে বকে চলেছো। ভুলে যেও না আমার লহের একটা সীমা আছে।

কথা শেষ করেই গৃহকর্তা চমকে উঠলেন।

আগন্তকের হাতে বেচপ একটা পিস্তল শোভা পাচ্ছে।

—তুমি আমাকে গুলি করবে ?

—তোমার মত বিরক্তিকর লোককে বাঁচিয়ে রাখতে পারি না। সাইলেন্সার লাগানো আছে। শব্দ কারুর কানে যাবে না।

এরপরই চাপা একটা শব্দ ।

গৃহকর্তা ঝটিতি একপাশে সরে গিয়েও নিজেকে পুরোপুরি ভাবে রক্ষা করতে পারলেন না—পাকসাঁট খেয়ে পড়লেন একধারে । কাতরোক্তির বেশ ছড়িয়ে পড়ল ঘরের চারধারে । তার পরই ঘটল অভাবনীয় ঘটনা ।

ঘরের ওধারের দরজার কাছ থেকে খানকয়েক টর্চ ঝলসে উঠল । দ্বিতীয়বার গুলি চালাবার মুহূর্তেই আগন্তুক ধমকে গেল । বিপদ ঘিরে আসছে বুঝতে পেরেই সে ঘুরে দাঁড়াল । বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়াই ওর উদ্দেশ্য । কিন্তু ততক্ষণে ওধার থেকেও টর্চের আলো এসে পড়েছে ওর উপর ।

কে একজন বলে উঠল, রাকেশবাবু, আপনাকে ঘিরে ফেলা হয়েছে । পিস্তলটা হাত থেকে ফেলে দিন ।

রাকেশ দ্বিধিত ঘামতে লাগলেন ।

বাসব কয়েক পা এগিয়ে এল ।

—কয়েকটা রাইফেল আপনাকে তাক করে রয়েছে । কথা না শুনলে ঝাঁজরা হয়ে যাবেন । পিস্তলটা ফেলে দিন ।

ধাতব শব্দ তুলে অস্ত্রটা মাটিতে পড়ল । একজন দ্রুত এগিয়ে এসে তুলে নিল ওটা । দুজন চেপে ধরল রাকেশকে । কুলদীপ মেহরা ও বাসব গৃহকর্তার কাছে গিয়ে পৌঁছল । উনি কাতরাচ্ছেন, ভাগ্য ভাল জ্ঞান আছে । গুলি বাঁ হাতের মাংস কেটে বেরিয়ে গেছে । দ্রুত ওঁকে পুলিশ জিপের সাহায্যে হাসপাতালে পাঠানো হল ।

বাসব রাকেশের সামনে এসে দাঁড়াল ।

বলল যুহু গলায়, আটঘাট বেঁধেই পরিকল্পনা করেছিলেন । পুলিশ বা আইন আপনাকে চিহ্নিত করতে পারেনি । আপনি অন্ধকারে রয়ে গিয়েছিলেন । অগত্যা আমাকে এই চালটা দিতে হল । আপনার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি অগ্রপশ্চাত্ত বিবেচনা না করেই যে এই ভাবে টোপ গিলবেন ভাবতে পারিনি ।

বাসব ঘুরে দাঁড়াল ।

—মিঃ মেহরা, আসামী হাজির । রাত জাগা স্বার্থক হয়েছে । এর পরের কাজ অবশ্য আপনাদের হাতে ।

—ধন্যবাদ মিঃ ব্যানার্জী । মেহরা বললেন, এর পর যা কিছু করণীয় আমরা দেখছি । আপনি কি এখন—

—হোটেলের ফ্লোর । কাল দেখা হচ্ছে । এস, ডাক্তার—

কলকাতাস্থী স্ট্রাইটে জায়গা পাওয়া গেল না ।

গভীর রাজনৈতিক তৎপরতার দরুন ভারী চাপ চলেছে প্লেন পার্টিসের উপর। অমৃতসর মেলের এসি বগিতে চারটে বার্থ পাওয়া গেছে। ঋতু এবং কুশলও চলেছে ওদের সঙ্গে কলকাতা।

দুনিবার লোভের বশবর্তী হয়ে রাকেশ যে পরিকল্পনা খাড়া করেছিল, তার পরিণামস্বরূপ সে এখন জেলের চার দেওয়ালের মধ্যে বদ্ধ। সে যে মূল কাণ্ডের হোতা, কেউ তা কল্পনাই করতে পারেনি। কুলদীপ মেহরা সহর্ষে বাসবের বাহাদুরী স্বীকার করে নিয়েছেন। পাঞ্জাবী কায়দায় ডিনার সেবেই ওরা মেহরা সাহাবের বাংলা থেকে স্টেশনে এসেছে।

মেল ছেড়ে গেল।

ঋতু মিয়মান ভক্ত্যুতে বসে আছে। বাকী তিনজন নিজেদের মধ্যে নানা প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকলেও বাসব মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল ওর দিকে। এবার উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগুনো। মেল দ্রুত গতিতে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। বাসবের উদ্দেশ্য অবশ্য করিডরে দাঁড়িয়ে পাইপের সদ্ব্যবহার করা।

—মিঃ ব্যানার্জী—

ঋতুর ডাকে বাসব থামল।

—বলুন ?

—ভারী খারাপ লাগছে। দাদা কাণ্ডটা বাধিয়েছে আঁচ করতে পারলে আমি আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করতাম না। কেন যে এমন হয়—

বাসব ওর পাশে বসে পড়ে বলল, এই রকম হয়। অর্থ সর্বকালের অনর্থের মূল। আপনি অনর্থক মন খারাপ করে বসে আছেন। মনে রাখবার চেষ্টা করুন আপনার দাদা আপনাকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ তো ভাগ্যের খেলা আপনার পরিবর্তে লোকেশ ট্যাগুন মারা গেল।

—দাদা আমাকে খুন করতে চেয়েছিল একথা ভেবেই খারাপ লাগছে। তবু আমি চাই না ওর শাস্তি হোক।

—আপনার মহাহুভবতা। আমাদের চাওয়া না চাওয়াতে কিছু আসবে যাবে না। রাকেশ দিক্ষিতের শাস্তি হবেই।

কুশল বলল, আপনি কি প্রথমেই ঠুকে লোকেট করতে পেরেছিলেন ? কিভাবে ব্যাপারটা ঘটেছিল বলেন যদি—

—প্রথমে আমি রাকেশকে সন্দেহ করিনি। আমার প্রথম চিন্তা ছিল খুন কে করেছে তা নয়—খুন কিভাবে হয়েছে। জগ আর -গলাস ২১৬ নম্বর ঘর থেকে লোপাট হয়ে যাওয়া চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। পুলিশ ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয়নি।

আমি গুরুত্ব না দিয়ে পারলাম না। নিরীহ বস্তু দুটোর অসুপস্থিতি কিম্বের ইঙ্গিত ? ভাবতে ভাবতে একটা পর্যায়ে আমি নিশ্চিত হলাম। জগের জলে মারকিউরিক ক্লোরাইড যেশানো ছিল। স্বতরাং হত্যাকারী তাকেই মারতে চেয়েছিল যে ২১৬ নম্বর ঘরের বোর্ডার ছিল। অর্থাৎ টার্গেট ছিলেন শ্রীমতী ঋতু। একটা বিবয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল হতভাগ্য লোকেশ ঐ জগ থেকে জল খেয়ে মারা গেছে। প্রাঙ্গ উঠবে, গভীর রাত্রে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় লোকেশের তেষ্ঠা পাবার কারণ কি ? এই প্রশ্নের উত্তর ভাস্কর্যের কথাই পেলাম। অত্যধিক অ্যালকোহল পেটে গেলে কোন কোন লোকের ভীষণ তেষ্ঠা পায়। লোকেশ স্বভাবের দোষেই মারা পড়েছে।

বাসব খামল।

হালকা শব্দ তুলে মেল একটা স্টেশন অতিক্রম করে গেল। মোকামার আগে আর কোন স্টপেজ নেই। ক্লাক থেকে কফি ঢেলে তিনজনকে দিল ঋতু। নিজেও নিল। কয়েক চুমুকে কফি শেষ করে বলতে আরম্ভ করল।

—শ্রীমতীকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য কি ছিল বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। ঐ বিপুল সম্পত্তি কতায়ত্ত করার এ এক বার্থ প্রয়াস। লিফ্ট থেকে বিনোদ মাথুরকে বাদ দিতে হল। কারণ তাঁর পরিকল্পনা ছিল, বৌদিকে শালাজ বানিয়ে সমস্ত কিছু উপর আধিপত্য করবেন। কিন্তু জগ আর গেলাস নিয়ে মরে পড়ল কে ? লোকেশের মারা যাবার পর ও দুটো তো যথাস্থানেই থাকার কথা। এর একটাই অর্থ দাঁড়ায়, আরো একজন ঐ ঘরে ঢুকেছিল। হোটেলের এক্সচেঞ্জ রেজিস্টার খাটেতেই তার সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি আপনাদের ব্রজবাবু।

বিস্ময়ের স্বরে ঋতু বলল, ব্রজবাবু! তিনি অসময়ে আমার ঘরে কি করতে গিয়েছিলেন ?

—আপনি ঠুকে দশটার সময় দেখা করতে বলেছিলেন।

—হ্যাঁ। একটা কাজ মনে পড়ে গিয়েছিল। ঠুকে বুঝিয়ে দিতাম কি করতে হবে। পাটনায় উনি থেকে যেতেন।

—ব্রজবাবুর চটকা ভাঙল লাড়ে দশটার পর। ভয়ে ভয়ে উনি ফোনে যোগাযোগ করলেন আপনাকে। রিসিস্তার তুলল লোকেশ। হতবাক ব্রজবাবু ছুটলেন ২১৬ নম্বর ঘরে। লোকেশ জানতে চাইল আপনি কোথায় আছেন—মি: ব্যানার্জীর ঘরে কিনা ইত্যাদি। এই সময় তার ভেটা চাগিয়ে উঠল। ব্রজবাবু জগ থেকে জল গড়িয়ে দিলেন। জল খাবার পরই লোকেশ মারা গেল। ব্রজবাবু ঘাবড়ে গেলেন। ঠুঁর চিন্তা হতে লাগল আপনাকে নিয়ে। ডেডবডি করিডরে এনে ফেলে রাখার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। অগত্যা জগ আর গেলাস নিয়ে মরে পড়লেন।

এদিকে যত রাত বাড়তে লাগল বিনোদ মাথুর তত বেশী চিন্তিত হতে লাগলেন । লোকেশ এতক্ষণ কি করছে ? শেষে থাকতে না পেয়ে উনিও পৌঁছলেন ২১৬ নম্বর ঘরে । লোকেশ মারা গেছে বুঝতে পেয়েই তাঁর মাথায় এল নতুন ধ্যান । বৌদি শালাজ হলেন না বটে, তাতে তাঁর দীর্ঘমেয়াদি কারাবাসের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে । পরিস্থিতিতে আরো জটিল করে তোলার জন্য বলশালী বিনোদ মৃতদেহ বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ফেললেন—ড্রেসিং টেবিলের উপর পার্শ্ব থেকে রুমাল বার করে লোকেশের হাতে গুঁজে দিলেন ।

এর পর আমি মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলাম, নাটের গুরু সম্পর্কে প্রয়াত মাথুর সাহাবের উইল পড়ে দেখলাম উনি, নিজের অবর্তমানে জীব দায়িত্ব নিজের সহোদরদের দিতে চাননি । তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তার মোটামুটি অর্থ হল তাঁর জী চাইলে নিজের বড় ভাইয়ের সহযোগিতা নেবেন । এবং হঠাৎ যদি জীব মৃত্যু হয় তবে, তাঁর কন্যা ও সম্পত্তির সমস্ত দায়িত্ব নেবেন শালক রাকেশ দ্বিক্ত । এই উইলের বয়ানেই রাকেশকে লোভী করে তুলেছে । তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার আমাকে সঠিক পথ দেখালো । শ্রীমতী স্বতুর ঘরের জগের জলে মারকিউরিক ক্লোরাইড মেশাবার সুযোগ একমাত্র রাকেশেরই ছিল । বিনোদ বা প্রমোদ কড়া মেজাজের বৌদির ঘরে যাওয়ার যতটা অসুবিধা ছিল, তার চেয়ে সহস্রগুণ সুযোগ বড় ভাইয়ের থাকাই স্বাভাবিক । আমার ধারণায় দুই ভাইবোনের মধ্যে যখন কথাবার্তা হচ্ছিল তখন শ্রীমতীর অগ্রমনস্কতার সুযোগ নিয়ে উনি জগের জলে অভীষ্ট বস্তুটি ফেলে দেন । মিসেস ব্যানার্জী, আপনি কি দাদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এক-আধবার নিজের আগুন ছেড়ে উঠে কোথাও গিয়েছিলেন ?

ঋতু একটু ভেবে নিয়ে বলল, ভাবী বিরক্ত লাগছিল । যতদূর মনে পড়ছে, আমি একবার জানলার কাছে গিয়েছিলাম ।

—এ সময় সুযোগটা নিয়েছেন আপনার দাদা । যা হোক, রাকেশ দ্বিক্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর আমি প্রথমে সংগ্রহের দৌড়ে লেগে পড়লাম । ব্রজবাবুর কাছ থেকে সহজেই জানা গেল রাকেশ দ্বিক্তের পাটনায় যে ব্যবসায়িক পার্টনার আছে তার নাম ঠিকানা । কারণ এটা সহজেই অস্বাভাবিক করা গিয়েছিল, সেক্ষেত্রে রাকেশ মোটেই জানতেন না, তাঁর সহোদর এই সময় পাটনায় থাকবেন । স্ত্রীরাং এলাহাবাদ থেকে পরিকল্পনা হাতে নিয়ে এখানে আসেননি । এখানে এসে পার্টনারের মুখে শুনলেন ঋতু এসেছেন । সঙ্গে সঙ্গে স্থির করে ফেললেন, ফেলে রাখা কাজটা এখানেই এবার শেষ করে ফেলবেন । দ্রুত প্রস্তুতি নিতে হল । কাজেই পার্টনারের সহযোগিতা হয়ে উঠল অপরিসীম । নইলে মারকিউরিক ক্লোরাইড সংগ্রহ হবে

কিন্তাবে ।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে টোপ ফেলার অনিবার্হতাকে স্বীকার করা যায় না । বহুবায় আমি এই পথ বেয়ে সাফল্যের চূড়ান্তে পৌঁছেছি । রাকেশ দিক্ক্ষিতকে ফোন করলাম । এমন ভাবে কথা বললাম, যাতে মনে হতে লাগল পার্টনার ব্র্যাকমেল করার পাঁকা ব্যবস্থা করে ফেলেছে । রাকেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন । তাঁর দৃঢ় ধারণা হল, পার্টনারকে শাস্ত করতে না পারলে, সে পুলিশের কাছে মুখ খুলতে পারে । টাকা দিয়ে শাস্ত করা যাবে না—কারণ তার দাবী বিরামহীন ভাবে চলতে থাকবে । কাজেই এত বড় সাক্ষাকে ঘাড়ে চাপিয়ে রাখা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয় । কাজেই চিরদিনের মত শাস্ত করে দেওয়াই হল একমাত্র পথ । এখানে রাকেশকে ফোন করে দেওয়ার পর পুলিশের সহযোগিতায় পার্টনারকে চেপে ধরলাম । তাকে বুঝিয়ে বললাম এবার কি ঘটতে পারে এবং তাকে কি করতে হবে । অসম্ভব নার্ভাস হয়ে যাওয়া সেই লোকটার আমার কথার রাজী না হয়ে উপায় ছিল না । এরপর যা কিছু ঘটেছে আপনারা তা আগেই জেনে গেছেন ।

এতক্ষণ পরে বাসব পাইপ ধরাবার জন্ত ব্যস্ত হল ।

ঝুতু বলল, এত সব না করে দাদাকে তো আগেই ধরা যেত ?

—তুমি ভেবেচিন্তে কিছু বলছো না—কুশল বলল, অকারণে কাউকে ধরা যায় ? প্রমাণ হাতে থাকা চাই তো ?

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বাসব বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন । তবে এত কাণ্ড করার পরও এক্ষেত্রে আমরা একটু বেকায়দায় আছি । রাকেশবাবু পুলিশের চাপে পড়ে সব যদি স্বীকার করে নেন ভাল কথা, নইলে আদালতে প্রমাণ করা যাবে না, উনি লোকেশ ট্যাঙনকে খুন করেছেন বা নিজের সহোদরকে খুন করার চেষ্টা করেছিলেন । তবে শাস্তির হাত থেকে বেঁচে যাবেন তাও নয় । পার্টনারকে গুলি মারা এবং লাইসেন্সহীন অস্ত্র ব্যবহার করা ছুটোই তার বিরুদ্ধে যাবে । পাঁচ-সাত বছর শ্রীধরের ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে জানবেন ।

মেলের গতি মন্থর হয়ে আসছে ।

মোকামা বোধহয় এসে গেল ।